বইঘর নিবেদন

মাসুদ রানা

মায়া মন্দির

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন



মিতা কিডন্যাপ হয়েছে শুনেই বিসিআই চিফ বললেন, 'হাতে জরুরি কাজ নেই, তুমি যেতে পারো। বিদেশে মহা বিপদে পড়েছে মেয়েটা...'

মিতা দত্তকে উদ্ধার করে আনতে ছুটল রানা হংকং-এ। ভাবতেও পারেনি ওই অদ্ভুত স্ফটিক আর পিচ্চি পাবলোর কারণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে তুলছে তিন পরাশক্তি মিলে! এদিকে পেছনে লেগে গেছে চিনা ও রাশান ভয়ঙ্কর দুই শত্রুর দল। ওদের পেছনে নিয়ে পৌছুল ও গুয়াতেমালার দুর্গম এক মায়া মন্দিরে! কিন্তু খালিহাতে কীভাবে ঠেকাবে রানা আধা-রোবট, হিংস্র ওই চিনে দস্যুকে? অসহায় বাঙালি গুপ্তচরকে বিশতলা উঁচু পাহাড় থেকে ল্যাং মেরে নিচে ফেলল চাইনিজ বিলিয়নেয়ার হুয়াং লি ল্যাং! এবার বুঝি শেষ হলো মাসুদ রানার লীলাখেলা!



মাসুদ রানা ৪৫১

মায়া মন্দির

কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7451-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৭

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-451
MAYA MONDIR
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

সেবা প্রকাশনী

একশ' উনত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-

১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆ কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-99 ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হাণ্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউন্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী ◆ নীল রক্ত ◆ দুরন্ত কৈশোর ◆ মৃত্যুঘণ্টা ◆ ইসাটাবুর অভিশাপ ◆ মাস্টারমাইণ্ড ◆ মায়া মন্দির।

মাসুদ রানা-৪৫১

মায়া মন্দির

কাজী আনোয়ার হোসেন

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— **লেখক**

এক

কনকনে ঠাণ্ডা। নভেম্বর মাস।

চারদিকে ভেজা মখমল চাদরের মত ভারী, ধূসর কুয়াশা। আর্কটিক সাগরের বুক চিরে চলেছে পঞ্চাশ ফুটি রাশান ট্রলার যেযদা বা নক্ষত্র।

ওটার নাবিক ও যাত্রীরা ভাগ্যবান, উত্তর মেরু থেকে ধেয়ে আসছে না মৃত্যুশীতল হু-হু হাওয়া। বিপজ্জনক বেয়ারিং সি এখন শান্ত। তাপমাত্রা পনেরো ডিগ্রি ফারেনহাইট, অর্থাৎ −৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপ আরও হ্রাস পেলে সাগর হবে জমাট বরফের সফেদ মাঠ। সেক্ষেত্রে আটকা পড়বে ট্রলার যেযদা।

ফলাফল: সবার নিশ্চিত মৃত্যু!

আবছা আঁধারে পাইলট হাউসে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন সার্গেই দিমিতভ, দমে গেছে মন। রুক্ষ চেহারার বয়স্ক লোক সে। লালচে, বড় সাইজের বেলের মত ন্যাড়া মাথা। এ মুহূর্তে চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ। ঝুঁকে পড়েছে ষাঁড়ের কাঁধের মত মস্ত দুই কাঁধ। ভীত ও চিন্তিত সে। ট্রলারের বো-র ওপর দিয়ে চেয়ে আছে দূরে। কান পেতে শুনছে, পুরনো লোহার খোলে ঠুং-ঠাং শব্দে টোকা দিচ্ছে ছোট-বড় মেরু বরফের চাঁই। ওই শব্দ ছাপিয়ে কানে আসছে ইঞ্জিনের চাপা ধুব-ধুব আওয়াজ।

এখানে-ওখানে ভাসছে সাদা, ছোট বরফের চাঁই। তারই মাঝ দিয়ে অর্ধেক গতি তুলে চলেছে দিমিতভের ট্রলার।

বছরের এ সময়ে হঠাৎ করেই মারাত্মক প্লেগের মত বরফের মাঠ ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ-সাগরে। অথচ মাত্র একঘণ্টা আগেও হয়তো ওখানে ছিল উন্মুক্ত টলটলে জল।

অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সাগর পাড়ি দিচ্ছে দিমিতভ। ভাল করেই জানে, কত বড় ঝুঁকি নিয়েছে। উষ্ণ জলে ফিরতে না পারলে চারপাশ থেকে ট্রলারটাকে চেপে ধরবে কঠিন বরফ। শত মাইল বিস্তৃত হিম-প্রান্তরে এমন কেউ নেই যে সাহায্য করবে।

ওরা যা করেছে, তাতে ওদের বোধহয় প্রাপ্যই হয় এমনি শীতল, করুণ মৃত্যু!

'ধু-ধুম্!' শব্দে বড় এক টুকরো হিমশিলা লাগতেই থরথর করে কাঁপল ট্রলার। 'বরফের টুকরো আকারে বাড়ছে,' দিমিতভের পেছন থেকে বলল এক লোক। 'গতি বাড়িয়ে সরে যাওয়া উচিত আপনার।'

পাইলট হাউসের যন্ত্রপাতির মৃদু আলোয় ঘুরে তাকাল দিমিতভ। ওকেই দেখছে ভারী গড়নের মাঝবয়সী দিমিত্রি নিকোলভ। মানব কার্গো গোপনে পৌঁছে দিতে ওর সঙ্গে চুক্তি করেছে এই লোকই। এখন তীব্র ঠাণ্ডার মাঝেও নাকের ডগা ও ঠোঁটের ওপরের অংশে জমছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দিমিতভের আন্দাজ ভুল না হলে, লোভ ও ভয়ের বিপজ্জনক সুতোয় ঝুলছে নিকোলভ লোকটা। একবার ভাবছে, দশ মিলিয়ন ডলার পেলে বাকি জীবনে আর থাকবে না অর্থকষ্ট। আবার ভাবছে, ধরা পড়লে স্রেফ খুন হয়ে যাবে রাশান কর্তৃপক্ষের হাতে।

'আসলে এত দুশ্চিন্তা কেন, নিকোলভ?'

'আমরা বোধহয় পথ হারিয়ে ফেলেছি, তাই না?' দ্বিধা ঝেড়ে বলল নিকোলভ। একবার দেখল সার্কিট বোর্ড। ওখানেই ন্যাভিগেশন সিস্টেম।

আট ঘণ্টা আগে নষ্ট হয়েছে জিপিএস রিসিভার। দপ করে আলো ছিটিয়ে নিভে গেছে স্ক্রিন। আগুন ধরেছে কেসিং-এ। ঝরঝর করে মেঝেতে পড়েছে একরাশ লাল ফুলকি। যন্ত্রটা পরীক্ষা করে বুঝেছে দিমিতভ, আর মেরামত হবে না ওই জিনিস। পরবর্তী একঘণ্টা চলেছে নক্ষত্র দেখে। কিন্তু এরপর ঘন হয়ে উঠল কুয়াশা, দেখা গেল না আকাশ। তখন বাধ্য হয়ে ব্যবহার করেছে ট্রলারের কমপাস।

'নেভিতে যোগ দেয়ার আগে জেলে ছিলাম, ছোটবেলায় বাবার কাছে শিখেছি কীভাবে ন্যাভিগেট করতে হয়,' আশ্বাসের সুরে বলল দিমিতভ। 'ভাল করেই জানি, কী করতে হবে।'

একফুট এগিয়ে এসে প্রায় ফিসফিস করল দিমিত্রি নিকোলভ, 'নাবিকরা কিন্তু চিন্তিত। ওরা বলছে, এই যাত্রা অশুভ।'

'অশুভ?'

'নয় তো কী? পিছু নিয়েছে এক ঝাঁক কিলার ওয়েইল,' বলল দিমিত্রি। 'প্রতি সকালে দেখছি হাঙর। সংখ্যায় বাড়ছে ক্রমে। আগে কখনও এত হাঙর-তিমি দেখিনি এই সাগরে।'

ব্যাপারটা সত্যি অস্বাভাবিক, ভাবল দিমিতভ। যাত্রার শুরু থেকেই ছায়ার মত পিছু নিয়েছে সাগরের নাছোড়বান্দা শিকারি কিলার ওয়েইল ও হাঙরের দল। কিন্তু ট্রলার ডুবে না গেলে তাদের পেটে যাবে না ওরা। এই যে অনুসরণ করছে, সেটা বোধহয় স্রেফ কাকতালীয় কোনও ঘটনা।

'প্রায় ভোর হয়ে এল,' প্রসঙ্গ পাল্টাল দিমিতভ, 'বড়জোর দু'এক ঘণ্টা আলো থাকবে, তবে তা-ই যথেষ্ট। একবার কুয়াশার চাদর সরে গেলেই গতি বাড়াতে পারব।'

নিকোলভকে ভরসা দিতে না দিতেই গা রি-রি করা কর্কশ শব্দে গুঁতো মারল বড় কোনও হিমশিলা, স্টারবোর্ডে কাত

হলো ট্রলার। পরিষ্কার বুঝল দিমিতভ, সাগরের এদিকে প্রচুর খুনে বরফ।

কমিয়ে গতি পাঁচ নট করল সে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এ ফাঁদ এড়াতে। নিকোলভকে বলেছে: 'বেশি হিমশিলা মানেই কমবে গতি, এদিকে সামনের সাগরে জমাট বাঁধবে বরফ।'

সিলিঙের বাতি জ্বালতেই সে-আলো প্রতিফলিত হলো ধূসর কুয়াশায়। ধাঁধিয়ে গেল দিমিতভের চোখ। চট্ করে চোখ বন্ধ করে বলল, 'মাস্তুলে কাউকে তুলব। আগেই জানতে চাই কোথায় আছে হিমশিলা।'

কাউকে ডাকার আগেই সামনে থেকে এল আরেক জোর ধাক্কা। হোঁচট খেয়ে ওপরে উঠল বো, থেমে গেছে নৌযান—যেন গুঁতো দিয়েছে তীরে।

'ইঞ্জিন বন্ধ করো!' গলা ছাড়ল দিমিতভ।

নিচে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

কয়েক সেকেণ্ড পর নড়ে উঠে একফুট পিছিয়ে সাগরে নামল বো। স্বস্তির শ্বাস ফেলল দিমিতভ, সাহস নেই যে আবারও ইঞ্জিন চালু করতে বলবে।

'এখানে থামা যাবে না,' বলল দিমিত্রি নিকোলভ।

নিচের ডেক থেকে উঠে পাইলট হাউসে উঁকি দিল এক নাবিক। 'পানি ঢুকছে, ক্যাপ্টেন। স্টারবোর্ড। সামনের দিকে।'

'কতটা খারাপ?' জানতে চাইল দিমিতভ।

'মনে হয় ফাটল বুজিয়ে দিতে পারব,' বলল নাবিক, 'কিন্তু আবারও অমন হলে, তখন...'

'অন্যদেরকে ঘুম থেকে তোলো,' বলল দিমিতভ। 'সবাই যেন পরে নেয় সার্ভাইভাল সুট। তারপর কাজে নামবে।'

এ কথা বলেছে সতর্ক করতে। আরেকটা উদ্দেশ্য: ভয় কমিয়ে দেয়া। বাস্তবে শীতল এই সাগরে সার্ভাইভাল সুট

পরেও কোনও লাভ হবে না কারও। আধঘণ্টাও টিকতে পারবে না কেউ।

নিকোলভের দিকে ফিরল সার্গেই দিমিতভ। 'তোমার চাবিটা দাও।'

'কেন?' আপত্তির সুরে বলল আদম ব্যাপারী।

'ওকে সরিয়ে নেয়া উচিত,' বলল দিমিতভ। 'জাহাজ ছেড়ে যেতে হলে তখন বাড়তি সময় পাব না।'

দ্বিধা করল নিকোলভ, তারপর সোয়েটারের তলা থেকে বের করল সুতলি বাঁধা চাবি।

ওটা নিয়ে আদম ব্যাপারীকে ঠেলে সরিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল দিমিতভ। চারপাশে ভাসছে থোকা-থোকা ধূসর কুয়াশা। চরম ঠাণ্ডায় মনে হলো, ধারালো কাঁচ দিয়ে চির-চির করে কাটা হচ্ছে ওর মুখ। এক চিলতে বাতাস নেই। আগেই বন্ধ করা হয়েছে ট্রলারের ইঞ্জিন। চারদিক কবরের মত নিস্তব্ধ।

পুরু হয়ে বরফে ছেয়ে গেছে ডেক। ব্রিজ, মই ও রেইল থেকে ঝুলছে ছোরার মত ধারালো সব হিমখণ্ড। প্রায় মুড়ে গেছে গোটা ট্রলার। যেন পরিত্যক্ত কোনও জাহাজ!

একটু পর পাইলট হাউস থেকে বেরোল দিমিত্রি নিকোলভ, শীতবস্ত্রের ওপরে পরেছে সার্ভাইভাল সুট।

তাকে বোকা বলে মনে হলো দিমিতভের।

আরে, শালা, ট্রলার ডুবলে একঘণ্টাও টিকবি না! তো এত কষ্ট করে এসব পরে হবেটা কী?

'থামলে কেন?' জানতে চাইল দিমিত্রি।

'যাতে ডুবে না যায় জাহাজ।'

'কিন্তু এখানে রয়ে গেলে শীতে জমে মরব!'

থামা অনুচিত, জানে দিমিতভ। তবে আঁধারে চললে নিশ্চিতভাবেই ডুববে ট্রলার। কুয়াশা এতই ঘন, দেখা যাচ্ছে না কিছুই। অধৈর্য হলে বিপদ বাড়বে, ফলে মরতে হবে।

এখন পর্যন্ত ভাগ্য সাহায্য করেছে ওদেরকে। আস্তে আস্তে হালকা হচ্ছে কুয়াশার পর্দা। দেখা দিয়েছে আবছা আলো। পৃথিবীর এত উত্তর দিকে আকাশে না উঠে দিগন্তে ঝুলবে সূর্য। চারপাশে ছড়াবে ধূসর আলো, তাতেই এগোতে পারবে ওরা।

কিন্তু আজ চেনা এই সাগরকে অচেনা লাগছে দিমিতভের। পুবাকাশ কালো কেন? উল্টো হওয়ার কথা! কুয়াশার বিচিত্র কোনও খেলায় বোধহয় অনুপস্থিত সূর্যের রশ্মি!

কিন্তু তা হলে ভুল দিকে উঠছে কেন সূর্য?

দিমিতভ কিছু বলার আগেই মাঝারি আওয়াজ তুলে ট্রলারে গুঁতো দিল কিছু! একদিকে সামান্য কাত হলো নৌযান!

'কী হলো?' চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল দিমিত্রি নিকোলভ।

স্রোতে ভেসে আসা বরফখণ্ডের ধাক্কা এমনই হবে। ট্রলারের রেলিং থেকে সাগরে চোখ রাখল দিমিতভ। একেবারে নিথর পানি। নড়ছে না কোনও হিমশিলা।

'দিমিতভ!' ভয় পেয়ে বিড়বিড় করল নিকোলভ।

তাকে পাত্তা না দিয়ে বো-র দিকে পা বাড়াল ক্যাপ্টেন। অনেকটা হালকা হয়েছে কুয়াশা। কিন্তু তার ফলে যে দৃশ্য দেখল, নিজ চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। সেই দিগন্ত-তক শুধু জমাট বরফের সাদা মাঠ!

'হায়, ঈশ্বর!' ফিসফিস করল দিমিতভ।

বরফের কঠিন প্রান্তর ভেদ করে চলা অসম্ভব।

কিন্তু কী করে এমন হলো?

সাগরের এদিকে এমন হওয়ার কথা নয়!

কয়েক সেকেণ্ড পর সত্যিই দিগন্তের কোলে মুখ তুলল

সূর্য।

কিন্তু সরাসরি সামনে নেই ওটা। অবাক কাণ্ড, লালচে গোলক ঝুলছে ডানদিকে, তাদের পেছনে!

এমন কী নিকোলভও বুঝল, কী সর্বনাশ হয়েছে। কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল সে, 'তুমি সারারাত উত্তর দিকে চলেছ!'

ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠল দিমিতভের। বারবার দিক ঠিক করে নিয়েছে ম্যাগনেটিক কমপাস দেখে। মেরুর এত কাছে ওই জিনিস মাঝে মাঝে উল্টোপাল্টা রিডিং দেয়। কিন্তু তাতে কী, সে তো অপেশাদার নাবিক নয়! সাগরে এত হিমশিলা দেখেই বোঝা উচিত ছিল, সামনেই মস্ত বিপদ!

'বুঝলাম না, কী করে...' শুরু করল দিমিতভ।

হাতের ঝাপটা মেরে তাকে থামিয়ে দিল দিমিত্রি নিকোলভ। 'আরে, গাধা, সবাইকে পৌঁছে দিয়েছ ভয়ঙ্কর নরকে!'

এতই বিস্মিত, হাঁটুতে জোর পেল না দিমিতভ। মনটা চাইল ধপ্ করে বসতে। কিন্তু বিপদ বুঝে নিজেকে সামলে নিয়ে থামল স্টার্নে। পেছনে জমে যায়নি সাগর। কপাল ভাল হলে পিছিয়ে গিয়ে এখনও বাঁচতে পারবে।

প্রায় ঠেলে নিকোলভকে সরিয়ে পাইলট হাউসের দিকে ছুট দিল দিমিতভ। কিন্তু ওখানে যাওয়ার আগেই আবারও ধুম্ করে ধাক্কা দিল কিছু!

এবার অনেক জোরে!

কাত হয়ে কমপক্ষে দশ ডিগ্রি সরল ট্রলার!

চিৎকার করে ক্রুদের বলল দিমিতভ, 'রিভার্স! রিভার্স! পিছিয়ে যাও!'

ডেকের তলায় গর্জন ছাড়ল ইঞ্জিন, পেছাতে লাগল যেযদা। কিন্তু ডান থেকে এল বো-তে গুঁতো। কাত হয়ে ভাসমান বরফখণ্ডের ওপর চেপে বসল ট্রলার।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে হুইলের সামনে থামল দিমিতভ। ঠেলে এক নাবিককে সরিয়ে খামচে ধরল থ্রটল। পিছাতে শুরু করে বাঁক নিল।

'কী যেন ধাক্কা দিচ্ছে!' আতঙ্কিত সুরে বলল নাবিক।

'স্রোতে ভেসে এসে বরফের চাঁই লাগছে,' বলল দিমিতভ। মনে মনে জানে, বলেছে ডাহা মিথ্যা।

ওই গুঁতো ইচ্ছাকৃত, আঘাত হানছে জেনে বুঝেই। কিলার ওয়েইল ও হাঙরের কথা মনে আছে দিমিতভের।

টলমল করতে করতে ব্রিজে ঢুকল নিকোলভ। 'ওটা সাবমেরিনও হতে পারে! এফএসবির কথা ভুললে চলবে না!'

ওদের কার্গো ও গুরুত্বের কথা ভাবল দিমিতভ। পুরনো কেজিবি ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে এফএসবি। কয়েক সপ্তাহ ধরে সাইবেরিয়ায় ধাওয়া করেছে তাদের এজেন্ট। নিশ্চয়ই এখনও খুঁজছে। অবশ্য তাই বলে সাবমেরিনে করে এসে গুঁতো দেবে ভাঙাচোরা ট্রলারে, এটা মেনে নেয়া কঠিন। হতে তো পারে বহু কিছুই, কিন্তু টর্পেডো মেরে বা গুঁতিয়ে ওদের মানব কার্গোসহ ট্রলার ডুবিয়ে দেয়ার কথা নয়।

বনবন করে হুইল ঘুরিয়ে ট্রলারের নাক সরাল দিমিতভ। পূর্ণ বেগ চাইল ইঞ্জিন থেকে। নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে বাড়তে লাগল গতি। হিমশিলার মাঝ দিয়ে পথ করে নিচ্ছে ট্রলার।

দূরে দেখল দিমিতভ, কালো সাগরে বরফখণ্ড নেই। একবার ওখানে পৌঁছুতে পারলে লেজ তুলে পালাবে ওরা। ভাবল, ঈশ্বর! মাত্র পাঁচটা মিনিট পেলেই...

একপাশ থেকে এল প্রচণ্ড গুঁতো। থরথর করে কাঁপতে শুরু করে ডানদিকে কাত হলো ট্রলার। উঠে এসেছে বো, ক'সেকেণ্ড পর ধড়াস্ করে নামল পানিতে। এ ধরনের হামলা হলে বেশিক্ষণ টিকবে না পুরনো, জং ধরা খোল।

পুরো থ্রটল খুলে দিল দিমিতভ। হিমখণ্ডে লেগে কর্কশ

শব্দ তুলছে ধাতব খোল। যে-কোনও সময়ে খসে পড়বে প্রপেলার।

‘ক্যাপ্টেন, বাঁচতে হলে গতি কমাতে হবে,’ সতর্ক করল নাবিক।

‘আগে যাব অন্তত এক মাইল!’ ধমকের সুরে বলল দিমিতভ, ‘তারপর কমিয়ে দেব গতি!’

কথা শেষ হতে না হতেই ধাক্কা এল পোর্ট সাইডে। বাঁশ ফাটা আওয়াজে বেজে উঠল বেসুরো অ্যালার্ম। ট্রলারের ভেতর বন্যার পানির মত ঢুকছে সাগরের জল।

‘সবাইকে উঠে আসতে বলো!’ নির্দেশ দিল দিমিতভ।

পাল্টা চেঁচিয়ে কী যেন বলল নাবিক, কিন্তু অ্যালার্মের আর্তনাদে চাপা পড়ল তার কথা।

‘সাহায্য চেয়ে রেডিয়ো করো,’ বলল নিকোলভ।

কড়া চোখে ওকে দেখল ক্যাপ্টেন দিমিতভ। ‘অনেক দেরি হয়ে গেছে।’

ডেক থেকে চিৎকার করল কে যেন! ‘আকুলা!’

রাশান ভাষায় ওটার অর্থ: হাঙর!

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল দিমিতভ। সাগরের কালো পানি চিরে আসছে আরও কালো কী যেন! লাগল ওঅটার লাইনের নিচে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল ক্যাপ্টেন।

পরক্ষণে এল আরেক ধাক্কা। আরও জোরে। ভারী কিছু গুঁতো দিয়েছে ট্রলারের খোলে। বার কয়েক আওয়াজ হলো ধুম্-ধুম্!

যেন বন্ধ ধাতব দরজায় প্রাণপণে কিল বসাচ্ছে কেউ। জীবন্ত টর্পেডোর মত খোলের ওপর হামলে পড়ছে একের পর এক হাঙর। আহত হতেও দ্বিধা নেই।

‘এসব কী হচ্ছে, দিমিতভ!’ কাঁপা গলায় বলল

নিকোলভ।

কিছুই স্পষ্ট নয় দিমিতভের কাছে। আগে কখনও দেখেনি এমন অবাক কাণ্ড!

কী কারণে যেন খেপে গেছে কিলার ওয়েইল আর হাঙররা!

স্টারবোর্ডের দিকে চেয়ে চমকে গেল দিমিতভ, যে-কোনও সময়ে কাছের হিমখণ্ডের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে ওরা!

'সাবধান! শক্ত করে কিছু ধরো!'

হিমখণ্ডের উঁচু একাংশে লেগে টলতে টলতে পিছিয়ে এল যেযদা। একবার দুলছে এদিকে, আবার ওদিকে। যখন-তখন কাত হয়ে তলিয়ে যাবে ট্রলার। ডেকে উঠে আসছে আস্ত সাগর!

'লাইফবোট নামাও!' আদেশ দিল দিমিতভ, 'জলদি!'

বসে নেই নাবিকরা, পৌঁছে গেছে স্টার্নে। পাঁচজন মিলে সাগরে নামাল লাইফবোট। দিমিতভ বুঝল, রয়ে গেছে পাইলট হাউসের নাবিক, দিমিত্রি নিকোলভ, নিচে রাখা ওই মানব কার্গো আর নিজে সে। 'লাইফবোটে ওঠো! দেরি কোরো না!'

নৌকায় নাবিকরা নামতেই নিচের ডেক লক্ষ্য করে ছুটল দিমিতভ। হ্যাচ খুলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। লোহার মেঝেতে ঘূর্ণি তৈরি করছে হাঁটু সমান পানি। এতই ঠাণ্ডা, অবশ হয়ে যেতে চাইল দুই পা। পানি ছিটিয়ে সবচেয়ে কাছের কেবিনের সামনে থামল সে। পকেট থেকে চাবি নিয়ে খুলে ফেলল তালা। জোরে ঠেলতেই আপত্তির শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা। মেঝের ওপর ছল-ছলাৎ আওয়াজ করছে সাগরের জল।

ধ্যানরত বুদ্ধের মত পা ভাঁজ করে সরু বাঙ্কে বসে আছে

পাঁচ বছরের ছোট্ট এক ছেলে। চাঁদের মত গোল মুখ। মাথা ভরা কালো চুল। বোঝার উপায় নেই, সে ইউরোপিয়ান না এশিয়ান।

'পাবলো!' ডাক দিল দিমিতভ, 'এসো!'

জবাব না দিয়ে সামনে-পিছে দুলে গুনগুন করে কী বলছে পিচ্চি ছেলেটা।

যে-কোনও সময়ে তলিয়ে যাবে ট্রলার। সামনে বেড়ে বাঙ্ক থেকে বাচ্চাটাকে কাঁধে তুলে নিল দিমিতভ। বেরোবে কেবিন ছেড়ে, কিন্তু তখনই আবারও কাঁপতে কাঁপতে একপাশে কাত হলো জাহাজ।

ধাতব শব্দে গুঙিয়ে উঠছে টইটম্বুর যেযদা। একপাশের দেয়াল ধরে তাল সামলে নিল দিমিতভ। বিশ ডিগ্রি কাত হলো কেবিন। তবে ভারসাম্য ফিরতেই ঊরু-সমান পানি ঠেলে করিডোরে বেরিয়ে এল সে।

গলা পেঁচিয়ে ধরে ঝুলছে পাবলো।

হুড়মুড় করে ট্রলারের খোলে ঢুকছে সাগরের জল। ওই স্রোত ঠেলে সিঁড়ির দিকে চলল ক্যাপ্টেন দিমিতভ। পণ করেছে, মরতে হলে মরবে, কিন্তু শেষ চেষ্টা করবে বাচ্চাটাকে বাঁচাতে। সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে গেল হ্যাচ কাভারের কাছে। লোহার ডালা খুলতেই ত্রিশ ডিগ্রি কাত হলো যেযদা, ডুবে যাবে যে-কোনও সময়ে!

পেছনের ডেক দেখল দিমিতভ। স্টার্ন থেকে তিরিশ গজ দূরে লাইফবোট। কিন্তু স্বস্তিতে নেই নাবিকরা। মনে হলো খুব ভীত সন্ত্রস্ত। বারবার আঙুল তুলে দেখাচ্ছে কী যেন, সাগরের পানিতে।

কয়েক সেকেণ্ড পর তাদের বোটের নিচে হাজির হলো কালো-সাদা প্রকাণ্ড এক অবয়ব। ওপরে উঠল ত্রিকোণ ডরসাল ফিন। পরক্ষণে দু'টুকরো হলো লাইফবোট। বোটের

এদিকে-ওদিকে ছিটকে পড়ল নাবিকরা। তাদের ওপর হামলা করল কালো লেজের কয়েকটা দানব। অসহায় মানুষের করুণ আর্তচিৎকার চিরে দিল নীরব পরিবেশ।

হতবাক দিমিতভ দেখল, কিলার ওয়েইলের পাল খুন করছে যেযদার নাবিকদেরকে!

আরও কাত হলো যেযদা। খোলা সব কেবিনেট থেকে সাগরে ভেসে গেল হালকা মালপত্র। হ্যাচ থেকে সরে গেল দিমিতভ। যে-কোনও সময়ে গড়ান দেবে ট্রলার। ওটার ভেতরের পানি ভেদ করে উঠে এল একরাশ বুদ্বুদ।

বাচ্চাকে কাঁধে রেখে রেলিং টপকে ঝাঁপ দিল দিমিতভ। পা পড়তেই পিছলে গেল জমাট বরফে। হাত থেকে ছুটে গেছে ছেলেটা। মুখ থুবড়ে পড়ে সরে যাচ্ছে দূরে।

প্রচণ্ড ও ভারী আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল দিমিতভ। সাগর তলদেশ লক্ষ্য করে রওনা হয়েছে তার ট্রলার। যেযদার বুকভরা দীর্ঘশ্বাস মস্ত সব বুদ্বুদ হয়ে বিস্ফোরিত হলো সাগর সমতলে।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত পর থমথম করতে লাগল চারপাশ।

টলমল করছে সাগরের কালো জল।

ভাসছে ভাঙাচোরা মালপত্র।

যেযদা ট্রলার যেখানে ছিল, ওখানে এখন ছোট বরফখণ্ড।

দক্ষিণে চোখ বোলাল দিমিতভ। ডুবে গেছে লাইফবোট। খুন হয়েছে নাবিকরা। ভেসে আছে ছেঁড়া দুটো লাইফ জ্যাকেট। খাওয়ার মত কিছু পাবে ভেবে ওখানে এখনও ঘুরঘুর করছে দুটো হাঙর। নির্জন সাগরের বুকে হিমশিলায় রয়ে গেছে শুধু বাচ্চা ছেলেটা আর সে নিজে!

কপাল ভাল, সমতল জায়গায় পড়েছে, নইলে পিছলে গিয়ে বেঘোরে ডুবে মরত সাগরে। তিনফুট পুরু সিমেন্টের কঠিন চাপড়ার মতই এই হিমখণ্ড।

ঘুরে পাবলোর দিকে তাকাল দিমিতভ। কার্গো আসলে ওই বাচ্চা ছেলে। এক লোকের হাতে পৌঁছে দিলে মিলত দশ মিলিয়ন ডলার। কাজটা নিয়েছিল বলেই খুন হয়েছে যেযদার নাবিকরা। নেই ওর সাধের যেযদাও।

ছেলেটাকে কেন এত দরকার ওই লোকের?

জানা নেই দিমিতভের। এখন আর ভেবেই বা কী হবে?

ভীষণ কনকনে ঠাণ্ডায় জমে যেতে চাইছে শরীর। উঠে দাঁড়াল দিমিতভ। দূরে দিগন্তজোড়া সফেদ মাঠ! প্রতিফলিত উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ।

লবণাক্ত সাগরে শত মাইল জুড়ে বরফ-প্রান্তরে আর কিছুই নেই! বলা হয় এটা মহাদেশ। কিন্তু এখানে, এই মহাদেশে এই মুহূর্তে আছে মাত্র দু'জন মানুষ!

আরেকবার সূর্যোদয়ের আগেই হয়তো মারা পড়বে ওরা!

দুই

চার হাত-পায়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে মাউণ্ট পুলিমাঙোর চূড়ায় উঠছে মিতা দত্ত, মনে ভীষণ ভয়। পাহাড়ে প্রায় দৌড়ে উঠে হাঁফ লেগে গেছে। পরিশ্রমের কারণে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে কাফ মাসল, আগুনের মত পুড়ছে ফুসফুস। কিন্তু গতি কমিয়ে দেবে, সে উপায় নেই!

দেখার মত সুন্দরী, সুশিক্ষিত, ছিপছিপে মেয়ে মিতা। সৌন্দর্য তার গায়ের রঙে নয়, চেহারায়। বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। যে-কেউ ঘুরে তাকায় দ্বিতীয়বার। ওর মা আমেরিকান,

তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছে বেদানার দানার মত ত্বকের রঙ। অবশ্য কাজলকালো বাঙালী দু'চোখ পেয়েছে বাবার কাছ থেকে। উনি ছিলেন বাঙালি ফিযিসিস্ট।

চট্ করে পেছনে তাকাল মিতা। পিছু পিছু আসছে বাদামি রঙা এক মেক্সিকান তরুণ। তার ত্রিশ ফুট নিচে কুচকুচে কালো, বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন। পাহাড় বেয়ে উঠতে গিয়ে স্টিম ইঞ্জিনের মত তাঁর নাক-মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে ফোঁসফোঁস আওয়াজ।

'আরও জলদি, স্যর। ভাবুন, কেউ আগুন দিয়েছে আপনার লেজে!' তাড়া দিল মিতা।

'আমার লেজ পেলে কই?' ভুরু কুঁচকে গতি বাড়ালেন হ্যারিসন।

'ওরা কিন্তু খুব কাছে চলে এসেছে!'

করুণ চোখে মিতাকে দেখলেন ডক্টর হ্যারিসন। ভাবছেন, 'বয়সটা পঁয়ষট্টি হোক, হাড়ে হাড়ে টের পাবে তখন!'

তরুণ গাইডের দিকে তাকাল মিতা। তার বয়স মাত্র বিশ। নাম পিকো। চিয়াপাস ইণ্ডিয়ান। 'আর কতটা দূরে?'

'আগে উঠতে হবে চূড়ায়,' ইণ্ডিয়ান সুরে ইংরেজি বলল পিকো। 'ওপাশেই সেই মন্দির।'

পরের দু'মিনিটে মাউন্ট পুলিমাঙ্গোর চূড়ায় উঠল ওরা।

হাঁটুতে দু'হাত রেখে কুঁজো হলেন প্রফেসর হ্যারিসন। এবার একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়।

থমকে গিয়ে ব্যাগ থেকে বিনকিউলার নিয়ে চোখে তুলল মিতা। ওরা আছে প্রায়-সুপ্ত এক আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কিনারায়। একহাজার ফুট নিচে পাহাড়ি লেক। সুনীল জলের মাঝে বর্শার ফলা আকৃতির দ্বীপ। মাঝের অংশ উঁচু, ঘন হয়ে জন্মেছে গাছপালা। মিতা পরিষ্কার বুঝল, ওই দ্বীপের জন্ম আগ্নেয়গিরির কল্যাণে। পাথুরে জমির ফাটল দিয়ে বেরোচ্ছে

গন্ধকের ভারী, হলদে ধোঁয়া, প্রায় ঘিরে রেখেছে দ্বীপের চারপাশ।

'ওই দ্বীপই তো?' পিকোর দিকে তাকাল মিতা।

মাথা দোলাল ইণ্ডিয়ান তরুণ। 'আইলা কিউবিয়ার্তা।'

'লুক্কায়িত দ্বীপ বা গোপন দ্বীপ,' মন্তব্য করলেন প্রফেসর হ্যারিসন।

মনোযোগ দিয়ে দ্বীপটাকে দেখছে মিতা।

বোধহয় ঠিক জায়গাতেই এনেছে পিকো। এখানে থাকার কথা ওই বিশেষ মায়ান সাইট। হাজারো বছর ধরে বলা হয়েছে: ওটা রহস্যময় এক আয়না। দ্বীপে ছিলেন মায়াদের আগুন-দেবতা তোহিল। কপালে অবসিডিয়ান আয়না। ওটাই বুঝিয়ে দিত, কত ক্ষমতাশালী দেবতা তিনি।

এবারের এই অভিযানে এসেছে ওরা ওই আয়না বা স্ফটিক খুঁজতে। ওকে বলা হয়েছে: আমেরিকান সরকারের শক্তিশালী সংগঠন এনআরআই থেকেই দেয়া হয়েছে সব খরচা। যা চাইছে তারা, ওটা পেলে উপকৃত হবে গোটা পৃথিবীর প্রতিটি দেশ।

'তুমি ঠিক জানো তো, ওই দ্বীপই?' আবারও জানতে চাইল মিতা।

'সত্যিই মূর্তি আছে,' জোর দিয়ে বলল পিকো। 'কয়েক বছর আগে আমাদের গ্রামের ওঝার সঙ্গে এসে দেখে গেছি। উনি বলেছিলেন, মায়া-দেবতার জন্যে একদম পাল্টে যাবে পৃথিবী।'

ধোঁয়াটে দ্বীপ থেকে চোখ সরিয়ে জ্বালামুখের ভেতর দিকে তাকাল মিতা। বেশ খাড়াভাবে নেমেছে ঢালু জমি। আছে অসংখ্য ফস্কা ও পিচ্ছিল পাথর। সতর্ক না হলে সোজা গিয়ে পড়বে একহাজার ফুট নিচের নরকে। জ্বালামুখ বেয়ে নেমে যাওয়ার কাজটা পাহাড়ে ওঠার চেয়েও ঢের কঠিন।

বিনকিউলার ব্যাগে রেখে কুচকুচে কালো চুল পনি টেইল করল মিতা। ঘর্মাক্ত ঘাড়ে শীতল হাওয়া পেয়ে খুশি। প্রফেসর হ্যারিসনের দিকে তাকাল। বসে পড়েছেন তিনি। এখনও বারবার ফুলে উঠছে বুক। লিনেনের খোলা শার্টের নিচে ভিজে চুপচুপ করছে টি-শার্ট। দরদর করে গাল বেয়ে নামছে ঘাম। কালো মুখে সরু কয়েকটা লোনা ঝর্না। পঁয়ষট্টি বছর বয়সের তুলনায় যথেষ্ট শক্তপোক্ত ডক্টর হ্যারিসন।

গত তিন দিন ধরে তাড়া খেয়ে পাগলের দশা হয়েছে ওদের। পালাবার সময় সঙ্গে নিতে পেরেছে মাত্র তিনটে ব্যাকপ্যাক। তাতে সামান্য রসদ ও খাবার।

'প্রফেসর, আপনি রেডি তো?' জানতে চাইল মিতা। ভাবছে, গতবারের মত মায়াবী চোখের ওই বাঙালী যুবক পাশে থাকলে আজ আর এত দুশ্চিন্তা করতে হতো না। কিন্তু মাসুদ রানার সঙ্গে যোগাযোগই করা গেল না।

মুখ তুলে মিতাকে দেখলেন প্রফেসর। মোটেও প্রস্তুত নন।

'এবার সাবধানে নেমে গেলেই হবে,' আশ্বস্ত করল মিতা।

'ছোটবেলায় ভাবতাম বড় হলেই সব সমস্যা শেষ, এখন বুড়ো হয়ে মনে হচ্ছে, তাড়া খেয়ে পালাচ্ছি সারাজীবন ধরে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত নাড়লেন হ্যারিসন। 'রওনা হও, ডক্টর মিতা, দেখি পিছু নিতে পারি কি না।'

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই নিউ ইয়র্কের নামকরা এক ইউনিভার্সিটি থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট করেছে মিতা। গত বছর অদ্ভুত এক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পাথর খুঁজতে গিয়ে ডক্টর হ্যারিসনের সঙ্গে চুঁড়ে বেরিয়েছে আমাযনের জঙ্গল। পেয়েছে মাত্র একটি স্ফটিক, ওটা এখন আছে এনআরআই হেডকোয়ার্টার-এ। ওটা থেকে বেরোচ্ছে বিপুল

পরিমাণ বিদ্যুৎ। এ ব্যাপারে গবেষণা করছে মিতা, ঘন ঘন যাতায়াত করছে এনআরআই ল্যাবে।

আর্কিওলজিকাল সাইটের শিলালিপি থেকে জেনেছেন ডক্টর হ্যারিসন, আরও আছে অমন পাথর বা স্ফটিক। এনআরআইকে তা জানাবার পর সমস্ত খরচ ও নিরাপত্তা দিতে চাইলেন এনআরআই চিফ।

কিন্তু মানা করে দিলেন তিনি। তাঁর সোজা কথা: একদল মার্সেনারি বা গার্ড নিয়ে ঘুরলে সবার চোখ পড়বে তাঁর ওপর। তাই চান পরিচিত মানুষ, যে বা যারা নিরাপত্তাও দেবে, আবার এনার্জি বিচ্ছুরণের ব্যাপারেও সাহায্য করবে তাঁকে।

এ পর্যায়ে প্রফেসরের কথায় মিতার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এনআরআই চিফ জেম্‌স্ ব্রায়ান। আলাপের শুরুতেই বললেন, 'খুব অনুরোধ করেছেন প্রফেসর হ্যারিসন, যাতে ওই স্ফটিকের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে তুমি যাও তাঁর সঙ্গে। কিন্তু আমি চাই না মেক্সিকোতে পা রাখো। নিরাপত্তার জন্যে মাসুদ রানাকেও পাশে চান ডক্টর। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় কোনও জরুরি কাজে ব্যস্ত ওই যুবক।'

যখন-তখন ভয়ানক সব বিপদের সম্ভাবনা, তবুও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্ফটিক পেতে মুখিয়ে ছিল মিতা। এনআরআই চিফকে জোর দিয়ে বলল, ও প্রফেসরের সঙ্গে যেতে আগ্রহী।

মাসুদ রানাকে পাশে না পেয়ে একটু হতাশ হলেও হ্যারিসন ভেবেছেন, ওই যুবকের কাছ থেকেই বিপদ এড়াবার কঠিন ট্রেনিং নিয়েছে মিতা। তারপর নামী-দামি কারাতে-জুডো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও ক্লাস করেছে কিছুদিন। কাজেই মন্দ করবে না মেয়েটা।

সত্যিই গত কয়েক দিনে নিজ যোগ্যতা প্রমাণ করেছে মিতা, নইলে অনেক আগেই খুন হতেন তাঁরা।

'মরে গেলেও আপনাকে বিপদে ফেলে যাব না,' বলেছে মিতা, 'তা ছাড়া, স্যর, আর্কিওলজির ব্যাপারে আপনি এক্সপার্ট, আমি তো নই। বড়জোর দেখব ফিযিক্সের কিছু বিষয়।'

'কিন্তু ওরা যদি আমাদেরকে ধরে ফেলে, তখন?'

'ওদের চাই ওই মূর্তি। ধাওয়া করে আমাদেরকে ধরতে যাবে না।' হাত বাড়িয়ে দিল মিতা।

চোখে সন্দেহ নিয়ে ওকে দেখলেন প্রফেসর, তারপর পেলব হাতটা ধরে উঠে দাঁড়ালেন। কিনারা থেকে সাবধানে নামতে লাগল ওরা। বারবার পিছলে যেতে চাইছে পা। কোনও কোনও জায়গায় নামছে হালকা দৌড়ের ভঙ্গিতে। বেশিক্ষণ লাগল না একহাজার ফুট নেমে আসতে। ওপরে শুনল চিৎকার। চূড়ায় উঠে পড়েছে শত্রুপক্ষের কয়েকজন!

'জলদি চলুন, প্রফেসর,' শেষ তিরিশ ফুট প্রায় দৌড়ে নামল মিতা। শক্ত জমি পেয়ে ছুটে গিয়ে থামল লেকের পারে। পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাহাড়ি, শীতল লেক-এ।

ওরা দ্বীপে যাওয়ার অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছে, এমনসময় চূড়ার কাছ থেকে গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র। ওদের চারপাশের পানিতে গাঁথল বুলেট। পিছলে গেল কয়েকটা। প্রাণের ভয়ে ডুব দিয়ে এগোল ওরা। কিন্তু একটু পর ভেসে উঠতে হলো দম নেয়ার জন্যে।

কটুগন্ধী গন্ধকের ধোঁয়ার মাঝে সবার আগে উঠেছে দক্ষ সাতারু মিতা। নাক কুঁচকে ফেলল। কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পাশে পৌঁছুল পিকো ও কৃষ্ণকায় প্রফেসর।

এদিকে থেমে গেছে গুলি। শোনা গেল আরেকটা আওয়াজ। অন্য দু'জন বোধহয় শুনতে পায়নি, কিন্তু বিপদ

বুঝে গলা শুকিয়ে গেল মিতার।

তীব্রগতি পাখার চাপা ধুব-ধুব আওয়াজ!

পুবের পাহাড়ের ওপর দিয়ে আসছে হেলিকপ্টার!

শত্রুদের পুঁজির ভেতর ছিল নতুন ওই কৌশল!

'ওই মূর্তিটা কোথায়!' জানতে চাইল মিতা।

আঙুল তুলে দ্বীপের পাহাড়ি অংশ দেখাল পিকো। 'চূড়ার ওদিকে। গাছপালার ভেতর। এদিক থেকে দেখা যায় না।'

কয়েক সেকেণ্ড পর তীরে পৌঁছুল ওরা। ছোটবড় গাছের ডাল ও ঝোপঝাড় ধরে উঠছে পাহাড়ি জমিতে। চূড়ায় উঠে দেখল বৃত্তাকার, সমতল এক অংশের মাঝে সত্যিই রয়েছে ওই মূর্তি। তবে মূর্তি বলা যায় কি না, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ওটা বিশাল এক চৌকো আকৃতির কালো পাথর। একদিকে খোদাই করা মায়ান কোনও রাজা। মাথায় বিচিত্র মুকুট। বুক-কোমরে নক্সা করা পোশাক। ডানহাতে জালের মত কিছু। ওখানে গোল চারটে পাথর। বামহাতে বিশাল ফুটবলের মত কী যেন। সেখানে লেখা হায়ারোগ্লিফ্স্। নিচে মুচড়ে আছে বিশাল এক সাপ। এক গ্রাসে রাজাকে গপ্ করে খেয়ে নেবে বলে মস্ত হাঁ মেলেছে।

শিলালিপির শিরোনামের গ্লিফ্ পড়লেন প্রফেসর হ্যারিসন: 'আহাউ বালাম মায়া জাগুয়ার রাজা। তিনিই ছিলেন ভ্রাতৃসঙ্ঘের আত্মার পথনির্দেশক।'

পিকোর পূর্বপুরুষ মায়াজাতির মানুষ, ভয় ও শ্রদ্ধা নিয়ে প্রাচীন রাজার মূর্তি দেখছে সে। একেবারে বিমোহিত হয়ে গেছেন পাঁড় আর্কিওলজিস্ট প্রফেসর হ্যারিসন। তবে এসব কিছুই স্পর্শ করল না মিতার মন। কীভাবে সামনের সমূহ বিপদ উৎরে উঠবে, তা নিয়ে চিন্তিত। আওয়াজ শুনে বুঝে গেছে, বড়জোর তিন মিনিট, তারপর হাজির হবে ওই হেলিকপ্টার। এদিকে জ্বালামুখ বেয়ে নামতেও বেশিক্ষণ

লাগবে না শত্রুপক্ষের অন্যদের।

'যা খুঁজছিলেন, সে-তথ্য পেলেন, প্রফেসর?' জানতে চাইল মিতা।

পাথরে খোদাই করা লেখা মন দিয়ে পড়ছেন হ্যারিসন। স্পর্শ করে দেখলেন একটা গ্লিফ। তারপর দ্বিতীয়টা। মনে হলো পড়েছেন দ্বিধার মাঝে।

'প্রফেসর?'

'ঠিক বুঝছি না,' মাথা নাড়লেন হ্যারিসন।

কাছে পৌঁছে গেছে হেলিকপ্টার। ইঞ্জিনের গর্জন বাড়ল। একটু পর কানফাটা শব্দে হাজির হবে মাথার ওপরের আকাশে।

'বড়জোর দু'মিনিট পাবেন, প্রফেসর,' বলল মিতা, 'আগেও পৌঁছে যেতে পারে।'

অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়লেন হ্যারিসন। 'এখানে তো কোনও গল্পই নেই! কোনও ব্যাখ্যাও দেয়নি। হাজারখানেক সংখ্যা দিয়ে কী বুঝব?'

'কোনও তারিখ-টারিখ?'

'না, খালি অজস্র সংখ্যা!'

প্রফেসরের কথা শুনে অবাক হয়েছে মিতা। মোটেও এমনটা হওয়ার কথা নয়!

'আসলে হয়েছে কী, এখন যদি...' শুরু করছিলেন প্রফেসর।

কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিল মিতা: 'এখন গবেষণার সময় নয়, স্যর।' ব্যাগ থেকে ক্যামেরা নিয়ে স্ক্রিনের দৃশ্য দেখল ও। ছবি তুলল কয়েকটা। হাজার হাজার বছরের প্রাকৃতিক অত্যাচারে ক্ষয়ে যাওয়া পাথর। ঝাপসা হয়ে প্রায় মুছে গেছে বহু অক্ষর। আরেক অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নিল মিতা। বিশেষ সুবিধা হলো না। পাওয়া গেল না ছবির যথেষ্ট ডেফিনেশন।

কাছে পৌঁছে গেছে হেলিকপ্টার। তবে ওটার ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজের ওপর দিয়েও শোনা গেল হৈ-চৈ। জ্বালামুখ বেয়ে নেমে আসছে তারা।

'অস্পষ্ট সব ছবি,' মন্তব্য করল মিতা।

ড্যাবড্যাব করে ক'সেকেণ্ড ওকে দেখলেন প্রফেসর, তারপর চট্ করে খুলে ফেললেন লিনেনের শার্ট। মূর্তির সামনে বসে মায়ান হায়ারোগ্লিফ্সের ওপর ডানহাতে রাখলেন ভেজা শার্ট। বামহাতে পাথুরে মেঝে থেকে নিলেন মুঠোভরা আগ্নেয়, ঝুরঝুরে মাটি। শার্টের পিঠে চেপে ধরছেন।

তাঁর কাজে সাহায্য করল পিকো।

বিকট আওয়াজে মাথার ওপর দিয়ে গেল হেলিকপ্টার। একটু দূরে থেমে ঘুরে গিয়ে খুঁজতে লাগল নামার জায়গা।

ওদিকে চেয়ে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দিল মিতা।

ছোট্ট এই দ্বীপে অবতরণের সুযোগ নেই।

সাহায্য করতে প্রফেসরের পাশে বসল মিতা। ভেজা শার্টের পিঠে ফুটিয়ে তুলছে চারকোল ড্রয়িঙের মতই ঝাপসা মায়ান অক্ষরের ছাপ। আপাতত এরচেয়ে বেশি কিছু করার নেই।

নিজেদের কাজে ব্যস্ত ওরা। কিন্তু মাথার ওপর ধীরে ধীরে ঘুরছে যান্ত্রিক ঘাসফড়িং। বিশালাকার ঘুরন্ত পাখার হাওয়ায় তৈরি হয়েছে তুমুল ঝড়— নানা দিকে উড়ছে শুকনো পাতা, ভাঙা ডালপালা, পাইনের কাঁটা, শুকনো ফল, তুষ, বালি ও মাটি।

'ব্যস, হাতে আর সময় নেই,' গলা ফাটিয়ে জানাল মিতা।

শিলালিপি থেকে শার্ট গুটিয়ে নিয়ে ব্যাকপ্যাকে রাখলেন প্রফেসর। এদিকে দশইঞ্চি ইঁটের সমান এক পাথর নিয়েছে মিতা, বারবার ওটা নামল মূর্তির গোলকের অক্ষরের ওপর।

ছুরি-কাঁচি ধার করার মেশিনের মত কাজ করছে চোখা পাথর। কমলা ফুলকি তুলে ছিটকে পড়ছে অমূল্য আর্টিফ্যাক্টের টুকরো!

কিন্তু হঠাৎ করেই ডালপালার মাঝ দিয়ে সাপের মত কিলবিল করে নামল ভারী ওজন নেয়া কয়েকটি দড়ি।

'এবার পালাতে হবে!' চেঁচিয়ে উঠল মিতা।

উঠে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল পিকো ও হ্যারিসন।

কপ্টারের দড়ি থেকে ঝুলছে নীল পোশাক পরা কয়েকজন, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। সরসর করে নেমে আসছে গাছের মাঝ দিয়ে।

ঘুরেই ব্যাগ থেকে নাইন এমএম গ্লক পিস্তল নিল মিতা। কিন্তু গুলি শুরু করার আগেই ওর শার্ট ভেদ করে ত্বকে গাঁথল ধাতব দুটো দাড়া। ব্যথা এতই তীব্র, ভীষণ চমকে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল মিতা। তাতেই থামল না যন্ত্রণা। দমকা হাওয়ায় পড়া বাঁশ পাতার মত ওকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিল টেইযারের হাইভোল্ট বিদ্যুৎ।

কাত হয়ে পড়ে আছে মিতা। ঝাপসা চোখে দেখল, চূড়ার ওপাশ দিয়ে দুদ্দাড় করে নেমে যাচ্ছে পিকো, পেছনে প্রৌঢ় হ্যারিসন। প্রফেসরকে গেঁথে নিতে পেছনে যাচ্ছে টেইযারের দাঁড়া। দৌড়ের ওপরেই বেসবলের পাকা খেলোয়াড়ের মত ডজ মেরে সরে গেলেন তিনি। কিন্তু তাতে রক্ষা নেই, ওপর থেকে এল সাবমেশিন গানের গুলি। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়লেন প্রফেসর। ছিটকে উঠেছে রক্ত। প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে গড়িয়ে অনেকটা নিচে গিয়ে পড়লেন তিনি।

আবারও বৈদ্যুতিক শক খেল মিতা। প্রচণ্ড ব্যথায় আরও ঝাপসা হলো দৃষ্টি। তারই মাঝে টের পেল, ওকে ঘিরে ফেলেছে ক'জন সশস্ত্র লোক। হাতদুটো পিছনে নিয়ে আটকে

দেয়া হলো হ্যাণ্ডকাফে। হেলিকপ্টারের পাখার হাওয়ায় চারপাশে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা। সেই সঙ্গে বিকট আওয়াজ।

আকাশের দিকে তাকাল অসহায় মিতা। ঘন জঙ্গলের ওপরে ভাসছে কালচে দানবীয় উড়োজাহাজ— সিকোরস্কি স্কাইক্রেন। দেখতে অনেকটা বাঘের থাবার মত। পেটের ভেতর রাখতে পারে অত্যন্ত ভারী মালপত্র। কেব্‌ল্‌ দিয়ে বেঁধে নিলে ছোট ট্যাঙ্ক বহন করাও কঠিন নয় ওটার জন্য। মায়ান রাজার মূর্তি নিয়ে যেতেই আনা হয়েছে ওটাকে!

প্রকাণ্ড কপ্টার থেকে মোটা চেইন ফেলতেই, মাত্র কয়েক

সেকেণ্ডে বেঁধে নেয়া হলো ওজনদার মায়ান পাথর। টানটান হলো শেকল। হ্যাঁচকা টান খেয়ে আকাশে উঠল রাজার মূর্তি।

মিতার পাশে এক লোক কোমর থেকে রেডিয়ো নিয়ে বলল, 'একটাকে ধরেছি!' চূড়ার কিনারার দিকে তাকাল সে। পিকো ও হ্যারিসন ওদিকে কোথাও নেই। 'পালিয়ে গেছে ওই স্থানীয় ছোকরা। কিন্তু বুড়ো হাবড়াটা মরে ভূত!'

মন খারাপ হয়ে গেল মিতার। এত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারল না মানুষটাকে!

'ধোঁয়া থেকে মেয়েটাকে বের করো,' বলল আরেক লোক। 'ওরা হেলিকপ্টার থেকে বাস্কেট নামাবে।'

টান দিয়ে দাঁড় করানো হলো মিতাকে, পরক্ষণে দু'জন লোক টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল ওকে।

চূড়ার যেদিক থেকে পড়েছেন প্রফেসর হ্যারিসন, সেদিকে চোখ গেল মিতার। তিরিশ ফুট নিচে মোটা এক গাছের কাণ্ডে লেগে কাত হয়ে থেমেছেন প্রফেসর। অত্যন্ত বেকায়দা ভঙ্গি। লাশের ডান চোখ খোলা, নেই প্রাণের একবিন্দু ছোঁয়া। টকটকে লাল রক্তে ভিজে গেছে টি-শার্ট।

মিতার মন চাইল, হাঁটু ভেঙে বসে বুক চাপড়ে কাঁদবে।

সত্যি, খুব অনুচিত হয়েছে নিরীহ মানুষটাকে এ দেশে আনা। অন্তত বাধা তো দিতে পারত! প্রফেসর খুব ভরসা করেছিলেন ওর ওপর। তাঁর ধারণা ছিল, মাসুদ রানার কাছ থেকে সবই শিখে নিয়েছে ও। এখন নিজেই বুঝতে পারছে, বাস্তবে শিখতে পারেনি কিছুই!

পেছন থেকে ঠেলা দিতেই আবারও সামনে বাড়ল মিতা।

পাঁচ মিনিট পর ওকে তুলে নেয়া হলো প্রকাণ্ড হেলিকপ্টারে।

হতাশ চোখে মিতা দেখল, একটু দূরেই বে-তে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে মায়ান রাজার মূর্তি। একবার দুলে উঠে রওনা হলো সিকোরস্কি স্কাইক্রেন। বুকে হাহাকার জাগল ওর। পেছনে পড়ে রইল ধূম্রাচ্ছন্ন দ্বীপে তরুণ পিকো আর মৃত প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন!

কালো আগ্নেয় মাটিতে নিথর পড়ে আছেন প্রফেসর হ্যারিসন। নিষ্পলক একটি চোখ দেখছে ঢালু জমিন। প্রায় খাড়া জমিতে গড়াতে শুরু করেই নিচের এই জঙ্গলের গাছে লেগে থেমেছেন। তাতে পিঠে লেগেছে বেদম ব্যথা। হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিল ব্যাকপ্যাক। ওটা হারিয়ে গেছে আরও নিচে কুয়াশার মত ধোঁয়ার ভেতর। সেই তখন থেকে অপলক দেখছেন ঢালু জমি। নড়বেন, সে সাধ্য নেই। সবই দেখেছেন, তাঁর সাধের মূর্তি ও স্নেহের পাত্রী মিতাকে হেলিকপ্টারে তুলে নিয়ে গেছে কারা যেন!

প্রফেসর বুঝতে পারছেন, অবশ হয়ে গেছে দেহের নিচের অংশ। শীত লাগছে বড্ড। তবে আপাতত প্রাণ আছে, শ্বাসও নিতে পারছেন, তাতেই তিনি খুশি।

গলা দিয়ে চিঁচিঁ করেও আওয়াজ বেরোচ্ছে না, দূরে থাক্

সাহায্যের আশায় চিৎকার। বড় একা লাগছে। তাঁকে চেপে ধরছে নিদারুণ ভয়। সত্যি শরীর অবশ হলে, সরে যেতে পারবেন না! সেক্ষেত্রে জ্বালামুখের এদিকটায় এসে তাঁকে পাওয়ামাত্র হাসতে হাসতে খুন করবে লোকগুলো!

নিজ চোখে দেখেছেন গুলি লেগেছে পায়ে। কত রক্ত যে বেরোল! এখন অবশ্য প্রায় শুকিয়ে এসেছে ওই স্রোত। কোমর থেকে নিচের অংশে কোনও অনুভূতি নেই। পাদুটো আছে ওপরের জমিতে, তাই উরু বেয়ে পেট ও শার্ট ভিজিয়ে দিয়েছে রক্ত।

বারবার পা নাড়াতে চাইছেন প্রফেসর, কিন্তু বিন্দুমাত্র সাড়া নেই। নিজের অসহায়ত্ব বুঝে রাগ ও দুঃখে কেমন পাগল পাগল লাগছে তাঁর।

চুপ করে পড়ে রইলেন। একটু পর ভাবলেন, মিতা ও তাঁর ভেতর কে আসলে বড় বিপদে আছে। আরও কিছুক্ষণ পর মন বলল, তাঁর তো মরে যাওয়ার কথা, তা হলে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে কেন শ্বাস! শুধু তাই নয়, চাপা একটা ব্যথাও শুরু হয়েছে দু'পা জুড়ে! ঠিক ব্যথাও নয়, ঝিনঝিনে অনুভূতি। যেন হালকাভাবে খুঁচিয়ে দেয়া হচ্ছে পিন বা কাঁটা দিয়ে। কিন্তু কেউ নেই যে তাকে বকবেন!

বাড়ছে অস্বস্তিকর ব্যথা। কষ্ট ও বিরক্তি বাড়তেই মন বলল, ওরে, নড়েচড়ে দেখ্ তো, উঠে দাঁড়াতে পারিস কি না!

নাড়তে গিয়ে বুঝলেন, সামান্য অনুভূতি ফিরেছে দু'হাতের বুড়ো আঙুলে। শরীর মুচড়ে কাত হলেন বামদিকে।

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে নতুন উদ্যমে নামলেন কাজে। একটু পর মুক্ত হলেন ঝোপ ও ডালপালার জটলা থেকে। প্যারালাইয হয়ে যে যাননি, তা ভেবে খুশি। একটু কষ্টও পেলেন মনে। বেড়ে গেছে গুলির ক্ষতের ব্যথা। আড়ষ্ট লাগছে শরীর। তার ওপর দুর্বলতার শেষ নেই! তবুও

হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক ফুট গিয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। গালে লাগছে ধুলোভরা ঢালু মাটি।

একটু বিশ্রাম নিয়ে মাথা তুলে আবছাভাবে দেখলেন চূড়ার দিকে কে যেন!

সে পুরুষমানুষ নয়, রুপালি পোশাকের ভদ্রমহিলা!

চোখ পিটপিট করলেন হ্যারিসন। তখনই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ছায়ামূর্তি।

আহত ও জ্বরাক্রান্ত হ্যারিসন ভাবলেন: কে ওই মহিলা? একটু আগেও ছিল ওদিকে!

জেদ ধরে দু'হাতের ভর দিয়ে উঠে বসলেন হ্যারিসন। হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন ঢালু জমিতে। টলমল করে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে হাল ছেড়ে দিলেন। এই শরীরে খাড়া জমি বেয়ে ওঠা সাধ্যের বাইরে। ছেঁচড়ে এগোলেন। হাতের তালুর নিচে কুড়মুড় শব্দে গুঁড়ো হচ্ছে আগ্নেয়মাটি। হঠাৎ হড়কে গিয়ে ফিরলেন আগের জায়গায়। তারপর সেখানেও রয়ে যেতে পারলেন না, পিছলে পৌঁছে গেলেন কুয়াশার মত ধোঁয়ার ভেতর। থামল না তাঁর পতন, শেষে স্থির হলেন লেকের কিনারায় নরম মাটিতে। পাশেই পেলেন আধঘণ্টা আগে খুইয়ে বসা ব্যাকপ্যাক।

লোভীর মত ওটা দেখলেন প্রফেসর হ্যারিসন। কাছে টেনে খুলতে চাইলেন যিপার। মনে হলো কাজটা খুবই কঠিন। আঙুল দিয়ে ছিঁড়তে চাইলেন যিপার। সফল হওয়ার আগেই শুনলেন লেকের পানিতে ছপ-ছপ শব্দ। ঘুরে তাকালেন তিনি।

অগভীর পানি ভেঙে তীরে উঠে আসছে পিকো। করুণ কণ্ঠে বলল তরুণ, 'হেলিকপ্টারে করে তুলে নিয়ে গেছে মূর্তি, নিজের চোখে দেখেছি!'

'জানি,' মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'কিছুই করার ছিল

না।' রক্তাক্ত পা দেখালেন, 'আমাকে সরাতে চাইলে লোক ডাকতে হবে।'

'লোক পাব কই?' বলল পিকো। 'আমরা গ্রাম থেকে অনেক দূরে।'

ওর সাহায্য নিয়ে ক্ষতটা ড্রেস করলেন হ্যারিসন। কাজটা শেষ হওয়ায় ওঅটারপ্রুফ কন্টেইনার থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করল পিকো। যন্ত্রটা ঠিক আছে কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল, কিন্তু চালু হতে দেখা গেল জ্বলে উঠেছে সবুজ স্ক্রিন। ঠিকই ধরছে সিগনাল।

হাতে মোবাইল ফোন দেয়ায় ইনিশিয়েট বাটন টিপলেন প্রফেসর। কয়েক সেকেণ্ড পর লিঙ্কআপ হলো স্যাটেলাইটের সঙ্গে। ওয়াশিংটন ডি.সি.-র সিকিয়োর এক কমিউনিকেশন রুম থেকে কর্কশ কণ্ঠে কথা বলে উঠল এক লোক।

কিন্তু তাকে দিয়ে চলবে না প্রফেসর হ্যারিসনের। তিনি চান কর্তৃপক্ষের উঁচু পর্যায়ের কাউকে। তাই বললেন, 'প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন বলছি। আমি প্রজেক্ট মিররের সঙ্গে জড়িত। আমার কোড: সেভেন সেভেন সেভেন ওয়ান সিক্স। হামলা হয়েছিল আমাদের ওপর। সর্বনাশ হয়েছে মিশনের। তাই এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ানের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

তিন

প্রফেসর জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ানের আলাপের পর পেরিয়ে গেছে পুরো চব্বিশটি ঘণ্টা।

এ মুহূর্তে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্টের সামনে বসে আছেন ব্রায়ান। একবার হাত বুলিয়ে ঠিক করতে চাইলেন অবাধ্য ধূসর চুল। প্রেসিডেন্ট তাঁর পুরনো বন্ধু হলেও অস্বস্তির ভেতর রয়েছেন তিনি।

বিশাল ডেস্কের ওদিকে রাজকীয় চেয়ারে বসে অবহেলার সঙ্গে কিছু ডকুমেন্টে সই করছেন প্রেসিডেন্ট। কাজটা শেষ করে নিখুঁতভাবে গুছিয়ে নিলেন কাগজ, তারপর রেখে দিলেন পাশে। নিজে তিনি বয়সে বড় হলেও জুনিয়র বন্ধু এনআরআই চিফকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। সরাসরি জানতে চাইলেন, 'নিশ্চয়ই কোনও দুঃসংবাদ? আজকাল তোমার অফিস থেকে ফোন এলে ভয় লাগে! তো বলে ফেলো কী হয়েছে!'

ভাঁজ করা কাগজটা প্রেসিডেন্টের দিকে ঠেলে দিলেন ব্রায়ান। 'আমি অবসর নিতে চাইছি।'

পদত্যাগের চিঠিটা দেখলেন প্রেসিডেন্ট, হাতে নিলেন না। 'তুমি তো গলফ খেলো না। সিনেমাও দেখো না। কোনও নেশা নেই। শখ বলতেও লবডঙ্কা। রিটায়ারমেন্টের পর কী করবে?'

'চুপ করে বসে থাকব বাড়িতে।'

'তোমার মত যোগ্য এবং দক্ষ কাউকে এনআরআই চিফ হিসেবে পাওয়া খুব কঠিন হবে আমেরিকান সরকারের জন্যে। খুলে বলো তো কী হয়েছে, জেমস?'

মৃদু হাসি প্রেসিডেন্টের ঠোঁটে। ওটা দিয়েই মাত করেছিলেন কোটি ভোটারকে। ওই হাসি যেন বলে: সমস্যা? ভেবো না, সব কিছুরই সমাধান থাকে!

'মস্ত ঝামেলায় পড়েছি। তা-ও একটা নয়, দুটো। এসব সল্‌ভ্ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই ভাবছি অপমানিত হয়ে বিদায় নেয়ার আগে পদত্যাগ করাই ভাল।'

ডেস্ক থেকে রেযিগনেশন লেটারটা তুলে ফড়াৎ করে ছিঁড়ে ফেললেন প্রেসিডেন্ট, কাগজের টুকরো ট্র্যাশ-ক্যানে ফেলে বললেন, 'আমার সাধ্যমত করব, জেমস। তোমাকে পাশে চাই। খুলে বলো কী ধরনের সমস্যা।' একটু ঝুঁকে বসলেন। 'আলাপ করলে হয়তো বেরিয়ে আসবে সহজ কোনও পথ।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ব্রায়ান, তারপর কোলে ব্রিফকেস তুলে ওটা থেকে নিলেন দুটো কাগজ। রাখলেন প্রেসিডেনশিয়াল ডেস্কের ওপর।

প্রথম কাগজটা তুলে নিয়ে দেখলেন প্রেসিডেন্ট।

ওটা স্যাটেলাইট ছবি।

প্রশান্ত মহাসাগর চিরে আলাস্কার দিকে চলেছে রাশান নেভির একটি ফ্লিট।

দ্বিতীয় কাগজে ছোট কয়েকটি ছবি, সঙ্গে কিছু তথ্য।

রওনা হয়েছে চাইনিজ নেভির একটি নৌবহর। তাদের সঙ্গে জুটে গেছে কয়েকটা বাণিজ্য তরীও।

'আগেও দেখেছি এসব,' বললেন প্রেসিডেন্ট, 'সকালে কথাও হয়েছে রন ল্যাডলওর সঙ্গে।' ল্যাডলও নেভির চিফ অভ স্টাফ। 'এতে দুশ্চিন্তার কিছু দেখছি না। কয়েকটা ক্রুযার, আধডজন ডেস্ট্রয়ার, কয়েকটা রেকোন্যাসেন্স এয়ারক্রাফট। কিন্তু এসব দিয়ে আর যাই হোক, আলাস্কা দখল করতে পারবে না ওরা। ওই একই কথা খাটে চাইনিজদের ব্যাপারেও।'

'তা জানি,' মাথা দোলালেন ব্রায়ান। 'ওরা হামলাকারী দল নয়। তবে মনোযোগ দিলে বুঝবেন, বেছে নিয়েছে সেরা দ্রুতগামী জাহাজ। ছড়িয়ে পড়ে এগোচ্ছে। এই যে...' বেয়ারিং সি-র ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইনের কাছে ম্যাপের নির্দিষ্ট জায়গায় আঙুল রাখলেন এনআরআই চিফ।

'ল্যাডলও বলেছে, ওরা সার্চ পার্টি,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'আমিও একমত,' সায় দিলেন ব্রায়ান, 'কিন্তু সার্চ করার মত কী আছে ওদিকে? এত ব্যস্ত কেন তারা? এর কোনও কারণ বের করতে পেরেছে আমাদের নেভি?'

আরেকবার স্যাটেলাইট ছবি দেখলেন প্রেসিডেন্ট। চুপ করে আছেন।

নতুন তথ্য পাওয়ার জন্যে বললেন এনআরআই চিফ, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমি খোঁজ নিয়েছি। বেয়ারিং সি-র ওদিকে আকাশ থেকে কিছুই পড়েনি। সব চ্যানেল মনিটর করেও পাওয়া যায়নি কোনও ডিসট্রেস কল। স্যাটেলাইট ছবিতেও নেই অয়েল স্লিক বা কোনও ডেব্রি। ইনফ্রারেড স্ক্যান থেকেও জানা গেছে, কোনও বিস্ফোরণ হয়নি যে হিট স্পাইক হবে। আসলে এমন কিছুই নেই, যা থেকে ধরে নেব, আকাশ থেকে পড়েছে এয়ারক্রাফট, বা তলিয়ে গেছে কোনও ভেসেল। অথচ, প্রায় একইসময়ে সার্চের জন্যে রওনা হয়েছে দু'দেশের নেভি ও কয়েকটি বাণিজ্য জাহাজ। সেক্ষেত্রে কেন অন্যদেরকে দৌড়ে হারিয়ে ওখানে পৌঁছুতে চাইছে?'

মৃদু হাসলেন প্রেসিডেন্ট, 'বলো তো, আসলে কী জানতে চাও, জেমস?'

'ওদিকের সাগরে কী আমাদের সাবমেরিন আছে? সোনার থেকে কিছু জানা গেছে, যেটা থেকে বুঝব, একইসময়ে ওদিকে ছিল রাশান বা চাইনিজ সাবমেরিন?'

'দুঃখজনক, তবে ওদিকে আমাদের নৌযান ছিল না,' বললেন প্রেসিডেন্ট। তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন জুনিয়র বন্ধুকে। 'ওখানে ওরা কী খুঁজবে বলে ভাবছ?'

'আমরা এখনও আছি অন্ধকারে,' বললেন ব্রায়ান।

'কিন্তু কিছু আঁচ করছ। নইলে আমার অফিসে আসতে না।'

আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলোর চিফরা কোনও বিষয়ে জানতে চাইলে তোলপাড় করেন গোটা দুনিয়া। এরপরও দরকারী তথ্য না পেলে চুপ থাকেন। কিন্তু ওই বিষয়ে হঠাৎ প্রেসিডেন্ট বা তাঁর স্টাফদের কাছ থেকে তলব এলে, তখন সত্যিকারের বিপদে পড়েন তাঁরা।

বাধ্য হয়েই মুখ খুললেন ব্রায়ান, 'রওনা হয়েছে রাশান ফ্লিট, কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টা আগে বেয়ারিং সি-র এক জায়গা থেকে এসেছে গামা রে। বড় বিস্ফোরণ নয়। কিন্তু ওই ধরনের এনার্জি ওখানে খুবই অস্বাভাবিক।'

'গামা রে?' নড়েচড়ে বসলেন প্রেসিডেন্ট। 'তুমি তো জানো, ভাল লাগত না সায়েন্স। তাই পড়েছি আইন। একটু খুলে বলো কী হয়েছে।'

'গামা রে আসলে হাই-এনার্জি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ,' বললেন ব্রায়ান, 'হাইপার-পাওয়ারফুল এক্স-রে বা নিউক্লিয়ার সার্জারির মত কাজে ব্যবহার করা হয়। অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করতে গবেষণা চলছে। ভবিষ্যতে হয়তো আকাশ থেকে ফেলে দেয়া যাবে মিসাইল। অথবা, খতম হবে হাজার হাজার সৈনিক।'

ভুরু কুঁচকে ফেললেন প্রেসিডেন্ট। 'তা হলে এ কথা আমাকে বলেনি কেন ল্যাডলও?'

'উনি বোধহয় জানেন না,' বললেন এনআরআই চিফ। 'তাঁর স্যাটেলাইটগুলো এ ধরনের জিনিস স্ক্যান করে না। আপনাকে এখন যে তথ্য দিচ্ছি, তা এসেছে গতবছর লঞ্চ করা এনআরআই স্যাটেলাইট থেকে।'

চুপ করে অপেক্ষা করছেন প্রেসিডেন্ট।

আবারও মুখ খুললেন ব্রায়ান, 'একইসময়ে মহাশূন্যে আর্কটিক সার্কেলের ওপরে ছিল আমাদের চারটে জিপিএস স্যাটেলাইট, সবই জিয়োসিনক্রোনাস অরবিটে ঘুরছে সুমেরু

সার্কেলে। গামা রে বিচ্ছুরণ হওয়ায় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য অন্ধকার হয়ে যায় প্রতিটি। তারপর চালু হয় নতুন করে। তবে ওরা প্রত্যেকেই রেকর্ড করেছে ওই বিচ্ছুরণ।'

প্রেসিডেন্টের হাতে আরেকটা প্রিন্টআউট দিলেন ব্রায়ান। 'আপনি জানেন, এসব জিপিএস স্যাটেলাইটে রয়েছে অ্যাটমিক ক্লক, প্রতি সেকেণ্ডের লক্ষভাগ সময় হিসাব কষতে পারে ওগুলো। সঠিকভাবে বুঝতে পারে টার্গেটের দূরত্ব। কিন্তু লগ অনুযায়ী এক সেকেণ্ডের এক বিলিয়নভাগের একভাগ সময়ে বন্ধ হয়েছিল চারটে জিপিএস স্যাটেলাইট। গ্রাউণ্ড বেয্‌ড্ কোনও সিস্টেম নেই যেটা চার জায়গা থেকে অত নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করবে সময়।'

'এসব থেকে কী বুঝব?'

'ওই চার স্যাটেলাইট বন্ধ হয় বিশেষ কোনও দুর্যোগের কারণে।'

কাগজটা কয়েক সেকেণ্ড দেখে নিয়ে এনআরআই চিফের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'তো তুমি বলতে চাও, ওটা কোনও অস্ত্র, যেটা ছিল কোনও সাবমেরিনের ভেতর? ত্রুটির কারণে ওভারলোড হওয়ায় ধ্বংস হয়েছে ওটার প্ল্যাটফর্ম। তাই ওটার ধ্বংসস্তূপ উদ্ধার করতে রওনা হয়েছে চিনা ও রাশান সার্চ পার্টি? দু'দলেরই চাই ওই জিনিস। আর আমরা এ ব্যাপারে পিছিয়ে পড়েছি?'

'হতে পারে,' বললেন ব্রায়ান, 'তবে আমরা অন্য একটা সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছি। আমাদের মতই প্রায় একইসময় থেকে এনার্জি ওয়েপন্সের ওপর গবেষণা করছে রাশা ও চিন। হয়তো অস্ত্র পরীক্ষা করেছে সাগরের ওদিকে।'

কাগজগুলো এনআরআই চিফের দিকে ঠেললেন প্রেসিডেন্ট। 'বুঝলাম। তো এ ব্যাপারে কাজে নামলে কী ধরনের সহায়তা বা ইকুইপমেন্ট লাগবে তোমার?'

‘প্রথমত, চাই যথেষ্ট সময় ও এনএসএর ভল্টের ডেটা। তাতেই হবে না, কাজে লাগাতে হবে প্রশান্ত মহাসাগরে আমাদের প্রতিটি সোনার। চাইব না এনএসএ, সিআইএ বা অন্য কোনও সংস্থা আমাদের সংগৃহীত ডেটা জেনে নাক গলাবে, বা প্রশ্ন তুলবে। তাই ওই বিষয়ে দিতে হবে পুরো ব্লকেড।’

এনআরআই চিফের কথা শুনে মনে মনে হোঁচট খেয়েছেন প্রেসিডেন্ট। লালচে হয়ে গেল চেহারা। ‘জেম্‌স, পাগল হলে? কেন ভাবছ, ওরা এ ধরনের আবদার মানবে?’

টুঁ শব্দ করলেন না ব্রায়ান। অন্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির থেকে নানা দিক দিয়েই আলাদা এনআরআই, তা ভাল করেই জানেন প্রেসিডেন্ট। এ কারণেই সবসময় এ সংস্থার চিফের পাশে থেকেছেন তিনি। এবারও তার ব্যত্যয় হবে না ভাবছেন ব্রায়ান।

‘প্রায় সব সুযোগ সুবিধা পাবে, কিন্তু সোনার লাইন দেয়া অসম্ভব,’ বললেন প্রেসিডেন্ট। ‘খুবই কাছে পৌঁছে গেছে রাশান ফ্লিট, এই অবস্থায় ল্যাডলওকে সোনার ব্লক করলে, স্রেফ উন্মাদ হবে সে। তবে অন্য ব্যবস্থা হতে পারে। তোমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সোনারের সব তথ্য নিয়মিত দেবে নেভি। তোমাকে পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। পরে জরুরি প্রয়োজন পড়লে কমিয়েও দিতে পারি সময়টা বা বাতিলও করতে পারি আদেশ।’

মৃদু মাথা দোলালেন ব্রায়ান। ভাবছেন, যাক, আদায় করা গেছে অনুমতি!

‘এবার আসি আমার দ্বিতীয় সমস্যার বিষয়ে,’ ব্রিফকেসে নোটগুলো রাখলেন। ‘কখনও কোনও অনুরোধ করিনি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আজ একটা সাহায্য চাইব আপনার কাছে।’

'ব্যক্তিগত অনুরোধ?'

'ধরুন, তা-ই।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন ব্রায়ান, তারপর বললেন, 'কিডন্যাপ হয়েছে আমার প্রিয় একজন। তথ্য পেয়েছি: যারা ওকে তুলে নিয়ে গেছে, তারা কাজ করে চাইনিজ বিলিয়নেয়ার হুয়াং লি ল্যাং-এর হয়ে। আমি চাই ওই লোকের কব্জা থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে আনতে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। 'কী করে? ভাল করেই জানো দুনিয়া জুড়ে কী চলছে! আমাদের কোনও ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কেউ মহাচিনে ধরা পড়লে মুখ থাকবে না আমেরিকার।'

'জানি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

'তা হলে কেন?'

হঠাৎ এ প্রশ্নে বিস্মিত হয়েছেন ব্রায়ান। 'ঠিক কী জানতে চাইছেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট?'

'ওই মেয়ের কাছে জরুরি কোনও তথ্য আছে, যেটা আমাদের বিপক্ষে যাবে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'না, তা নেই,' বললেন ব্রায়ান, 'কিন্তু আমরা সাহায্য না করলে দুনিয়া থেকে হারিয়ে যাবে মেয়েটি। প্রয়োজন মিটে গেলে অত্যাচার করে ওকে মেরে ফেলবে হুয়াং লি ল্যাং।'

থমথম করছে প্রেসিডেন্টের মুখ। 'তুমি বা আমি আমেরিকান সরকারের হয়ে কাজ করেছি এবং করছি। এই ঝুঁকি নিতে হবে, সেটা জানত না ওই মেয়ে?'

'ওই মেয়ে এনআরআই-এর এজেন্ট নয়,' সামান্য দ্বিধা নিয়ে বললেন ব্রায়ান। 'অনুরোধ করে ওকে কাজে নিয়েছিলাম।'

'কার কথা বলছ?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'মিতা দত্ত,' নিচু স্বরে বললেন ব্রায়ান।

সামান্য কুঁচকে গেল তাঁর সিনিয়র বন্ধুর চোখ।

মিতার বিষয়ে প্রায় সবই জানেন প্রেসিডেন্ট।

নিউমোনিয়ায় প্রিয় স্ত্রীর মৃত্যু হলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি ব্রায়ান। নিঃসন্তান মানুষ, নিজের মেয়ের মতই ভালবাসেন মিতাকে। আর তা করবেনই বা না কেন?

ঘনিষ্ঠ বন্ধুর একমাত্র মেয়ে। কিন্তু একবছর আগে সত্যি ওকে চিনলেন তিনি। হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। দু'এক দিন দেখতে গেল অফিসের অনেকে, তারপর সবাই যেন ভুলে গেল তাঁর কথা।

কিন্তু ওই একটি মেয়ে প্রতিদিন যেত গোলাপ ও চকোলেট হাতে। গল্প করত মাথার পাশে বসে। জুগিয়ে দিত সাহস। তাঁর মনে হতো: তাই তো, দু'বার হার্ট অ্যাটাক হলেও আসলে কিছুই হয়নি!

সুস্থ হওয়ার পর নতুন উদ্যমে কাজে নেমে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

বিপদে পাশে থাকার অদ্ভুত গুণ মিতা পেয়েছে ওর বাবা বিনয় দত্তের কাছ থেকেই।

তাঁর মতই দক্ষ ফিযিসিস্ট মিতা। আরও কত গুণ যে আছে, অন্য কেউ না জানলেও ব্রায়ান জানেন। যেমন ওর সাহস, তেমনি ন্যায়নীতি বোধ।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে অবাক হন তিনি। সবই ছিমছাম। ধুলো বলতে কিছুই নেই। গুছিয়ে রাখা হয়েছে প্রতিটি আসবাবপত্র। বিছানায় পরিষ্কার চাদর। বেড-টেবিলে তাঁর প্রতিটি প্রয়োজনীয় ওষুধ।

পুরো সুস্থ হওয়া তক তাঁর পছন্দের পদ জেনে নিয়ে তা রেঁধে পাশে বসে পরিবেশন করেছে মিতা।

আপন মেয়ে থাকলে যা করত, তাই করেছে মেয়েটি।

এই মুহূর্তে আশা ও চরম উৎকণ্ঠায় দুলছে ব্রায়ানের মন। চুপচাপ চেয়ে আছেন প্রেসিডেন্টের দিকে।

মৃদু মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'তুমি জানো এই খেলার নিয়ম। কয়েক বছর ধরেই চিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আড়ষ্ট। তার ওপর সামনে নির্বাচন। ফুরিয়ে আসছে আমার টার্ম। এখন হুয়াং লি ল্যাং-এর ব্যাপারে ভুল পদক্ষেপ নিলে সর্বনাশ হবে। সমস্ত দায় পড়বে পার্টি এবং আমার ওপর। সরি, জেমস, পানি আরও ঘোলা করার সময় এখন নয়।'

'হুয়াং লি ল্যাং কিন্তু চিন সরকারের কেউ নয়,' বললেন ব্রায়ান, 'এমন এক চিনা নাগরিক, যে কি না কিডন্যাপ করেছে এ দেশের এক নাগরিককে।'

'ল্যাং সাধারণ কেউ নয়, চিনের সবচেয়ে বড় বিলিয়নেয়ার।' আরেকবার মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট।

হাল ছাড়লেন না এনআরআই চিফ। 'গোপনে কাজে নামতে পারি আমরা।'

চোখ থেকে চোখ সরিয়ে দরজা দেখলেন প্রেসিডেন্ট। 'এ ব্যাপারে আমার আর কিছু বলার নেই, জেমস।'

বড় করে দম দিলেন এনআরআই চিফ। অনুরোধ করে লাভ হবে না। দ্বিতীয়বার এই বিষয়ে ভাববেন না প্রেসিডেন্ট।

'পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ব আমরা,' নরম সুরে বললেন পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষটা। 'তবে সময় লাগবে কাজ হতে।'

মাথা দোলালেন ব্রায়ান। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওই গামা রে-র ব্যাপারে নতুন তথ্য পেলে দেরি না করে তা জানিয়ে দেব।'

ঘুরে দরজার দিকে চললেন তিনি।

সামনের ডকুমেন্টে চোখ রাখলেন প্রেসিডেন্ট, তবে দু'সেকেণ্ড পর জানতে চাইলেন, 'তোমার ওই দুই সমস্যার ভেতর কোনও সম্পর্ক আছে?'

বহু বছর হলো সরকারী চাকরি করছেন ব্রায়ান। ভাল

করেই জানেন, কখন উচিত তথ্য চেপে রাখতে হয়। ঘুরে তাকালেন তিনি।

চেয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। 'পূর্ণগতি তুলে বেয়ারিং সি-তে হাজির হয়েছে চাইনিজ ফ্লিট। এদিকে মেক্সিকো থেকে মিতা দত্তকে কিডন্যাপ করেছে চাইনিজ বিলিয়নেয়ার। এ-দুটো ঘটনার ভেতর কোনও সংযোগ নেই তো?'

'তেমন কিছু আমাদের জানা নেই।'

ভুরু কুঁচকে ব্রায়ানকে দেখলেন প্রেসিডেন্ট। 'বলো তো, জেমস, মিতা আসলে কী করছিল মেক্সিকোতে?'

অত্যন্ত গম্ভীর ব্রায়ান বললেন: 'ওর কাজ ছিল একটা স্ফটিক খুঁজে বের করে ওটা এ দেশে নিয়ে আসা। জটিল ফিযিক্সের সঙ্গে তা জড়িত। আমরা নিশ্চিত নই, তবে পৃথিবী রক্ষা বা ধ্বংসের সঙ্গে এটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।'

'ঠিক আছে, এ ব্যাপারে নতুন কোনও ডেটা পেলে জানাবে।' আবারও কাগজে নাক গুঁজলেন প্রেসিডেন্ট।

ওভাল অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন বিমর্ষ ব্রায়ান, হোয়াইট হাউসের পার্কিং লটের দিকে পা বাড়িয়ে ভাবলেন: মিতাকে সাহায্য করতে পারল না আমেরিকা। ক্ষুধার্ত বাঘের মত হিংস্র হুয়াং লি ল্যাং-এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবেন না তিনি।

তা হলে? কেউ কি নেই যে সাহায্য করতে পারবে?

অসহায় মানুষকে বাঁচাতে নিজ জীবন বাজি ধরতেও রাজি, এমন একজনের কথা মনে পড়ল এমআরআই চিফের।

হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করলেন, 'আছে এখন নিউ ইয়র্কে, কিন্তু সে কী রাজি হবে সাহায্য করতে?'

তাঁর মন বলল: কেউ যদি পারে মিতাকে উদ্ধার করতে, সে ওই বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বা বিসিআই-এর উজ্জ্বলতম তারকা, দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী এজেন্ট এমআরনাইন!

হ্যাঁ, জগতে অমন আর কেউ নেই! মাসুদ রানার দুয়ার থেকে খালি হাতে ফেরে না বিপদগ্রস্ত মানুষ।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখলেন তিনি, তারপর পকেট থেকে আইফোন নিয়ে কল দিলেন নিউ ইয়র্কে রানা এজেন্সির অফিসে।

চার

নিউ ইয়র্কে বিকেলের আকাশ কালচে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে: যে-কোনও সময়ে শুরু হবে মাঝারি থেকে ভারী তুষারপাত এবং সেইসঙ্গে দমকা হাওয়া।

কাজ গুছিয়ে নিয়ে যে যার বাড়ির পথে ছুটছে মানুষ। আগামী একঘণ্টার ভেতর ফাঁকা হয়ে যাবে শহরের রাস্তাঘাট।

রানা এজেন্সিতে নিজের অফিসে বসে আছে মাসুদ রানা, চোখ বোলাচ্ছে ফাইলে। ওটা দেখা শেষ হলেই ছুটি, আগামীকাল থেকে কোনও কাজ নেই ওর। ভেবে বের করতে হবে কীভাবে কাটাবে সময়।

আজকের মত কাজ শেষ করে বিদায় নিয়েছে প্রায় সবাই। অবশ্য রয়ে গেছে রিসেপশনিস্ট সৈকত। গত একবছর হলো ওপরতলায় রানার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টের গেস্টরুমে আস্তানা গেড়েছে ও। শেষপর্যন্ত জমাতে পেরেছে যথেষ্ট টাকা। ক'দিন পর ফিরছে দেশে। বিয়ে করবে স্বপ্নের রানি, দূরসম্পর্কের খালাতো বোন তৃষ্ণাকে। জানেও না, ওদের বিয়েতে উপহার হিসেবে মোটা অঙ্কের তহবিল গড়েছে

রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখার সবাই মিলে। দেশে যাওয়ার সময় তুলে দেয়া হবে সৈকতের হাতে।

রিপোর্ট দেখা শেষ করে মন্তব্য লিখে সই করবে রানা, এমনসময় বেজে উঠল ইণ্টারকম।

রিসিভার তুলে বলল রানা, 'ইয়েস, প্লিয?'

ওদিক থেকে বলল সৈকত, 'মাসুদ ভাই, এনআরআই চিফ। নিয়ে আসব?'

'নিয়ে এসো।' ইণ্টারকম রেখে সামনে থেকে ফাইল সরাল রানা, চিন্তিত। মাঝসকালে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেছেন জেমস ব্রায়ান। নিউ ইয়র্কে এসে দেখা করবেন। কিন্তু কেন তখনই আলাপ করলেন না, ব্যাপারটা কৌতূহল উদ্রেক করছে ওর।

এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ানকে চেনে রানা, তবে ঘনিষ্ঠতা নেই। আগেও বিসিআই-এর এক মিশনে তাঁর সংগঠনের সঙ্গে কাজ করেছে ও।

সৈকত দরজা খুলে হাতের ইশারা করতেই রানার কামরায় ঢুকলেন ব্রায়ান। পেছন থেকে আকাশে দুটো আঙুল তুলল সৈকত। মৃদু মাথা দোলাল রানা। এনআরআই চিফের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

রানা চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়াতেই করমর্দন করলেন জেমস ব্রায়ান।

'বসুন,' আরামদায়ক চেয়ার দেখাল রানা।

ধপ্ করে চেয়ারে বসলেন ব্রায়ান। কৌতূহলী চোখে তাঁকে দেখছে রানা। ভদ্রলোকের চোখে-মুখে চরম দ্বিধা ও অস্বস্তি।

'বলুন?' স্বাভাবিক সুরে বলল রানা।

কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে তারপর বললেন এনআরআই চিফ, 'বিপদে পড়ে সাহায্য চাইছি। বিষয়টি ব্যক্তিগত।' চুপ

হয়ে গেলেন তিনি।

মৃদু হাসল রানা। 'আপনি এনআরআই চিফ, বিপদে পড়ে এসেছেন দরিদ্র একটি দেশের সামান্য এক গুপ্তচরের কাছে?'

ওকে দেখছেন জেমস ব্রায়ান, মুখে রা নেই।

চোখে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে রানা।

'ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ছুটে এসেছি, কারণ মনে হয়েছে সাহায্য পাব আপনার কাছে,' বললেন ব্রায়ান।

'চাইলেই তো মাঠে নামাতে পারেন আপনার শতখানেক এজেন্ট,' বলল রানা।

'নীতির কারণে তা পারি না। যেহেতু ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও আলাপ করেছি। বলেছেন, কোনও সাহায্য করতে পারবেন না তিনি।'

'কী বিষয়ে সাহায্য চাইছেন?'

'আপনার কি মনে আছে মিতা দত্তের কথা?'

'হ্যাঁ।'

'বিপদটা আসলে ওর।'

গতবছর এনআরআই-এর জটিল এক মিশনে যান ডক্টর জর্জ হ্যারিসন নামে কৃষ্ণ বর্ণের এক আর্কিওলজিস্ট। তাঁর সঙ্গে ছিল মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত অপূর্ব সুন্দরী, চব্বিশ বছর বয়সী ফিযিসিস্ট মিতা দত্ত। ওদের নিরাপত্তার জন্যে এনআরআই থেকে কয়েকজন মার্সেনারিকে ভাড়া করা হয়, কিন্তু সবাই নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল শত্রুপক্ষের হাতে। তখন বাংলাদেশ সচিবালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি, ফুপাতো ভাই অপরেশ ব্যানার্জির কাছে ফোন দেয় অসহায় মিতা।

ভদ্রলোক যোগাযোগ করেন বিসিআই-এ।

ছুটিতে ব্রাযিলে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাফায়ালের কফি প্ল্যান্টেশনে ছিল রানা। ওরা ঠিক করে, রাফায়ালের সদ্য কেনা ভাঙাচোরা

দুটো হেলিকপ্টার মেরামত হলে, ওগুলো বিক্রির টাকা সমানভাগে ভাগ করে নেবে দু'জন। পরে ও-দুটো কিনে নেয় শ্রীলঙ্কান আর্মি। নিজের ভাগের টাকা দাতব্য একটি সংগঠনে দান করেছিল রানা।

একটা হেলিকপ্টার প্রায় মেরামত করেছে, এমনসময় সন্ধ্যায় ফোন দিলেন বিসিআই থেকে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। দু'চার কথার পর ওকে বললেন, ছুটির এ সময়ে মিতা দত্তকে সাহায্য করলে তিনি খুশি হবেন। ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে মেয়েটার, এ অভিযানে বাংলাদেশের জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু পাওয়া গেলে তা বিসিআই-এর হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করবে না ও।

রানাও ভেবেছে, ওর উচিত মেয়েটার পাশে থাকা।

পরদিন দুপুরে প্ল্যান্টেশনে এসে দেখা করল মিতা। সরাসরি বলল, 'আমার ভাই ফোন করে বলেছেন, আপনি হয়তো আমাকে সাহায্য করবেন। তাই চলেই এলাম।'

রানার মনে হলো, অদ্ভুত রূপসী মেয়েটির আচরণ খুব সাবলীল ও সহজ। অভিযানে কোথায় যেতে হবে জানার পর অল্প কথায় রানা জানাল, 'যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমাযনে ঢোকার পর থেকে আমার নির্দেশের বাইরে যাওয়া চলবে না।'

'তাই হবে,' খুশি মনে রাজি হয়েছিল মিতা।

এরপর জড়িয়ে গেল ওরা আমাযনের জঙ্গলে বিপজ্জনক এক মায়ান অভিযানে। নানান দিক থেকে এল হামলা। এক জার্মান বিলিয়নেয়ারের ব্যক্তিগত আর্মির বিরুদ্ধে লড়ল রানা। মায়ান মন্দিরে ওদের ওপর হামলে পড়ল অদ্ভুত কিছু মিউটেড জন্তু, প্রায় মরতে মরতে রক্ষা পেল ওরা। আরও বহু ঝামেলা পোহাবার পর মিলল মাত্র একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী স্ফটিক।

ওটার বিষয়ে বিসিআই চিফকে রানা ফোন দিলে, তিনি জানান, আপাতত অমন গবেষণার জন্যে তৈরি নন বাঙালী ফিযিসিস্টরা। কাজেই ওই স্ফটিক যেন দেয়া হয় এনআরআই-কে। তাদের গবেষণা সফল হলে উপকৃত হবে গোটা পৃথিবীর মানুষ।

রানার মনে আছে, আগে থেকেই মিতা জানত আত্মরক্ষার জন্য আনআর্মড্ কমব্যাট। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া মেয়েটির খুব আগ্রহ দেখে কুংফুর নতুন কিছু কৌশল ও নানান আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছিল ও।

এনআরআই চিফের কাছে জানতে চাইল রানা, 'কী ধরনের বিপদে পড়েছে মিতা?'

খুট্ করে খুলে গেল অফিসের দরজা। উদয় হলো সৈকত। দু'হাতে সুন্দর এক ট্রের ওপর রাখা চমৎকার ডিযাইনের দুটো মগ ও এক প্লেট অলিম্পিক নোনতা বিস্কিট।

রানা ও মিস্টার ব্রায়ানের সামনে কফির মগ ও বিস্কিটের প্লেট রেখে বিদায় নিল সৈকত।

হাতের ইশারায় কফি ও বিস্কিট দেখাল রানা।

মাথা দোলালেন ব্রায়ান। হাতে নিলেন না কফির মগ। 'ওই বিপদের নাম হুয়াং লি ল্যাং। মিতাকে মেক্সিকো থেকে তুলে নিয়ে গেছে ওই চাইনিজ বিলিয়নেয়ার। প্রয়োজন মিটে গেলেই খুন করবে। এদিকে হাত-পা বাঁধা আমার। কিছুই করতে পারব না। তাই এসেছি আপনার কাছে সহায়তা পাওয়ার আশায়।'

'মিতা এখন কোথায়?' কড়া কফির মগ ঠোঁটে তুলে মৃদু চুমুক দিল রানা।

'খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ওকে আটকে রেখেছে হংকং-এ নিজের দুর্গের মত প্রকাণ্ড অফিস দালানে।'

চুপ করে আছে রানা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'মিতাকে

চাইনিজ বিলিয়নেয়ারের খপ্পর থেকে ছুটিয়ে আনতে হলে, চাই যথেষ্ট প্রস্তুতি। লাগবে প্রয়োজনীয় টাকা, সেটা কি দেবে আমেরিকান সরকার?'

মৃদু মাথা নাড়লেন জেমস ব্রায়ান। 'না, তা দেবে না।'

'তা হলে?'

'টাকা যা লাগে, সেটা আমিই দেব।'

'কেন দেবেন?'

'কারণ মিতাকে নিজের মেয়ের মতই মনে করি আমি। ওর বাবা ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তা ছাড়া, মিতার কাছে আমি ঋণী। নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা করব না।'

কিছুক্ষণ ভেবে তারপর বলল রানা, 'এ ধরনের মিশনে গেলে খরচ হতে পারে লাখ লাখ ডলার।'

'জানি। সেজন্যে এরই ভেতর অফিসের ফাণ্ড থেকে আমার প্রাপ্য সমস্ত টাকা তুলে নিয়েছি। আপনি রাজি হলেই আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে সব টাকা ট্র্যান্সফার করে দেব।'

নীরবে বসে আছে রানা।

'মিস্টার রানা, বন্দি এক মেয়ের অসহায় বাবার অনুরোধঃ দয়া করে মিতাকে ফিরিয়ে আনুন,' মাথা নিচু করে নিজের দু'হাত দেখছেন এনআরআই চিফ।

সিআইএ বা এনএসএর মতই শক্তিশালী সংস্থা এনআরআই, সেই সংগঠনের বড়কর্তা কাতর হয়ে সাহায্য চাইছেন, যেন চাইনিজ এক দানবের হাত থেকে রক্ষা করা হয় তাঁর মেয়েকে।

নরম সুরে বলল রানা, 'আপনার এই কাজটা হাতে নেব কি না, তা আগামীকাল সকালে ফোনে জানিয়ে দেব।'

'অন্তত জানব, সাধ্যমত করেছি,' চেয়ার ছাড়লেন জেমস ব্রায়ান। এতই চিন্তিত, ভুলে গেছেন কফি বা বিস্কিটের কথা।

ভদ্রতা করে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'গুড বাই, স্যর।'

একবার মৃদু মাথা দুলিয়ে অফিস ছেড়ে চলে গেলেন মিস্টার ব্রায়ান।

কয়েক সেকেণ্ড পর এনক্রিপ্টেড ফোনের দিকে হাত বাড়াল রানা। জরুরি আলাপ করবে বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সঙ্গে। বিড়বিড় করল রানা, 'খুকখুক করে কেশে নিয়ে ঠিক এই ভঙ্গিতে বলবে কট্টর বুড়োঃ জরুরি কোনও কাজ নেই, ইচ্ছে করলে তুমি যেতে পারো। পরে আমাদের দেশের কাজে আসবে ওর মত দক্ষ একজন নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট।'

কানে রিসিভার ঠেকিয়ে ডায়াল করল রানা। বুকের মাঝে ধুপ-ধাপ লাফ দিচ্ছে অস্থির হৃৎপিণ্ড। আজও কেন যেন ভয় লাগে ওই কট্টর বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে।

পাঁচ

ঘুটঘুটে আঁধার চিরে আসছে চিৎকারঃ 'তুমি কী দেখছ?'

ব্যথা! বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে গেছে মিতা। চোখ মেলতে চাইল। থরথর করে কাঁপছে শরীর। খুব ঠাণ্ডা! পরক্ষণে নরকের মত গরম! শিরার মাঝ দিয়ে বইছে বিষের মত কিছু!

তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর।

'তুমি কী দেখছ?' আবারও কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল কেউ।

বনবন করে ঘুরছে মাথা, হাজার ফুট ওপর থেকে ভয়ানক

কোনও নরকে পড়ছে মিতা! পতন ঠেকাতে হাত পেছনে নিয়ে ধরতে চাইল কিছু। কিন্তু কোনও হাতল বা পিঠ নেই এই চেয়ারে। আছে শুধু টেবিলের কিনারার মত কিছু।

সূর্যের মত আলো নিভে জ্বলে উঠল নরম বাতি। মিতার মুখের খুব কাছে এল একটা মুখ। ওই চেহারা চৈনিক। এত কাছে, তার দুই চোখ স্পষ্ট দেখল ও। দু'হাতে ওকে ধরল লোকটা। কাঁপা, শীতল দুটো হাত। চোখ রাখল চোখে। যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওর আত্মা।

'দুশ্চিন্তা কোরো না,' হাসিমুখে বলল লোকটা, 'আমরা জানি, ব্রাযিলে যে আর্টিফ্যাক্ট খুঁজতে গিয়েছিলে, ওই একই জিনিস চাই তোমার।' খেঁক-শেয়ালের মত কর্কশ হেসে পিছিয়ে গেল সে।

চলছে একটানা বিশ্রী হাসি। ভয় পেয়ে পিছু হটতেই টেবিল থেকে মেঝেতে পিছলে পড়ল মিতা। তাতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে পরিষ্কার হলো মগজ। চোখ তুলে দেখল, ভীষণ কুশ্রী, বয়স্ক এক লোক মোটরাইয্‌ড্‌ এক হুইল-চেয়ারে বসা। দৈহিক কোনও অদ্ভুত কম্পনের জন্যে মুচড়ে আছে শরীর।

এত কষ্টের মাঝেও তার জন্যে মনে করুণা এল মিতার।

ওর ভাবনা বুঝে প্রচণ্ড রাগে বিকৃত হলো লোকটার মুখ। চিৎকার করে উঠল সে, 'ওকে নিয়ে যাও! এতবড় দুঃসাহস... আমাকে করুণা করে!'

বিশালদেহী দুই চাইনিজ খপ্‌ করে ধরল মিতাকে, তুলে ধুপ করে ফেলল এগযামিনেশন টেবিলের ওপর। এল তৃতীয়জন, হাতে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। সুই থেকে টপটপ করে পড়ছে সোনালি তরল!

'না!' চেঁচিয়ে উঠল মিতা, ছুটে যেতে চাইল লোকদু'জনের হাত থেকে। কিন্তু তাদের শক্তি অনেক বেশি,

ঠেসে ধরে রাখল টেবিলের ওপর।

আবারও চোখ ঝলসে দিয়ে জ্বলে উঠল অত্যুজ্জ্বল আলো।

তখনই মিতার কাঁধের মাংসে বিঁধল সুই। এক সেকেণ্ড পর আঁধার হয়ে গেল চারপাশ।

ঘুম ভাঙতেই মিতা বুঝল, পড়ে আছে মেঝেতে। হৃৎপিণ্ড দাপিয়ে চলেছে ছুটন্ত ঘোড়ার মত। আগে দুঃস্বপ্ন দেখে জ্ঞান ফিরলে, আবারও ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে চেতনানাশক ওষুধ ব্যবহার করে। ওর জানা নেই, এভাবে কতবার অজ্ঞান হয়েছে। এখন ঝুলছে বাস্তব আর অবাস্তবের মাঝে। কোন্‌টা যে সত্যি, আর কোন্‌টা মিথ্যা, বোঝা দায়।

কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে উঠে বসল মিতা।

চারদিকে সাদা দেয়াল। হালকা বাদামি রঙা আসবাবপত্র। একপাশে দামি ডেস্ক ও কয়েকটি আরামদায়ক চেয়ার। এ ঘর জানালাহীন। ঘড়ি, রেডিয়ো, টিভি বা কমপিউটার নেই। ওর মনে পড়ল, মস্ত এক হেলিকপ্টারে তুলেছিল ওকে। তখন অচেতন করে দেয় লোকগুলো। তারপর আর কিছুই মনে নেই।

এখন বুঝতে পারছে, ও কারও বন্দি।

ওই যে কুৎসিত লোকটা?

সেই ওকে আটকে রেখেছে!

কেন, তা ওর জানা নেই।

কত দিন আগে কিডন্যাপ করেছে ওকে?

হয়তো এক সপ্তাহ, বা এক মাস— কে জানে!

এরই মধ্যে হয়তো পেট থেকে বের করে নিয়েছে সব কথা!

মিতার মনে পড়ল মেক্সিকোর কথা। ঢালু জমিতে মোটা

এক গাছের কাণ্ডে বাড়ি খেয়ে আটকে গিয়েছিল জর্জ হ্যারিসন।

আহা, বেচারা প্রফেসর!

তাঁর কথা ভেবে খুব দমে গেল মিতার মন।

বুড়ো মানুষটা চোখের সামনে মারা গেল।

ও কিছুই করতে পারল না!

ব্রাযিলের মায়ান সাইটের ওই স্ফটিকটা থেকে আসে ঠাণ্ডা বিদ্যুৎ। আর্কিওলজিস্ট জর্জ হ্যারিসন মায়া আর্টিফ্যাক্ট থেকেই জেনেছিলেন, আরও আছে ওই জিনিস। এনআরআই বিজ্ঞানীরাও চেয়েছিলেন ওই বিষয় নিয়ে আরও গবেষণা করতে।

আর্কিওলজিস্ট জর্জ হ্যারিসন অনুরোধ করেন, তাই গুরুত্বপূর্ণ ওই মিশনের ব্যবস্থা করে দেন জেমস ব্রায়ান। চাইলে মানা করতে পারত ও। কিন্তু মন বলল, বিপদ এলেও সময়টা কাটবে দারুণ। তা ছাড়া, ভেবেছিল পাশে পাবে মাসুদ রানাকে। সেক্ষেত্রে আর কী চাই! মানুষটার সঙ্গ সত্যি খুব লোভনীয়!

কিন্তু প্রথমেই পড়ল বাধা।

এ অভিযানে পাওয়া গেল না ব্যস্ত রানাকে।

অমন স্ফটিক আরও খুঁজতে গিয়ে মস্ত ঝুঁকি নিল মিতা। এখন নিজেই হয়তো চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে সভ্যজগৎ থেকে!

আনমনে বিড়বিড় করল মিতা, 'হায়, ঈশ্বর, কীভাবে এত বড় ভুল করলাম?'

অসুস্থ লাগছে। মন চাইল আবারও শুয়ে পড়তে।

আহ্, কী ভালই না হতো চুপচাপ মৃত্যু এলে!

পরক্ষণে বিদ্রোহ করল ওর অন্তর— এত সহজেই হেরে যাবি?

বাবার কথা মনে পড়ল ওর। ক্যান্সারে চরমভাবে অসুস্থ মানুষ, কিন্তু কখনও হাল ছাড়েননি। ওই একই কথা খাটে আঙ্কেল ব্রায়ানের ক্ষেত্রে। তাঁদের বা মাসুদ রানার জীবন থেকে বহু কিছুই শেখার আছে ওর!

বিশেষ করে মনে পড়ছে মাসুদ রানার কথা। ব্রাযিলে মানুষটা ছিল বিশাল এক বটবৃক্ষের মত। আগলে রেখেছিল সব ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝা থেকে। সত্যিই যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল, কেমন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল ওর জীবন।

মিতা ভাবল: আজ যদি মানুষটা জানত, ও পড়ে আছে এই নরকে, ঠিকই উদ্ধার করে নিয়ে যেত।

এসব ভাবতে গিয়ে একটু শান্ত হলো ওর মন। বুঝল, প্রথম কাজ এই বন্দিশালা থেকে মুক্ত হওয়া।

স্রেফ মনের জোরে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে দাঁড়াল মিতা।

পায়ের নিচে নরম কার্পেট। চলে গেল ও ঘরের আরেক পাশে। সতর্ক হাতে স্পর্শ করল দরজা। যা ভেবেছে, ওটা লক করা। এদিকে ইলেকট্রনিক কি-প্যাড। ওদিকে থাকবে কার্ড রিডার। ফিরে এসে একে একে ঘেঁটে দেখল ডেস্কের ড্রয়ার।

সব ফাঁকা।

শেষ ড্রয়ার ধুপ্ করে বন্ধ করে মেঝেতে বসল মিতা। নতুন করে বাড়ছে মাথা-ব্যথা। ছাতের ওই সাদা বাতি অতিরিক্ত উজ্জ্বল, অথবা সমস্যা হয়েছে ওর চোখে। ফোলা লাগছে নয়নতারা। বোধহয় ওকে দেয়া হয়েছে কড়া কোনও ড্রাগ। এ কারণেই দেখেছে ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন।

চোখ তুলে ডানবাহু দেখল মিতা। ওখানে সুইয়ের কমপক্ষে ছয়টা দাগ। ব্যথা হয়ে আছে জায়গাগুলোয়।

সোডিয়াম পেন্টোথাল বা স্কোপোলামিন, ভাবল মিতা।

বারবিচুরেট ব্যবহার করে তৈরি হয় ওই দুই ওষুধ।

অনেকে ভাবে, এসব সত্যিকারের ট্রুথ সিরাম। সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। কাউকে ইঞ্জেক্ট করলে, তার মন চাইবে বকবক করতে। হয়তো মুখ ফস্কে বলবে বহু কথা। কিন্তু মনের কথা আদায় করতে হলে চাই হাই-ডোয, যেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা খুবই বেশি, চিরকালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়বে মানুষটা।

ওই ওষুধই দিয়েছে, নইলে এত শুকনো লাগত না গলা, ফুলেও উঠত না চোখের তারা।

এবার কী করবে, ভাবছে মিতা। এমনসময় খুট করে খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকল দু'জন চাইনিজ লোক। শক্তপোক্ত দেহ, গায়ে ইস্ত্রি করা শার্ট, গলায় সিল্কের টাই, পরনে দামি সুট।

তাদের একজনকে নেতা বলে মনে হলো মিতার।

এগিয়ে এল সে, ডেস্কের ওপর ওর বুট রেখে বলল, 'পরে নাও।' লোকটার ডান চোখের নিচে শুকনো ছোট ক্ষত।

ভাবতে গিয়ে মিতার মনে পড়ল, প্রথমবার অচেতন হওয়ার আগে ও-ই তৈরি করেছিল ওই ক্ষত।

বুট তুলে নিল মিতা। 'কোথায় যেতে হবে?'

'তোমাকে যেখানে নেব, সেখানে লাগবে বুট।'

বক্তব্যটা সুবিধার ঠেকল না মিতার। তবে পরল ডান পায়ের বুট। ফিতা বাঁধতে বাঁধতে ভাবল, দ্বিতীয় পাটি ব্যবহার করবে অস্ত্র হিসেবে। পরক্ষণে বুঝল, এরা ঘায়েল হলেও এখান থেকে বেরিয়ে ও যাবে কোথায়? আসলে আছে ও কোন্ নরকে?

সুযোগ পাবে বড়জোর একবার!

হয়তো এ ঘর থেকে বেরোলেই সামনে পড়বে বিশ ফুট দূরে আরেকটা দরজা। কাজেই এখন উচিত হবে না কিছু করা।

দু'পায়ে বুট পরতেই ঘর থেকে ওকে বের করল লোক দু'জন। থামল একটা এলিভেটরের সামনে। বাটন টিপতেই খুলে গেল কবাট। ভেতরে ঢুকল ওরা। পকেট থেকে নিয়ে অন্যসব বাটনের নিচে অ্যাকসেস প্যানেলে চাবি ভরল দলনেতা। প্যানেলের সবচেয়ে নিচের বাটন টিপল। জ্বলে উঠল ইনডিকেটর বাতি। বন্ধ হলো এলিভেটরের দরজা। নামতে লাগল স্টিলের বাক্স।

চট্ করে মিতা দেখল, বাটন কতগুলো। নিচের তিন সারিতে সব মিলে বিশটা করে।

দ্রুত চলছে এলিভেটর। কানে ধাঁধা লাগতেই মিতা বুঝল, এটা এক্সপ্রেস লিফ্ট্। অর্থাৎ, ষাটতলার চেয়েও উঁচু এই ভবন। সব বাটন হিসেবে নিলে এই দালান হবে প্রায় এক শ' তলা।

মহাচিনে কতগুলো বাড়ি এত উঁচু? ভাবল মিতা।

সংখ্যায় সেগুলো খুব বেশি নয়।

বিশেষ একটি বহুতল ভবনের কথা মনে পড়ল ওর।

টাওয়ার ল্যাং।

ওটার মালিক হুয়াং লি ল্যাং। হংকঙের অত্যন্ত দামি ওই জায়গাটা ভিক্টোরিয়া হার্বারের মুখে।

'ও, তা হলে আমি হংকঙে?' ভাবল মিতা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আমেরিকান কনসুলেটের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

চোখের তলের শুকনো ক্ষত বিরস সুরে বলল, 'এরই ভেতর অনেক বকবক করেছ, আর না।'

গতি কমিয়ে থামল এলিভেটর। খুলে গেল দরজা।

সামনে যেমন দৃশ্য দেখবে ভেবেছে, তেমন কিছুই দেখতে পেল না মিতা। নেই চওড়া প্যাসেজ। লোহার বাক্স নেমেছে প্রাচীন আমলের কালো পাথরের ছোট এক বদ্ধ

করিডোরে। চারপাশে পচা আবর্জনা ও প্রস্রাবের বোটকা গন্ধ।

'কোন্ নরকে এনেছেন?' জানতে চাইল মিতা।

এলিভেটর থেকে নেমে পড়ল চোখের নিচে ক্ষতওয়ালা। এক হাতে তৈরি টেইযার। তীব্র বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে কাঁকড়াবিছের লেজের মত নড়ছে দুই দাড়া।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও করিডোরে বেরোল মিতা।

প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি পাথরের এই করিডোর। পরে ব্যবহার করেছে চুন-সুরকি। অনেকটা মেডেইভেল আমলের দুর্গের আঁধার ডানজনের মত ভেজা, স্যাঁতস্যাঁতে। ডানদিকে ভারী কাঠের দরজা। বহু বছর পানি লেগে পচে গেছে কব্জার কাছে। ছাত থেকে সরু কেব্‌ল্-এ ঝুলছে স্বল্প ওয়াটের ন্যাংটো বাল্‌ব্। ওই দুর্বল আলোয় চারপাশ দেখা প্রায় অসম্ভব।

লোহার পুরু শিক দিয়ে তৈরি এক দরজার সামনে থামল ওরা। পরক্ষণে কিছু বোঝার আগেই কবাট খুলে পেছন থেকে ঠেলে দেয়া হলো মিতাকে। সামান্য উঁচু চৌকাঠে পা বেধে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল ও। রুক্ষ পাথরে লেগে ছড়ে গেল দু'হাত।

ব্যথা অগ্রাহ্য করে মেঝে ছেড়ে উঠেই দরজার কাছে ফিরল মিতা। কিন্তু ওর মুখের ওপর ধুম্ করে বন্ধ হলো লোহার কবাট।

'আপনারা কেন এসব করছেন?' অসহায় সুরে জানতে চাইল মিতা। 'কী চান আপনারা আমার কাছে?'

'কিছুই না,' বলল শুকনো ক্ষত।

চারপাশের আঁধারে চোখ বোলাল মিতা। শুনল কয়েক ধরনের আওয়াজ। নড়ছে কারা? ঘড়-ঘড় শব্দে শ্বাস নিচ্ছে কিছু! গুঙিয়ে উঠল কেউ!

মিতার মনে হলো, ওর আগমনে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে বিশ্রামরত ভয়ঙ্কর কোনও হিংস্র জানোয়ার!

হঠাৎ করেই বেড়ে গেল বিশ্রী দুর্গন্ধ!

'এটা কোথায়?' ভীত স্বরে জিজ্ঞেস করল মিতা।

নিভল করিডোরের বাতি। দুই চাইনিজ উঠেছে এলিভেটরে। বুজে যাচ্ছে দরজা, পুরো বন্ধ হওয়ার আগেই একজন বলল: 'এখন থেকে এটাই তোমার বাড়ি!'

ছয়

শক্ত মেঝেতে পাতলা চাদরের ওপর চুপ করে শুয়ে আছেন প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন, চোখ সোজা খড়ের হলদেটে ছাতে। মাউণ্ট পুলিমাগো থেকে প্রায় বয়ে নিজেদের চিয়াপাস ইণ্ডিয়ান গ্রামে তাঁকে এনেছে পিকো। তাতে লেগেছে কয়েক দিন। প্রতিদিন আগের চেয়েও দুর্বল হয়েছেন ডক্টর। বুলেটের ক্ষতে ধরে গেছে ইনফেকশন। ওই বিপদ কম নয়, তার ওপর তাঁর ঘাড়ে চেপে বসেছে গ্রামের বদমাশ এক ওঝা। ওই থুত্থুড়ে বুড়োর স্থির বিশ্বাস, দারুণ কোনও জাদু দিয়ে সুস্থ করবে কালো লোকটাকে।

দুর্গন্ধময় ওই ব্যাটা খুন করবে বুঝেই, ডক্টর হ্যারিসন পিকোকে বলেছেন, সত্যিকারের ডাক্তার ডেকে আনতে। এখন চাই অ্যাণ্টিবায়োটিক ওষুধ। এ কথা মনে গেঁথে যেতে কাছের শহরের উদ্দেশে রওনা হয়েছে পিকো। কিন্তু ওদের গ্রাম এতই দুর্গম, কাছের জনপদ ঘুরে আবার ফিরে আসতে

লাগবে তিন থেকে চার দিন।

ততদিন বাঁচবেন কি না, এ নিয়ে গভীর সন্দেহে আছেন প্রফেসর। গ্রামের মোড়ল গভীর শ্রদ্ধা রাখে ওই শয়তান বুড়োর ওপর। তাই নিজ বাড়ি থেকে হ্যারিসনকে পাচার করে দিয়েছে ওই ব্যাটার বাড়িতে। এখন যা খুশি করতে পারে সে!

হ্যারিসনের বামপাশে কড়মড় আওয়াজে পুড়ছে চ্যালা কাঠ। চাইলেও দেখতে পাবেন না ওদিকটা। গুলি খেয়ে নিচের ওই গাছে গিয়ে বাড়ি খাওয়ার পর থেকেই মেরুদণ্ড যেন লোহার শিক। আড়ষ্ট হয়ে গেছে দেহ। একটু নড়লেই এমন খচ্ করে লাগছে, মনে হচ্ছে ছিঁড়ে পড়ছে পেশি।

বামহাত নিচে নিয়ে আস্তে করে উরুর ক্ষত স্পর্শ করলেন হ্যারিসন। ফুলে আছে গর্তের চারপাশ। তবুও বলতে হবে, কপাল ভাল, সরাসরি মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

দেবতার ওই দ্বীপেই অ্যান্টিসেপটিক মলম মেখে ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করেছেন, তবুও ধরে বসল ইনফেকশন। পা যে শুধু ফুলে গেছে তা নয়, জ্বরও এসেছে। হাত ফিরিয়ে এনে কোলে রাখলেন হ্যারিসন। ঘামছেন দরদর করে। কপাল থেকে চোখে পড়ল একফোঁটা লোনা জল। মাথা ঝেড়ে ওটা ফেলে দিলেন চোখ থেকে।

মন খারাপ লাগছে তাঁর। তিনিই বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন নিজের। একরাতে স্টাডিতে বসে পড়ছিলেন ব্রাযিল থেকে সংগ্রহ করা মায়ান প্রাচীন গ্লিফ। তখনই চোখে পড়ল, মায়ানদের লিখিত বক্তব্য। ওদের ছিল নিজস্ব গার্ডেন অভ এডেন— টুলান যুইয়োয়া। বুঝলেন, আরও আছে অমন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী স্ফটিক। প্রথমটার নাম: যিপাকনার হৃদয়। কল্পকাহিনির মায়ান এক ভয়ানক জন্তু যিপাকনা। পরের তিনটে হচ্ছে: মন উৎসর্গের আয়না, দূর সাগরের আত্মা উৎসর্গের আয়না, আর শেষেরটা দেহ উৎসর্গের

আয়না।

কিন্তু কোথায় আছে ওই তিনটে স্ফটিক পাথর?

নিজের সব নোট ও ছবি ঘাঁটতে শুরু করে জানলেন, বহু দূরে নেয়া হয়েছিল ওই চার পাথর। একটা ছিল ব্রাযিলে, অন্য দুটো শত মাইল দূরে, আর শেষেরটা সাগর পাড়ি দিয়ে রাখা হয়েছিল অন্য কোথাও। যেসব চিহ্ন ছিল, সেগুলোকে আর যাই হোক, মানচিত্র বলা যাবে না। তবে তিনি নানান হিসেব কষে বুঝলেন, দুটো পাথর গেছে উত্তরে ইউক্যাটানের দিকে। অন্যটা উত্তর চিন বা দক্ষিণ সাইবেরিয়ায়। এ-ও ঠিক, স্রেফ শখে করা হয়নি ওই কঠিন কাজ। জরুরি উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন আমলের মানুষগুলোর।

বিষয়টা বুঝে সরাসরি যোগাযোগ করলেন এনআরআই-এর চিফ জেমস ব্রায়ানের সঙ্গে। ওটা অনুচিত ছিল, আরও মন্দ কাজ করেছেন মিষ্টি মেয়ে মিতাকে এসবে জড়িয়ে।

অবশ্য, এখন বুঝতে পারছেন, তাঁর ধারণা ভুল নয়। ওসব আয়না বা পাথর ব্যবহার হতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে। নইলে কেন তাঁদেরকে মেরে ফেলতে চাইল একদল লোক? কারা তারা? অন্য কোনও দেশের স্পাই?

হ্যারিসন নিজেকে চেনেন, তাই আনমনে বললেন: 'যতবড় বিপদই হোক, একবার সুস্থ হলেই আবারও খুঁজব ওই স্ফটিক।'

কে যেন ঢুকেছে কুঁড়েঘরে।

ঘাড় কাত করে দেখতে চাইলেন হ্যারিসন। 'পিকো? এলে?'

জবাব দিল ফিসফিসে এক কণ্ঠ: 'পিকো এক্সিহুয়া থেকে ফেরেনি।'

এবার তরুণকে দেখলেন প্রফেসর। সে ইংরেজি জানে। তাঁর আর ওঝার কথা চালাচালি করে।

ছেলেটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে হাস্যকর, বিদঘুটে পোশাক পরা বুড়ো ওঝা। মাথায় পাখির পালকের মুকুট। কণ্ঠে মরা মানুষের হাতের হাড়। কোমরে পাতার তৈরি কৌপীন।

'কখন ফিরবে পিকো?' জানতে চাইলেন হ্যারিসন।

'হয়তো ফিরবে আগামীকাল বা তার পরের দিন,' বলল দোভাষী, 'কিন্তু সেজন্যে অপেক্ষা করতে পারব না আমরা। বিষ ছড়িয়ে পড়ছে রক্তে।'

মাথা কাত করে ওঝার জড় করা জিনিসপত্র দেখতে চাইলেন প্রফেসর। 'ওঝা কী করতে চান?'

'উনি বলছেন, তিনি জেনে গেছেন কেন আপনি অসুস্থ,' জানাল দোভাষী।

'আমি অসুস্থ, কারণ গুলি লেগেছে পায়ে,' বিরক্ত হয়ে বললেন হ্যারিসন। 'ইনফেকশন হয়েছে।'

দোভাষী জানাতেই বিশ টাকার রসগোল্লার মত ফোলা, সর্দিঝরা নাক নেড়ে প্রবল বেগে মাথা নাড়ল ওঝা। অন্য কারণে রোগ হয়েছে হ্যারিসনের। ঝড়ের বেগে বলল কী যেন।

'আপনার অন্য কিছু হয়েছে,' বলল তরুণ দোভাষী, 'আপনি জানেনও না জীবনে আসলে কী চান। ওসব জানেন ওঝা। ভয় নেই আপনার, যা চান, সেটা এনে দেবেন তিনি। বুক থেকে দূর হবে ভয়। ওঝা বলেছেন, আপনার আত্মা লড়ছে সত্যের বিরুদ্ধে।'

আমি মরেছি, বিড়বিড় করলেন ডক্টর হ্যারিসন। সুস্থ থাকলে দুনিয়ার এপার আর ওপার নিয়ে ওঝার সঙ্গে আলাপ জুড়তেন, এখন আস্তে করে নামিয়ে নিলেন মাথা। মুখ তুলে কথা বলতে গিয়ে ঘাড়ে এমনই ব্যথা, মনে হচ্ছে আপাতত মাথাটা খুলে ঝুলিয়ে রাখা উচিত শিকেয়। বুড়োটা মেরে

ফেলবে, কিন্তু কিছুই করতে পারব না, খুব দুঃখ নিয়ে বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

পাশে বসে প্রফেসরের মুখে ফুঁ দিল ওঝা।

তার দাঁতের ফাঁকে জমা পচা মাংসের ভয়ানক দুর্গন্ধে নাক কুঁচকে ফেললেন হ্যারিসন।

চিৎকার করে একনাগাড়ে কী যেন বলে চলেছে নোংরা বুড়ো।

'আপনার বিষাক্ত রক্তই ডেকে এনেছে খারাপ আত্মা,' বলল দোভাষী। 'আর তাই ঘুমের ভেতর আসছে সে। বাজে সব স্বপ্ন দেখাচ্ছে। কিন্তু এবার রক্ষে নেই তার। সহজ লোক নন সর্বজ্ঞানী ওঝা বামা হাগুড়ি। ওই মন্দ আত্মাকে তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন অন্য জগতে। তখন ঠিকই কাজ করবে তাঁর ওষুধ।'

কচমচ শব্দ পেলেন হ্যারিসন। উস্কে দেয়া হয়েছে আগুন। গালে লাগছে তাপ। বিড়বিড় করে কীসব বকতে শুরু করেছে হারামি ওঝা। তার পাশেই বসে কী যেন গুঁড়ো করছে ছোকরা। ঢেলে দিল একটা কাপে। এবার যোগ করল ছাগলের দুধ। তিন সেকেণ্ড পর ঘাড় ধরে তুলে হ্যারিসনের মুখে ঢেলে দেয়া হলো ওই তরল।

জিনিসটা এতই তিতা, হ্যারিসন এত অসুস্থ না থাকলে এক লাফে ছাত ফুঁড়ে পৌঁছে যেতেন সপ্ত আসমানে। গলা দিয়ে বেরোল শুধু গোঙানি। পাঁচ সেকেণ্ড পর কেমন নেশা নেশা লাগল তাঁর। হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেল ঘরের সব কিছু।

কানের কাছে গুনগুন করছে ওঝা। পাতার পাখা দুলিয়ে গনগনে করে তুলছে আগুন। প্রফেসরের মনে হলো, বনবন করে ঘুরছে গোটা ঘর। ভারী হয়ে উঠল তাঁর মাথা। দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওঝার কণ্ঠস্বর। অচেনা কোথাও থেকে আসছে দোভাষীর দুর্বল স্বর। হঠাৎ শুনলেন

আরেকজনের কণ্ঠ।

'পিকো?' আশা নিয়ে ডাকলেন হ্যারিসন।

না! পিকো নয়, এ তো মহিলা কণ্ঠ!

কথা বলছে খুব ফিসফিস করে!

ডক্টর হ্যারিসনের চোখের সামনে বারকয়েক হাত দোলাল ওঝা। সারামুখে পড়ল কীসের মিহি গুঁড়ো। আগুনের আভায় ঝিকমিক করছে। তারই মাঝে প্রফেসর দেখলেন একটা মুখ। ওদিকে মন দিতে চাইলেন।

কিন্তু হাত নেড়ে গুঁড়ো সরিয়ে দিল ওঝা।

'ক্-কী দিয়েছেন আমাকে?' ক্ষীণ স্বরে বললেন হ্যারিসন।

জবাব দিল তরুণ দোভাষী, 'ওই জিনিস ঠাণ্ডা করে দেবে কালো জগতের আত্মাটাকে। আর বিরক্ত করতে পারবে না আপনাকে।'

কিছুতেই কিছু যায়-আসে না, মনে হলো হ্যারিসনের। টের পেলেন, কমে গেছে ঊরুর ব্যথা। ভাবলেন, পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছেন বহু দূরে কোথাও। মনে পড়ল প্রিয় স্ত্রীর কথা। কয়েক বছর আগে মাত্র তিন দিনের জ্বরে মৃত্যুবরণ করেন উনি। সবসময় ভরসা দিতেন বিপদে। আগলে রাখতেন স্বামী ও সন্তানকে। নিজে অসুস্থ, তবুও উল্টে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন হ্যারিসনকে— চিন্তা কোরো না, আমি না থাকলেও সবই ঠিকভাবে চলবে।

'তুমি কোথায়, হান্না?' বিড়বিড় করলেন প্রফেসর। 'আমি তোমাকে খুঁজে বের করব!'

তাঁর নাকের ডগায় পাখির পালক নাড়ছে ওঝা শালা! ভীষণ হাঁচি আসতেই মস্ত হাঁ মেললেন প্রফেসর। কিন্তু খপ্ করে মুখ চেপে ধরল ওঝা। হাঁচির চাপা কয়েকটা বিস্ফোরণের পর নেতিয়ে গেলেন ডক্টর।

ঝুঁকে তাঁর চোখ দেখছে ওঝা। দাউদাউ করে জ্বলা আগুনে ফুঁ দিয়ে তুলছে কালচে ধোঁয়া। হাতে কী যেন দেখলেন হ্যারিসন। ওঝাকে ভেদ করে তাঁর চোখ গেল বহু দূরে। দেখলেন স্ত্রীকে। শুনলেন রিনিঝিনি কণ্ঠ: 'না, আমার কাছে এসো না, আমাকে নিয়ে যাও তোমার কাছে!'

স্ত্রীকে কাছে টেনে নিতে দু'হাত তুললেন হ্যারিসন, আর তখনই আগুনের মাঝ থেকে টকটকে লাল লোহার শিক তুলে তাঁর ক্ষতে চেপে ধরল ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ওঝা!

করুণ এক বিকট আর্তচিৎকার ছাড়লেন প্রফেসর, তারপর একবার দাপড়ে উঠেই অচেতন হয়ে গেলেন!

সাত

মাঝরাত। মেঘভরা আকাশে থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা-দুটো নক্ষত্র।

হংকং থেকে তিন মাইল পুবে ল্যাণ্ট্যাউ দ্বীপের চেপ ল্যাপ কোক এয়ারপোর্টে নামল এয়ারবাস এ-থ্রিএইটি কার্গো বিমান।

দেরি না করে কার্গো আনলোডে ব্যস্ত হয়ে উঠল ক্রুরা। তাদের একজন বোধহয় সুপারভাইযার। হাত লাগাল না কাজে।

মালামাল নামিয়ে উজ্জ্বল বাতি ভরা প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের দিকে গেল বিমান। তবে নতুন করে এয়ারক্রাফটে ওঠেনি ওই সুপারভাইযার। বিশাল এক

ওয়্যারহাউসের র‍্যাম্পের পাশে থামল সে।

এনআরআই চিফের মোটা অঙ্কের ঘুষ পেয়েছে রাতের ফোরম্যান ও কাস্টম্‌স্‌ অফিসার। আগেই ঠিক করা আছে, কীভাবে গোপনে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবে মাসুদ রানা।

ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ফোরম্যান। চট্‌ করে লুকিয়ে ফেলল ওকে ওয়্যারহাউসে। একটু পর এল কাস্টম্‌স্‌ অফিসার। রানার জন্যে এনেছে ট্র্যাভেল পেপার্স ও পাসপোর্ট। আগেই এনআরআই এজেন্ট রেখে গেছে রানার উপযুক্ত পোশাক।

আধঘণ্টা পেরোবার আগেই দ্বিতীয় শিফটের ক্রুদের সঙ্গে এয়ারপোর্ট ছাড়ল রানা, অন্যদের মতই উঠে পড়ল হংকংগামী বাসে। কথা হয়েছে, চালক ওকে নামিয়ে দেবে শহরের মাঝে।

রাত দুটোয় হংকঙের সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট-এ পৌঁছুল বাস। চারপাশে সাদা ও হলদে স্কাইস্ক্র্যাপার। ঝলমল করছে কোটি বাতি। বিশেষ করে চোখে পড়ছে কমলা হ্যালোজেন বাল্‌ব্‌। নিচু মেঘে গুঁতো খেয়ে ফিরছে অত্যুজ্জ্বল আভা। এত রাতেও পুরো নির্জন নয় রাস্তা। বরাবরের মতই এবারও রানা টের পেল মস্ত এ শহরের ব্যস্ততা, চাপা এক গুনগুন আওয়াজ।

অনেকে ভেবেছিল কমিউনিস্ট চিন হংকং ফিরে পেলে হারিয়ে যাবে ঝাঁ-চকচকে শহর। তখন এখান থেকে সরিয়ে অন্য দেশে টাকা নিয়েছে বড় ব্যবসায়ীদের অনেকে। কিন্তু কিছু দিন পর টের পেল, কিছুই বদলে যায়নি হংকঙের। শুধু তাই নয়, এ শহরের ছোঁয়া লেগেছে গোটা চিনে। আধুনিক হয়ে উঠছে এ দেশের অন্য সব বড় শহর।

চিনা কমিউনিস্ট সরকার সৃষ্টি করেছে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী একদল ব্যবসায়ী। আর তাদেরই সেরা বিলিয়নেয়ার হুয়াং লি

ল্যাং। তার সম্বন্ধে ফু-চুঙের সঙ্গে আলাপ করেছে রানা। মিথ্যা আশ্বাস দেয়নি ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সতর্ক করেছে ওকে। পারতপক্ষে ওই লোককে ঘাঁটাতে যাবে না চিনা ইন্টেলিজেন্স। মহাচিন সরকার আঙুল না নাড়লেও ওই লোকের ব্যক্তিগত আর্মিই যথেষ্ট, ওদের বসের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে ভয়ানক বিপদে পড়বে যে-কেউ।

বাস থামতেই কাঁধে ব্যাগ তুলে নেমে পড়ল রানা, ঢুকল ফুটপাথের পাশে ছোট এক খাবারের দোকানে। ক্যান্টোনেজ চিকেন ও এক কাপ সবুজ চা সাবাড় করে বেরিয়ে এল পাঁচ মিনিট পর। হাঁটতে শুরু করে পৌঁছুল পেনিনসুলা হোটেল-এ। পাসপোর্ট অনুযায়ী ওর নাম মিস্টার টেলি রিগ্যান। ষোলোতলায় ভাড়া করা হয়েছে সিঙ্গল কামরা।

কাউণ্টারে ক্লার্কের কাছে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমার কোনও মেসেজ এসেছে?'

'জী,' রানার হাতে সাদা একটা এনভেলপ দিল যুবতী।

কামরার চাবি সংগ্রহ করে একটু সরে এসে খাম খুলল রানা। ভেতরের কাগজে কারও নাম নেই। শুধু চারটে শব্দ: উপভোগ করুন মোপেড ভ্রমণ।

খাম ও কাগজ পকেটে রেখে লিফটে চেপে ষোলোতলায় উঠল রানা, তালা খুলে ঢুকে পড়ল নিজের কামরায়।

বিছানায় বসে ব্যাগ থেকে বের করল জেমস ব্রায়ানের দেয়া ল্যাপটপ কমপিউটার। যন্ত্রটা চালু করে ঢুকল ইন্টারনেট-এ। ব্যবহার করল বিশেষ এনক্রিপশন করা প্রোগ্রাম। কানেকশন সিকিয়োর হওয়ার পর দেখল কোনও মেসেজ এসেছে কি না। তেমন কিছু নেই। ট্যাপ করল রানা নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে।

সিকিউরিটি প্রোটোকল শেষ হলে দেখল, জেমস ব্রায়ানের কাছ থেকে ওর অ্যাকাউণ্টে ক্রেডিট করা হয়েছে

পুরো দুই মিলিয়ন ডলার। সারাজীবনের সঞ্চয় ভদ্রলোক তুলে দিয়েছেন ওর হাতে। বদলে চেয়েছেন, যেন আমেরিকায় নিরাপদে পৌঁছে দেয়া হয় মিতাকে।

মৃদু হাসল রানা।

মিতা প্রিয় বান্ধবী। ওর বিপদ হয়েছে জানলে নিজে থেকেই এ দেশে ছুটে আসত ও, সেজন্যে প্রয়োজন হতো না কারও টাকা। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও প্রোগ্রাম থেকে লগ আউট শেষে ব্রাউযার বন্ধ করে ল্যাপটপ শাটডাউন করল ও।

একবার দেখল হোটেলের ডেস্ক থেকে পাওয়া এনভেলপ, তারপর চোখ রাখল কাগজের ওই চারটে শব্দের ওপর। উঠে চলে গেল পিকচার উইণ্ডোর সামনে। কাঁচে নাক ঠেকিয়ে দেখল নিচে। রাস্তার ওদিকে একটু দূরে মোপেড ভাড়ার দোকান। কণ্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে ভোরে যেতে হবে ওকে ওখানেই।

আট

বদবু ভরা আঁধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মিতা। নড়াচড়া করছে কী যেন। এগিয়ে আসছে ওর দিকে। আত্মরক্ষার জন্যে সতর্ক হয়ে পযিশন নিল মিতা। হামলা ঠেকাবে। গলা উঁচু করে জানতে চাইল: 'কে? নিজের পরিচয় দাও!'

নিচু স্বরে বলল এক লোক, 'বিশ্রামের সময় বিরক্ত

করছ। নিজেই বরং চেহারা দেখাও!'

ঘরের এক পাশে জ্বলছে তেলের একটা প্রদীপ। আবছা ওই আলোয় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে চোখ সয়ে আসতে মিতা দেখল, ওর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে বয়স্ক এক লোক। গাল ভরা দাড়ি, মুখ ঢাকা পড়েছে ঝোপের মত গোঁফে। ঘরের মেঝেতে নোংরা কাঁথা পেতে শুয়ে আছে বেশ কয়েকজন। মিতার মনে হলো, তারা ঘুমন্ত। পেছনে পাথরের দেয়াল। একসময়ে এই ঘরের মাঝে ছিল লোহার একসারি শিক। দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল এই জেলখানা।

'এটা কি জেল?'

বয়স্ক লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, ফাটক। কোনও আদালত শাস্তি দেয়নি আমাদের, তবুও বাকি জীবন থাকতে হবে এখানে। ধরে নাও, নরকে পৌঁছে গেছ, মেয়ে। এর চেয়ে খারাপ জায়গা নেই।'

ভারী গলায় ধমক দিল কে যেন, 'চোপ, বুড়ো শালা!'

ঘরের এক পাশে আরেক বন্দিকে দেখল মিতা।

সে যুবক। আকারে প্রকাণ্ড।

আগ্রহ নিয়ে মিতাকে দেখছে সে। জিভ বের করে লোভীর মত ঠোঁট চাটল।

শিউরে উঠল মিতা। বুঝে গেছে, সুযোগ পেলে ওর বারোটা বাজাবে ওই লোক।

'কে তুমি?' মন শক্ত করে কড়া সুরে জানতে চাইল ও। 'বয়স্ক মানুষটাকে ধমক দিচ্ছ কেন? তোমার খায় না পরে?'

মনে হলো, ওর কথায় অপমানিত হয়েছে বিশালদেহী যুবক।

মিতা বুঝে গেল, এই কারাগারে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হলে দাপট দেখাতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে, কম যায় না

ও-ও।

কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল যুবক। মিতার চেয়ে অন্তত দেড় ফুট লম্বা সে। ওজনে কমপক্ষে এক শ' বিশ পাউণ্ড বেশি। অন্য বন্দিদের তুলনায় বেশি খাবার পায়। মিতা বুঝে গেল, শক্তি খাটিয়ে অন্যদের খাবার কেড়ে নেয় এই লোক। নারকীয় এই খাঁচার ইঁদুরগুলোর রাজা সে।

'মিস্টার লৌ নামে ডাকবে,' গম্ভীর কণ্ঠে জানিয়ে দিল যুবক। 'এখানে থাকবে বহু বছর। কাজেই বুঝে নাও কী করতে পারবে, আর কী পারবে না। আমার কথার বাইরে গেলে রক্ষা নেই।'

এগোতে শুরু করেছে লৌ।

আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হয়ে গেল মিতা।

'প্লিয, থামো!' বলল বুড়ো, 'এখন মারামারি কোরো না।' দূরের দেয়ালে আঙুল তাক করল সে। ওখানে সরু ফাটল। একসময় ছিল গানপোর্ট। একটু আগেও ওদিক ছিল কালো, এখন ওখানে মৃদু আবছা ধূসর আলো। ভোর হচ্ছে।

'একটু পর আসবে,' আবারও বলল লোকটা, 'এখন মারপিট শুরু করলে কাউকে খাবার দেবে না ওরা।'

ঘুরে বুড়ো মানুষটাকে দেখল মিতা। গায়ে মাংস নেই, বেরিয়ে গেছে বেচারার পাঁজরের হাড়। অগ্রসরমাণ লৌ-র দিকে চোখ রেখে পাথরের বাঙ্কের দিকে পিছিয়ে গেল ও।

মেঝেতে বসে পড়ল লৌ, ঘুমন্ত এক লোককে ডেকে তুলে দেখাল মিতাকে। 'ওই মেয়ে বাড়াবাড়ি করছে।'

চুপচাপ মাথা দোলাল তার চেলা।

পেরোল থমথমে কয়েক মিনিট, তারপর সরু ফাটল দিয়ে এল সূর্যের সোনালি আলো।

জেগে উঠছে কারাগারের অন্য বন্দিরা।

মিতা দেখল, ওরা এই ঘরে আছে মোট সাতজন। বুড়ো, লৌ, তার বন্ধু, সর্বক্ষণ চোখ নামিয়ে রাখা ভারতীয় এক মহিলা, ইউরোপিয়ান এক প্রৌঢ়, চার-পাঁচ বছরের এক ছেলে আর ও নিজে।

ছেলেটার পাশের প্রৌঢ় খাটো। অবশ্য চওড়া কাঁধ। মনে হলো অসুস্থ। কাঁথা ছেড়ে উঠে বসল না। কয়েক সেকেণ্ড দেখার পর মিতার মনে হলো, ওই লোক মৃত্যুপথযাত্রী।

নয়

মোপেড ভাড়া দেয়ার দোকানের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখছে মাসুদ রানা। আকাশছোঁয়া সব দালানের ফাঁক দিয়ে রাস্তায় পড়েছে সূর্যের লালচে রোদ। এরই ভেতর শুরু হয়ে গেছে সকালের হুড়োহুড়ি। নানাদিকে ছুটছে গাড়ি, বাস ও ট্রাক। গাড়িঘোড়ার মাঝ দিয়ে পথ করে নিচ্ছে পথচারী ও শত সাইকেল আরোহী। বাঁক নিয়ে পরের জ্যামে গিয়ে থামছে ডাবল-ডেকার বাস। বোধহয় ঝট্ করে লেন বদল করতে ওগুলোর ড্রাইভারদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফর্মুলা ওয়ান কর্তৃপক্ষ থেকে। সর্বক্ষণ চলছে হর্নের প্যাঁ-পোঁ-ভ্যাঁ! পথচারী এড়াতে গিয়ে ইন্টারসেকশনে কর্কশ শব্দে ব্রেক কষছে গাড়ি।

গোলমেলে এই পরিবেশে মোপেড নিয়ে রাস্তায় নামা সহজ কথা নয়। ব্যাপারটা প্রায় শত শত গরুর স্ট্যাম্পিডের সময় ছাতি হাতে তেড়ে যাওয়ার মত। তবুও মোপেড ভাড়া

দেয়ার দোকানের সামনে চাইনিজ ও বিদেশির দীর্ঘ লাইন। সবারই চাই হালকা বাহন।

লাইনে দাঁড়ানো কাস্টোমারদের ওপর চোখ পড়তেই রানাকে দেখল ক্লার্ক। হাতের ইশারা করে ডাকল, 'কাম-কাম, স্যল! আপনার বাইক লেডি।'

লাইন থেকে বেরিয়ে এল এভারেস্ট বিজয়ী রানা। হিংসা নিয়ে ওকে দেখছে সবাই। ক্লার্কের পিছু নিয়ে দোকানের অন্দরমহলের দিকে পা বাড়াল ও। একটু বিস্মিত, কোনও মোপেড চায়নি। এই লোক ওকে চিনে ফেলেছে, কারণটা বোধহয় এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান। ছবি দেখানো হয়েছে ওর।

'কাম-কাম, স্যল!'

দোকানের একেবারে শেষাংশে পৌঁছে রানা দেখল, সামনের দরজা পেরোলেই সারি দিয়ে রাখা অন্তত চল্লিশটা ধচা মোপেড।

দরজার ওদিকে যেতেই দেখল চার চাইনিজ লোককে। তবে দুঃখের কথা, তাদের হাতে সাবমেশিন গান! মাযল ওর বুকেই তাক করা!

'মাই গত, মাই গত!' মাথার ওপর দু'হাত তুলল ক্লার্ক। ভালই অভিনয়। পরে কেউ বলতে পারবে না সে-ই ফাঁসিয়ে দিয়েছে রানাকে। চরকির মত ঘুরেই আবারও ঢুকে পড়ল দোকানের ভেতরে। তাকে আর দেখা গেল না।

এ ধরনের বিপদের জন্যে তৈরি ছিল না রানা।

চার চাইনিজের একজন হাতের ইশারা করল ওকে। বসতে হবে পাশের ওই ওঅর্ক বেঞ্চে। পেছন থেকে ওর কাঁধে চাপ দেয়ায় বেঞ্চে বসল রানা। এক পাশ থেকে এল এক চাইনিজ, তন্নতন্ন করে সার্চ করল ওর দেহ।

অস্বাভাবিক কিছুই পেল না। চুপ করে বসে আছে রানা।

ভাবছে, শুধু যে হুয়াং লি ল্যাং-এর লোকদের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে, তা নয়, আর কোনও দলও নেমেছে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে। অবশ্য এরা হতে পারে সিক্রেট পুলিশ বা মিনিস্ট্রি ফর স্টেট সিকিউরিটির সদস্য। শেষের ওই সংগঠন এফবিআই-এর মতই। তবে এরা এত তাড়াতাড়ি ওকে খুঁজে নেয়ায় বেশ বিস্মিত রানা।

এখন কথা হচ্ছে, ওকে টার্গেট করল কেন?

এখনও কিছুই করেনি ও!

পাসপোর্ট নিয়ে দেয়া হলো পেছনের লোকটার হাতে। পাতা ওল্টাবার খস-খস শব্দ শুনল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলে উঠল পেছনের লোকটা, 'তো কেন হংকঙে এসেছেন, মিস্টার... টেলি রিগ্যান?'

'ব্যবসার কাজে,' বলল রানা। 'তবে তার আগে ঘুরে দেখব দর্শনীয় জায়গাগুলো।'

পেছনের লোকটা বলল, 'বিপদ আপনাকে খুব কাছে টানে, তাই না, মিস্টার রিগ্যান? ব্যবসায়ীরা কখনও মোপেড ভাড়া করে না। তাদের লাগে গাড়ি।'

ওঅর্ক বেঞ্চে থপ্ করে ফেলা হলো পাসপোর্ট। চোখের কোণে একটা বুট সামনে বাড়তে দেখল রানা। মাথার পেছনে টেনে নেয়া হলো আগ্নেয়াস্ত্রের স্লাইড। এবার বোধহয় গুলি করে ফুটো করবে ওর মাথা!

পেছন থেকে বলল লোকটা, 'তো এবার কী ধরনের বিপদে পড়তে চান?'

জবাব দিল না রানা, লড়তে তৈরি। চেষ্টা করবে আত্মরক্ষা করতে, কিন্তু থমকে গেল অন্য কারণে। ইংরেজি বললেও এই লোকের কণ্ঠে অন্য ভাষার সুর!

ওর পেছনে অস্ত্র হাতে লোকটা একজন রাশান!

দশ

পাথরের তৈরি কারাগারে খাবার যে এনেছে, তাকে পাহারা দিতে এসেছে সশস্ত্র ক'জন গার্ড। তুবড়ে যাওয়া নোংরা গামলায় দিয়েছে কয়েক দিন আগে তৈরি পাথরের মত শক্ত, বাসি পাউরুটি ও অতিরিক্ত লবণ দেয়া পচতে শুরু করা ডাল। সাত বন্দির জন্যে সাতটে গামলা, কিন্তু গার্ড ও খাবার পরিবেশনকারী লোহার গেট বন্ধ করে এলিভেটরে ওঠার আগে, নিয়ম অনুযায়ী খাবারের দিকে হাত বাড়াল না কেউ।

বন্দিদের মধ্যে প্রথমে সামনে বাড়ল লৌ, বেছে নিল সবচেয়ে বেশি ডাল ভরা গামলা। শুধু তাই নয়, নিজের জন্যে জড় করল সব পাউরুটি। বাচ্চা ছেলেটার বোধহয় খুবই খিদে, হঠাৎ ছুটে এসে লৌ-এর হাত থেকে কেড়ে নিল এক টুকরো পাউরুটি।

খাবার ছিনতাই হয়েছে দেখে খেপা বাঘের মত ছেলেটার ঘাড় আঁকড়ে ধরতে চাইল লৌ। কিন্তু অনেক চালু ওই পিচ্চি। এক দৌড়ে ফিরে গেল ঘরের পেছনে।

'এজন্যে তোর হাতদুটো ভেঙে ফেলব!' হুঙ্কার ছাড়ল দানব।

জবাব দিল না পিচ্চি। কাঁপা হাতে পাউরুটি তুলে দিতে চাইছে মৃতপ্রায় ইউরোপিয়ান লোকটার মুখে।

ঝড়ের বেগে ওদিকে ছুটল লৌ। 'ফেরত দে আমার পাউরুটি, হারামজাদা!'

সামনে বেড়ে বাধা দিল মিতা। 'ওর পাউরুটি ও নিয়েছে।'

ধাক্কা দিয়ে মিতাকে সরিয়ে ছোঁ মেরে বাচ্চা ছেলেটার হাত থেকে পাউরুটি কেড়ে নিল লৌ। তাতেও রাগ কমেনি, কষে এক চড় বসাল বেচারার মাথার পাশে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠে এক পাশে পড়ে গেল বাচ্চাটা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ভয় পেয়েছে অন্য বন্দিরা।

হতবাক হয়ে লৌকে দেখল মিতা, পরক্ষণে রাগে গনগন করতে লাগল মগজ। কঠোর চোখে বদমাশ লোকটাকে দেখল ও।

অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি দেখে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আপাদমস্তক ওকে দেখল লৌ। 'দারুণ তোর শরীর, শালী! এবার দেখব কত মজা দিতে পারিস্!' নিজের নোংরা কৌতুকে হো-হো করে হেসে উঠল নিজেই। 'ওটা না থাকলে তোকে আগেই মেরে ফেলত ল্যাং!'

চোখে আগুন নিয়ে দানবটাকে দেখল মিতা।

ঠোঁট বাঁকা করে বলল লৌ, 'তুই কি ল্যাং-এর নাগরী, না পতিতা? এবার চেখে দেখব তুই আসলে কী!'

ভয় দেখাতে দেড় ফুট ওপর থেকে মিতাকে দেখল সে। ফলে সরে গেছে একটু বামে। সোজা করে রেখেছে পা, একটু বেকায়দা কোমরের ওপরের অংশ।

মাসুদ রানার প্রিয় একটা কৌশল মনে পড়তেই চট্ করে পাথরের বাঙ্কে বসল মিতা। পিছিয়ে গেছে। যে-কেউ ভাববে ভয় পেয়েছে ভীষণ। চুপ করে দেখল, চওড়া হাসি ফুটে উঠেছে লৌ-এর পুরু দুই ঠোঁটে।

তার মতই নিজেও হাসল মিতা, তবে হাসিটা মিষ্টি। পরক্ষণে ঝট্ করে সামনে বাড়ল ওর ডান পা, লাগল দানবের হাঁটুর বাটির ওপর। পুতিয়ে যাওয়া ছোট পটকার মত বিশ্রী

ফটাক্ শব্দে সরে গেল বাটি। চিরকালের কুঁজোর মত বাঁকা হয়ে, হাউমাউ করে উঠে পিছিয়ে যেতে চাইল লৌ।

তখনই বাঙ্ক থেকে সামনে বাড়ল মিতা।

ল্যাংড়া ফকিরের মত টলমল করতে করতে ওর বুকে ঘুষি বসাতে চাইল লৌ। কিন্তু ডজ মেরে সরে গেছে মিতা। দেহের ভারসাম্য রাখতে না পেরে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল দানব। এজন্যেই অপেক্ষা করছিল মেয়েটা, ওর বুট পরা পা ঠাস্ করে লাগল লৌ-এর মুখে। নরম হাড় ভেঙে যাওয়ায় নাকের দুই ফুটো দিয়ে ছিটকে বেরোল রক্ত।

'ওরে, বাবারে! মেরে ফেলেছে!' করুণ আর্তনাদ ছাড়ল চৈনিক দানব।

বাঙ্ক থেকে নেমে মিতার দিকে ছুটে এল লৌ-এর বন্ধু। ট্যাকল করবে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শত্রুর গলা খপ্ করে ধরতে। কিন্তু অনায়াসেই ব্লক করল মিতা। ওই লোকেরই গতি কাজে লাগিয়ে জুডোর কৌশলে তাকে ছিটকে ফেলল দেয়ালের ওপর।

তাতেই শেষ হলো না লড়াই। ফেলে দেয়ার সময় লোকটার ডানহাত মুচড়ে ধরেছে মিতা। ওর বামহাতি ঘুষি নেমেছে তার কনুইয়ের পেছনে। ফলে মড়াৎ করে ভাঙল হাড়। প্রচণ্ড ব্যথায় পাগল হয়ে উঠল লোকটা। খাবি খেতে লাগল মেঝেতে পড়ে। মিতার জোরালো এক লাথি তাকে পৌঁছে দিল প্রিয় বন্ধুর পাশে। গোঙাতে শুরু করে সে দেখল, টকটকে লাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে বন্ধুর মুখ।

দু'ফুট দূর থেকে দুই মাস্তানকে দেখল মিতা। 'আরও কিছু লাগবে? নাকি আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে?'

মেঝেতে ছেঁচড়ে পিছিয়ে গেল লৌ। পাশেই তার বন্ধু। মৃদু কাতর ধ্বনি ছেড়ে জেলখানার গভীরে আঁধারে লুকিয়ে পড়ল তারা।

অন্য সবাই প্রশংসার চোখে দেখছে মিতাকে।

খুশিতে খিলখিল করে হাসছে বুড়ো। সামনে বেড়ে প্রাপ্য পাউরুটি নিয়ে খেতে লাগল সে।

'যে যার পাউরুটি আর ডাল বুঝে নাও,' বলল মিতা। 'লৌ বা তার বন্ধুর জন্যে কিছুই রাখতে হবে না।'

'সত্যি?' আরেক টুকরো পাউরুটি নিল বুড়ো। 'অ্যাই, নাও তোমরা! লৌ বা চুং খাবে না! আর খাবেই বা কী করে, সামনের দাঁত তো একটাও নেই! আজ আমাদের পেট ভরে খাওয়ার দিন!'

দৌড়ে এসে ডালের সবচেয়ে বড় গামলা ও মস্ত এক টুকরো পাউরুটি নিল পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলেটা। ফিরে গিয়ে চেষ্টা করল মৃতপ্রায় বন্ধুকে খাওয়াতে।

দুর্বল স্বরে বলল লোকটা, 'তুমি খাও, পাবলো, তোমার কাজে লাগবে।'

কথা শুনে তাকে পুব ইউরোপ বা রাশার লোক বলে মনে হলো মিতার। অবাক হয়ে ভাবল, অসুস্থ এই লোক বা বাচ্চা ছেলেটা কী করেছে, যে ওদেরকে এভাবে আটকে রেখেছে হুয়াং লি ল্যাং! এটা অসম্ভব, এরা হুমকি ছিল ওই লোকের কাছে!

কষ্টেসৃষ্টে মেঝেতে উঠে বসে মিতাকে বলল লোকটা, 'এবার ওরা খুন করবে আপনাকে। থামবে না প্রতিশোধ না নিয়ে।'

মৃদু মাথা নাড়ল মিতা। মনে আছে রানার একটা কথা: 'হাত-পা যদি চালাতেই হয়, তো এমনভাবে চালাও, শত্রু যেন আগামী কয়েক দিনের ভেতর উঠে বসতে না পারে।'

না, কাজ ঠিকই শেষ করেছি, ভাবল মিতা। লোকটাকে বলল, 'ভাববেন না, আপাতত এক সপ্তাহের ভেতর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না ওরা।'

'ঘুমের সময় সাবধান,' বলল ককেশিয়ান। 'প্রথম সুযোগেই খুন করবে।' ছোট্ট ছেলেকে দেখাল সে। 'রাতে আপনার ওপর চোখ রাখবে পাবলো। কখনও ঘুমায় না ও।'

ছেলেটাকে দেখল মিতা, বাঙ্কে বসে ছোট্ট একটা চড়ুই পাখির মতই ঘাড় কাত করে ওকে দেখছে।

'পাবলো কি আপনার ছেলে?' জানতে চাইল মিতা।

'না,' মাথা নাড়ল প্রৌঢ়। 'কিডন্যাপ করেছিলাম ওকে, যাতে বিক্রি করতে পারি হুয়াং লি ল্যাং-এর কাছে।'

বিস্মিত হলো মিতা। আসলে কী বলতে চাইছে লোকটা? ওর মনে হয়েছে, বাচ্চাটাকে অন্তর থেকে ভালবাসে সে। 'আপনি কিডন্যাপ করেছিলেন?'

'বাবা-মার কাছ থেকে নয়, ওর কোনও পরিবার নেই। সেই ছোটবেলা থেকে যেখানে ছিল, সেই দালানের চেনা কিছু লোকের কাছ থেকে নিয়েছিলাম। তবে ওটা ওর বাড়ি ছিল না।'

'দেখে তো ওকে রাশান মনে হচ্ছে,' আন্দাজ করল মিতা।

মৃদু মাথা দোলাল লোকটা। 'ওর দায়িত্বে ছিল সায়েন্স ডিরেক্টোরেট। বছরের পর বছর এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে।'

কেন যেন খাড়া হয়ে গেল মিতার ঘাড়ের রোম।

'এক্সপেরিমেন্ট?'

জবাব দিতে গিয়ে বেদম কাশির কারণে থেমে গেল লোকটা। একটু পর সামলে নিয়ে বলল, 'যদি বলতে পারতাম যে ওকে রক্ষা করতে চেয়েছি, তা হলে মনটা ভাল হতো, কিন্তু পুরো ঘটনা অনেক জটিল। পাবলোকে চেয়েছিল হুয়াং লি ল্যাং। আমাদেরকে বলেছিল, ওকে নিরাপদে রাখবে। ব্যবস্থা করবে চিকিৎসার। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, পাবলোকে চুরি করি আমরা পয়সার জন্যে।'

‘ওকে কিডন্যাপের পর কী হয়েছিল? কী করে এই নরকে এসে পড়লেন?’

আরেক দফা প্রচণ্ড কাশি ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে লোকটাকে। কিছুক্ষণ পর দমক থেমে গেলে বলল, ‘ট্রলার নিয়ে বেয়ারিং সি পাড়ি দেয়ার সময় পড়লাম ভয়ানক বিপদে। নষ্ট হলো ন্যাভিগেশন সিস্টেম ও রেডিয়ো। শুধু তাই নয়, পথ হারিয়ে ট্রলার চলে গেল আর্কটিক-এ। আমার নাবিকরা বলতে লাগল, অভিশাপ পড়েছে আমাদের ওপর। হয়তো ঠিকই বলেছিল ওরা।’

‘অভিশাপ? কীসের অভিশাপ?’ জানতে চাইল মিতা।

‘আমি ট্রলারের ক্যাপ্টেন, কমপাস অনুযায়ী সারারাত দক্ষিণে গেলাম, কিন্তু ভোরে সূর্য উঠলে দেখলাম গেছি পুরো উল্টো দিকে। পিছু নিল হাঙর আর কিলার ওয়েইল। যেন জানত, শেষ পর্যন্ত ওদের পেটে আমরা যাবই। ট্রলার ঠেলে নিয়ে বারবার ফেলল হিমশিলার ওপর। একেকবারে হামলা করল দুই থেকে তিনটে। জাহাজ ডুবে যাচ্ছে দেখে লাইফবোটে চড়ল নাবিকরা। কিন্তু ওদের ওপর চড়াও হলো ওরা। সাগরে পড়তেই খুন হলো আমার নাবিকরা। নিজের চোখে দেখলাম, তলিয়ে গেল লাইফবোট। তবে বেঁচে গেলাম আমি পাবলোকে নিয়ে। ঠাঁই হলো বড় এক টুকরো বরফের ওপর।’

অসুস্থ লোকটার কাছে যেতেই পচা মাংসের গন্ধ পেল মিতা। নোংরা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে কেটে ফেলা ডান হাঁটু। এ ছাড়া, গ্যাংগ্রিনে কালো দু'হাত, নাক ও মুখ। কিন্তু ক্যাপ্টেনের মত অসুস্থ হয়নি পাবলো।

‘ছেলেটার ফ্রস্টবাইট হয়নি কেন?’ জানতে চাইল মিতা।

‘ছুরি দিয়ে বরফ খুঁড়ে ছোট গুহা তৈরি করি,’ বলল সার্গেই দিমিতভ। ‘সর্বক্ষণ আগলে রেখেছিলাম ওকে।

ওখানেই ছিলাম পুরো তিন দিন। সূর্য উঠল না। বুঝলাম চতুর্থ দিন মরে যাব আমরা। কিন্তু তৃতীয় সন্ধ্যায় এল হেলিকপ্টার। আমাদের খুঁজে বের করে সরিয়ে নিল হুয়াং লি ল্যাং-এর লোক।’

‘কী কারণে আপনাকে এই জেলখানায় আটকে রেখেছে সে?’

‘কোর্স থেকে এত সরে গিয়েছিলাম, ওরা ধরে নিয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছি।’

পাবলোকে দেখল মিতা। ‘এত কিছু হলো ছোট্ট এই ছেলের জন্যে? এর কারণ কী? কে এই ছেলে?’

‘ওর কোনও পরিবার নেই। বংশ জানা নেই আমার। কিন্তু খুব অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে ওর।’ দুর্বল লাগতেই কাঁথার ওপর শুয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন দিমিতভ। ‘জন্ম থেকেই ওর ডিজেনারেটিভ নিউরোলোজিকাল ডিসঅর্ডার রোগ। ওর বাবা-মার টাকা ছিল না যে চিকিৎসা করাবে, তাই দান করে দেয় রাশান সায়েন্স ডিরেক্টোরেটকে। বিজ্ঞানীরা একের পর এক এক্সপেরিমেণ্ট করতে লাগল পাবলোর ওপর। অনেকটা ঠেকিয়েও দিল অসুখ। কিন্তু এর ফলে শুরু হলো সাইড এফেক্ট। অনেক কিছু দেখতে আর শুনতে পায় পাবলো। সাধারণ মানুষ এসব জানতেও পারে না।’

কাঁপা ক্যাপ্টেন দিমিতভের কণ্ঠ।

তার বক্তব্য সঠিক, না জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে, এ নিয়ে মনে গভীর সন্দেহ তৈরি হয়েছে মিতার। জানতে চাইল, ‘তা হলে কি পাবলো আসলে সাইকিক?’

মৃদু মাথা নাড়ল দিমিতভ। ‘না, ওটা দৈহিক। ম্যাগনেটিক অ্যানোম্যালি বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ডিসটার্বেন্স চট্ করে টের পায়। ফলে সাধারণ মানুষ যা বুঝবে না, ওর কাছে সেসব পানির মত পরিষ্কার।’

মিতা চমকে গেছে ফিযিসিস্ট হিসেবে। একটু পর জানতে চাইল, 'সত্যিই কি তা পারে?'

'জানি না,' আবারও কাশতে লাগল ক্যাপ্টেন। কাশি থেমে যাওয়ার পর বলল, 'হুয়াং লি ল্যাং মনে করত পাবলো ওসব পারে।'

দিমিতভ অতীত ক্রিয়া ব্যবহার করেছে, তাই জানতে চাইল মিতা, 'তো ওকে এখানে ফেলে রাখল কেন? ল্যাং এখন আর তা মনে করে না?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'না, তার কোনও কথাই শুনবে না পাবলো। হুমকি দিয়ে, মারপিট করে বা ড্রাগ দিয়েও ওর মুখ খোলাতে পারেনি সে। বড়জোর নিজের সঙ্গে কথা বলে বা গান গায়। মরে গেলেও সরবে না আমার কাছ থেকে। তাই শেষে আমার সঙ্গে ওকেও এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে ল্যাং। তার লোকজন জানিয়ে দিয়েছে, চোখের সামনে আমার মৃত্যু দেখতে হবে ওর। তখন ঠিকই খুঁজে নেবে নতুন প্রভু।'

বাচ্চা ছেলেটাকে দেখল মিতা। সড়াৎ-সড়াৎ আওয়াজ তুলে ডালে চুমুক দিচ্ছে ও। 'পাবলো কি বুঝতে পেরেছে, কী চাইছে ল্যাং?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়,' বলল দিমিতভ, 'তবে কিছুই পাত্তা দিচ্ছে না ও।'

হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা, চোখ গেল এলিভেটরের বন্ধ দরজার ওপর। কিছুই ঘটল না। বাইরে থেকে এল না কোনও আওয়াজ। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর শাফটের নিচে এসে থামল এলিভেটর কার। খুলে গেল দরজা।

টেইযার হাতে বেরিয়ে এল গার্ডরা।

'আপনার নাম কি?' সার্গেইর কাছে জিজ্ঞেস করল মিতা।

'সার্গেই দিমিতভ,' বলল ট্রলারের ক্যাপ্টেন। কথা শেষে

ভীষণ কাশতে লাগল। বিশ সেকেণ্ড কেশে মুখের ওপর থেকে সরাল ছেঁড়া কাঁথা। ওই কাপড়ে মেখে আছে তাজা রক্ত।

মিতা বুঝে গেল, বড়জোর আর দু'এক দিন আছে মানুষটা।

এগারো

রাশান লোকটার প্রশ্নের জবাব না দেয়ায় তার দলের এক পাণ্ডা অস্ত্র তাক করেছে রানার চোখে।

'আমি যদি মরেই যাই, আর একটা শব্দ বেরোবে না মুখ থেকে,' বলল রানা।

ভয়ঙ্কর কঠিন চেহারা করে চেয়ে আছে চাইনিজ মাস্তান, কিন্তু রানার কথাটা শুনে হেসে ফেলল রাশান। 'ঠিক আছে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো ওকে।'

পেছন থেকে কে যেন খসখসে এক তোয়ালে দিয়ে বেঁধে দিল রানার চোখ, তারপর ঠেলে ওকে তোলা হলো একটু দূরের ভ্যানে। কিছুক্ষণ পর ওরা পৌঁছুল সাগরতীরে। পিঠে গুঁতো খেয়ে রানা উঠল ডিজেল ইঞ্জিনওয়ালা এক জাঙ্ক-এ।

ইঞ্জিনের বিকট ভ্যাট-ভ্যাট শব্দ তুলে বন্দরের মাঝ দিয়ে চলল প্রাচীন যুগের ভারী নৌকা। বেঞ্চে বসে রানা বুঝতে চাইছে কোথায় চলেছে, বা গতি কেমন। কয়েক মিনিট পর জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ?'

'খুশি মনে বলব সব, কিন্তু তার আগে আমার জানতে হবে, আসলে কী কারণে এসেছ তুমি,' জবাব দিল রাশান

লোকটা।

চুপ করে থাকল রানা। বুঝতে চাইছে পরিস্থিতি।

ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেল না?

ধরে এনে বাঙালী এক গুপ্তচরকে জেরা করছে এক রাশান লোক— কেন ও হংকঙে!

ক'সেকেণ্ড পর পাটাতনের নিচে 'ভ্যাট-ভ্যাট-ভুট-ভুট-পুট-পুট-পুট-পুট-ফুস্!' শব্দে থেমে গেল ডিজেল ইঞ্জিন্। আর এগোল না জাঙ্ক, একবার এদিক, আবার ওদিক দুলছে সাগরের ঢেউয়ে।

'উঠে দাঁড়াও,' আদেশ দিল রাশান।

রেলিং ধরে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বাঁধন খুলে সরিয়ে নেয়া হলো চোখের ওপর থেকে তোয়ালে। ঘুরে দাঁড়াতে গেল রানা। কিন্তু নির্দেশ এল, 'তাকাও সোজা সামনে!'

ওর পিঠে খোঁচা দিল রাইফেলের মাযল।

নির্দেশ মত সরাসরি তীরে তাকাল রানা। ও আছে নড়বড়ে জাঙ্কে, তীর থেকে এক মাইল দূরে।

ওই যে ভিক্টোরিয়া হার্বার!

ওদিকেই আছে হংকঙের আকাশে খোঁচা দেয়া মস্ত উঁচু সব বহুতল অফিস।

'শুনেছি, বর্তমান পৃথিবীর সেরা একজন স্পাই তুমি। শুধু তাই নও, নিজের ছোট্ট ওই দেশের জন্যে প্রাণ দিতেও দ্বিধা নেই তোমার। কাউকে ভয় পাও না।'

চুপ করে থাকল রানা।

'তোমার নাম মাসুদ রানা,' বলল রাশান। 'বাঙালী গুপ্তচর। এমন তো নয় যে দল বদল করেছ? বাংলাদেশের জন্মের আগে থেকেই তোমাদের দেশের প্রাপ্য স্বাধীনতা ঠেকাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আমেরিকান সরকার বা

সিআইএ। সেক্ষেত্রে মার্কিন সংস্থার হয়ে কাজ করতে এ দেশে এলে কেন? এর জবাব জানতে চাই।'

রেলিঙে হাত রেখে রানা ভাবল, এরই ভেতর বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছে রাশান লোকটা।

নীরবতা ভাঙল না ও।

'তুমি হয়তো আছ বন্ধুদের ভেতর, কাজেই মুখ খোলো,' বলল লোকটা। 'নইলে বুঝব, সত্যিই বেঈমানি করেছ দেশের সঙ্গে। আমেরিকার হয়ে ক্ষতি করতে চাও চিনের। সেক্ষেত্রে জানব, যা ভাবতাম তোমার ব্যাপারে, সবই মিথ্যা। সত্যিই কি কোনও চাইনিজ কর্মকর্তাকে খুন করতে এসেছ?'

'আমি খুনি নই,' বলল রানা, 'আমাকে মেরে ফেলতে না চাইলে কাউকে খুন করি না।'

'তা হলে এ দেশে এলে কেন?'

রানা একবার ভাবল, রেলিং টপকে ঝাঁপিয়ে পড়বে সাগরে। পরক্ষণে বুঝল, পেছন থেকে আসা গুলি ঝাঁঝরা করবে ওর পিঠ।

'জানতে চাইছি, কেন তুমি এই দেশে?'

'এসেছি আমার ব্যক্তিগত একটা কাজে,' মুখ খুলল রানা।

'তার মানে এনআরআই থেকে তোমাকে পাঠানো হয়নি?'

'ওই সংগঠনের চিফের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আমার কাজের।'

'সেক্ষেত্রে এসেছ হারিয়ে যাওয়া ওই মেয়ের জন্যে?'

'যা খুশি ভেবে নিতে পারো।'

'এফএসবি ভাল করেই জানে, ওই মেয়েকে আটকে রেখেছে ল্যাং।'

চুপ করে আছে রানা।

'তোমার মিশন সফল করা খুব কঠিন,' বলল রাশান,

‘তবে ওই যে, সরাসরি সামনে টার্গেট।’

রানা দেখল, তীরে সোনালি রোদে ঝিকঝিক করছে সাদা মার্বেল দিয়ে কারুকাজ করা বহুতল ভবন, টাওয়ার ল্যাং।

‘ওই মেয়ের কাছ থেকে কী যেন আদায় করতে চায় ল্যাং।’

টাওয়ারের পাথরের ভিত্তি দেখছে রানা। ভাবছে, উবে গেছে ওর কাভার। সবই জানে রাশান ইন্টেলিজেন্সের এই লোক। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও। এবার বাধা দিল না কেউ।

জাঙ্কের পাইলট হাউসের ছাউনির ছায়ায় আরাম করে দাঁড়িয়ে আছে শক্তপোক্ত দেহের এক লোক, পরনে কালো পিকোট, হাতে চামড়ার গ্লাভ্স্। দৈর্ঘ্যে বড়জোর পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। চুল ধূসর। তুবড়ে গেছে ফ্যাকাসে গোল মুখ। দু'গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। কৌতূহলী চোখ, আত্মবিশ্বাসী। আশপাশে দলের লোক নেই। অস্ত্রও নেই রাশানের হাতে।

এই লোকের বয়স আন্দাজ চল্লিশ, ভাবল রানা। গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল, ‘কে তুমি?’

‘নাম ইগোর দিমিতভ,’ বলল লোকটা।

‘তুমি কি আমার কণ্ট্যাক্ট?’

‘না, তা নই।’

‘সে কোথায়?’

ডানহাতে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল ইগোর দিমিতভ। ‘ওর মত হারামজাদা পাওয়া দায়। এদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি। আমার দেয়া ঘুষ খেয়ে ল্যাং মেরে দিয়েছে তোমাকে। এদিকে তুমি চাইছ হুয়াং লি ল্যাংকে ল্যাং মারতে। তাতে আগ্রহ কম নেই আমারও। বলতে পারো, আমরা আসলে একই দলের লোক।’

‘আমার কাছে কী চাও?’

‘ওই যে, আগেই বলেছি, চাই সাহায্য করতে,’ বলল ইগোর, ‘যাতে ল্যাং-এর হাত থেকে ছুটিয়ে নিতে পারো ওই মেয়েকে।’

‘বদলে কী দিতে হবে?’

ছাউনির তলা থেকে বেরিয়ে রানার পাশে থেমে টাওয়ার ল্যাং-এর দিকে তাকাল ইগোর দিমিতভ। ‘রাশান এক বাচ্চা ছেলেকে আটকে রেখেছে ল্যাং। সায়েন্স ডিরেক্টোরেটের বড় পদে আছেন ওর মা। আমার কাজ ওই ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে নেয়া।’

‘ছেলেটাকে কিডন্যাপ করল কেন?’ জানতে চাইল রানা।

‘কারণ, ওর মা কাজ করেন হাই-এনার্জি ফিযিক্সের ওপর,’ কাঁধ ঝাঁকাল ইগোর। ‘টাকা দিয়ে কিছু কিনতে না পারলে তা চুরি করে ল্যাং। তা না পারলে, আদায় করে গায়ের জোরে। ওই ছেলের মা-র কাছ থেকে জরুরি তথ্য চাইছে সে।’

হাই-এনার্জি ফিযিক্স, ভাবল রানা। ওই বিষয়ে লেখাপড়া করেছে মিতা। সেজন্যেই গেছে আর্কিওলজিস্ট হ্যারিসনের সঙ্গে মেক্সিকোতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী স্ফটিক খুঁজতে।

‘হাই-এনার্জি ব্যবহার করে অস্ত্র তৈরি করতে চাইছে রাশা?’ জানতে চাইল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল ইগোর, ‘জানি না। তবে সায়েন্সের নানান দিকে গভীর আগ্রহ ল্যাং-এর। সেসবের ভেতর একটি হচ্ছে: জেনেটিক ডিফর্মেশন বিষয়ে মেডিকেল সায়েন্স। শুনেছি, জন্ম থেকে ত্রুটিপূর্ণ এমন একদল মানুষকে নিয়ে চিড়িয়াখানা তৈরি করেছে সে।’

‘বাহ্!’ আরও গম্ভীর হলো রানা। ‘কিন্তু কী কারণে আমাকে চাই তোমার? নিজেই তো সরিয়ে নিতে পারো ওই ছেলেকে।’

বড় করে শ্বাস ফেলল ইগোর। 'বাধ্য হলে তাই করব। কিন্তু জানলাম, ওই একই কাজ করতে এসেছ তুমি, উদ্ধার করবে মেয়েটাকে। তখন ভাবলাম, ওকে ছুটিয়ে আনার সময় এনে দিতে পারবে ওই ছেলেটাকেও। তাতে কাজ কমবে আমার। এজন্যে তোমার যা লাগবে, সবই দেব। বলতে পারো, ঘোলা পানিতে মাছ ধরছি। হঠাৎ ল্যাং খেয়ে ল্যাং কিছু বোঝার আগেই ওই মেয়ে আর ছেলেটাকে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাব আমরা। তুমি তোমার পথে, আমি আমার পথে। প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে পারো।'

একা কিছু না করে রাশানদের সাহায্য নেয়াই তো ভাল, মনে হচ্ছে রানার। আরেকবার দেখল টাওয়ার ল্যাং। 'ভাবছ, ওরা আছে ওই টাওয়ারে?'

মাথা দোলাল ইগোর। 'আমাদের কাছে সার্ভেইল্যান্স ভিডিয়ো আছে। ওদেরকে ওখানে নিয়েছে, কিন্তু তারপর বের করেনি।'

মিতাকে কিডন্যাপের পর পেরিয়ে গেছে বেশ কয়েক দিন।

'তোমরা পুরো শিয়োর নও,' আন্দাজ করল রানা।

'ল্যাংকে ভাল করেই চিনি,' জোর দিয়ে বলল ইগোর, 'জানি তার প্রতিটা পদক্ষেপ। মিতা দত্ত বেঁচে থাকলে, সে আছে ওই টাওয়ারের ভেতরেই। তা ছাড়া, তখন তখনই খুন করবে ভাবলে ওখানে নেবে কেন?'

টাওয়ার ল্যাং আবারও দেখল রানা। 'এক শ'র বেশি তলা। জানতে হবে কোথায় আছে ওরা।'

'ভাবতে হবে না তোমাকে,' বলল রাশান। 'তুমি শুধু ভাববে একটা তলা নিয়ে।' রানার হাতে ছোট বিনকিউলার ধরিয়ে দিল সে। 'খেয়াল করো টাওয়ারের ভিত্তি।'

চোখে বিনকিউলার তুলে কালো পাথরের গোড়া দেখল

রানা। ওখান থেকেই আকাশে উঠেছে টাওয়ার। একেবারে নিচে প্রাচীন দুর্গের বেসমেন্ট ও পাথরের দেয়াল থেকে সাগরে নেমেছে ভাঙা ধাপের সিঁড়ি।

'ভিক্টোরিয়া ফোর্টের ধ্বংসস্তূপের ওপর নিজের টাওয়ার তৈরি করেছে ল্যাং,' বলল ইগোর, 'আঠারো শ' পঁয়তাল্লিশ সালে নিরেট পাথর খুঁড়ে ব্রিটিশরা গড়ে ওই দুর্গ। কয়েক বছর পর ফোর্ট স্ট্যানলি নির্মাণের পর সরিয়ে নেয় বেশিরভাগ সৈনিক। ফোর্ট ভিক্টোরিয়ার পুরনো কারাগার ব্যক্তিগত জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করছে ল্যাং। যাদের কাছে কিছু পায়, অথচ দেয়ার মত কিছুই নেই, তাদেরকে আটকে রাখে ওখানে। কেউ বেঈমানি করলেও তার ঠাঁই হয় ওই নরকে। খুব কম মানুষই মুক্তিপণ দিয়ে রেহাই পায় ওর কাছ থেকে।'

এবড়োখেবড়ো, কালো পাথরের ভিত্তি দেখল রানা। নিচের অংশে লেগে ছিটকে ফিরছে সাগরের ঢেউ।

'মিতা দত্ত আর পাবলো এখন ওই জেলখানায়,' বলল ইগোর দিমিতভ।

বারো

কানে ফোনের রিসিভার ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছেন সিআইএর বর্তমান ডিরেক্টর মার্ল ক্যালাগু। ডেস্কের ওপর সতীর্থ এক ইণ্টেলিজেন্স এজেন্সির বিষয়ে কঠোর ভাষায় লেখা ইণ্টারনাল রিপোর্ট। ওই সংগঠন এনআরআই, বেশ ক'বছর ধরে জংধরা পেরেকের মত খোঁচা মারছে মার্ল ক্যালাগুর পশ্চাদ্দেশে।

এনআরআই-এর সৃষ্টির আদি থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাটিকে নানানভাবে দমাতে চেয়েছে সিআইএ। বেশ কয়েকবার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে প্রেসিডেন্টকে, যেন ল্যাংলির অধীনে কাজ করে এনআরআই। কিন্তু বারবার আবদার করেও কোনও ফল মেলেনি।

মার্ল ক্যালাগুর চরম ব্যর্থতার কারণ, প্রেসিডেন্টের বিশ্বস্ত, পুরনো বন্ধু জেমস ব্রায়ান এনআরআই-এর চিফ। তবে কয়েক বছর আপ্রাণ চেষ্টার পর, নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন ক্যালাগু। এবার সম্ভাবনা খুবই বেশি, ডিগবাজি খেয়ে ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়বেন এনআরআই চিফ।

যতই জেমস ব্রায়ানের পুরনো বন্ধু হন প্রেসিডেন্ট, তাঁর প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়— তিনি রাজনৈতিক দলনেতা। আর সব উচ্চপর্যায়ের নেতার মতই, তিনিও অনৈতিক কিছু বরদাস্ত করেন না। অন্যায় হবে বা হয়েছে বুঝলেই ওই বিষয় থেকে সরিয়ে নেন নিজেকে।

ওটা মাথায় রেখেই নতুন উদ্যমে যুদ্ধে নেমেছেন ক্যালাগু। ঠিক করেছেন, এনআরআই-এর নামে প্রচার করবেন কেলেঙ্কারি। ওসবের সঙ্গে জড়িয়ে নেয়া হবে জেমস ব্রায়ানকে। উনি যেহেতু বন্ধু, সাধারণ অন্যায়কারীর চেয়েও বেশি কঠোরভাবে তাঁকে দমন করবেন প্রেসিডেন্ট। তা করবেন, কারণ, সবাইকে দেখাতে হবে, পেয়ারের লোক বলে কাউকে ছাড় দেন না তিনি।

যা চান, সবই এবার পাবেন, ভাবছেন মার্ল ক্যালাগু। বড় কথা, নিজে থেকে টুঁ শব্দও করতে হবে না তাঁকে।

রিসিভারে সামান্য খুট্ আওয়াজ পেয়ে ক্যালাগু বুঝলেন, তাঁর কল গেছে ওভাল অফিসে। এখন লাইনে আছেন প্রেসিডেন্ট।

'শুভ বিকেল, ক্যালাগু,' বললেন তিনি; 'কী কারণে ফোন

করেছেন?'

ক্যালাগু চোখ রাখলেন সামনের রিপোর্টে। বেছে নেয়ার মত বেশ কয়েকটা আপত্তিকর গুজব আছে ওটাতে। একটাতে লেখা: এনআরআই তাদের ভার্জিনিয়া কমপ্লেক্স-এ গোপনে বিপজ্জনক নিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্ট করছে। এ কথা মিথ্যা বলেই মনে হয়েছে ক্যালাগুর। কিন্তু অন্যান্য যেসব তথ্য খুঁড়ে বের করেছে তাঁর লোক, সেসব যথেষ্ট ক্ষতিকর হবে জেমস ব্রায়ানের জন্যে।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' দক্ষিণাঞ্চলের মিষ্টি সুরে কয়েক পাউণ্ড দুশ্চিন্তা মিশিয়ে বললেন ক্যালাগু, 'ফোন করেছি আপনাকে সতর্ক করতে। স্যর, বোধহয় বেশ কিছুদিন আপনার বন্ধু এনআরআই চিফের সঙ্গে আলাপ করেন না? এ কথা বলছি, কারণ আপনার আপত্তি থাকবে, এমন ক'জনের মাথায় খাঁড়া নামাতে চাইছেন জেমস ব্রায়ান।'

'কী হয়েছে খুলে বলুন তো, ক্যালাগু?' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু ব্রায়ান বোধহয় নষ্ট করছেন দেশের সম্মান,' বললেন ক্যালাগু, 'এরই ভেতর বাংলাদেশের গুপ্তচর মাসুদ রানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন চিনে সম্পূর্ণ নিজের ব্যক্তিগত এক যুদ্ধে।'

'কী কারণে এমন মনে হচ্ছে আপনার?' ক্লান্ত সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট।

'হংকং থেকে রিপোর্ট এসেছে,' বললেন ক্যালাগু, 'আবারও সীমানার বাইরে গিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে এনআরআই।'

'বাঙালি গুপ্তচর মাসুদ রানার সাহায্য নিয়েছে?'

'জী। যে লোক বারবার ধোঁকা দিয়েছে আমাদেরকে!'

'ধোঁকা দিয়েছে?' আপত্তির সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট,

'আমার কিন্তু ধারণা, আপনারাই তাকে নানাভাবে খুন করার চেষ্টা করেছেন।'

'স্যর, সে আমেরিকার ক্ষতি করছে ভেবেই...'

'আগেও ওই যুবকের সাহায্য নিয়েছি আমরা,' থামিয়ে দিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'বেশ ক'বার আগের প্রেসিডেন্টের প্রাণ রক্ষা করেছেন। প্রয়োজন না পড়লে ব্রায়ান নিশ্চয়ই তাঁকে জড়াত না।'

জেমস ব্রায়ানকে এবার বাগে পাবেন ভেবেছিলেন ক্যালাগু, কিন্তু কপাল মন্দ, কঠোর সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'আপনি যেসব সোর্স থেকে তথ্য পেয়েছেন, তাদের বলুন, তারা যেন সরাসরি আমার কাছে রিপোর্ট করে। যে রিপোর্ট পেয়েছেন, ওটা দেরি না করে মাটিচাপা দিন। আমার কথা বুঝেছেন? বাস্তবিক কী ঘটেছে, তা বোঝার আগে এসব তথ্য প্রকাশ্যে এলে, ঠিকই বুঝে নেব, পদ থেকে কাকে সরিয়ে দেয়া উচিত।'

সবই ফাঁস হলে খুশি হতেন ক্যালাগু। কিন্তু তাতে লোভনীয় চাকরি হারাবার সমূহ সম্ভাবনা। তিনি ঠিক করলেন, প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়ে দেবেন, আসলে কারা চালায় আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স। 'জী, তা তো বটেই, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বললেন ক্যালাগু, 'সত্যি, ব্রায়ান মস্ত কোনও ভুল করে বসলে, আমার উচিত সাধ্য অনুযায়ী তাঁর পিঠ রক্ষা করা।'

'ফালতু বকবক বাদ দিয়ে কাজের কথায় আসুন, ক্যালাগু,' বললেন প্রেসিডেন্ট, 'আপনার অত দরদি হতে হবে না, আপনি তো আর নির্বাচনে নামছেন না। আগামীকাল সকাল সাতটায় উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমের ফয়েতে। ড্রাইভ করবেন নিজের গাড়ি। সঙ্গে কোনও সহকারী চাই না।'

ঠাস্ করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন প্রেসিডেন্ট।

ওই শব্দটা চড়ের মত লেগেছে ক্যালাগুর কানে। জানেন, তিনি যা বলেছেন, তা ঠিকই বুঝেছেন প্রেসিডেন্ট। রেগে গেছেন তাই। মনে হয়নি বিস্মিত। বিরক্ত হয়েছেন। ব্যাপারটা এমন: যে দুর্ঘটনা এড়াতে পেরে স্বস্তি পেয়েছেন, এখন দেখা যাচ্ছে ওটাই ঘটেছে তাঁর জীবনে।

ফোনের রিসিভার রাখার সময় মার্ল ক্যালাগুর মুখে ফুটে উঠল টিটকারির হাসি। আদরের সঙ্গে বন্ধ করলেন রিপোর্টের ফাইল। যা ভেবেছেন, তার চেয়েও অনেক মজা পাবেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ানকে কোণঠাসা করতে পারলে।

তেরো

কারুকাজ করা টিণ্টেড কাঁচ গায়ে জড়িয়ে থম মেরে আছে বিশাল, উঁচু টাওয়ার ল্যাং। ডানে হংকঙের সারি সারি আকাশছোঁয়া স্কাইস্ক্র্যাপার। মস্ত শহরের এক পাশে কাউলুন ও ভিক্টোরিয়া হার্বার। মাঝে ব্যস্ত, নীল জলের শিপিং চ্যানেল। বামে খোলা সাগরে সালফার চ্যানেল ও ডিসকভারি বে, একটু দূরেই ল্যাণ্টাউ আইল্যাণ্ডের নতুন এয়ারপোর্ট।

সবমিলে দারুণ দৃশ্য। টাওয়ার ল্যাং-এর এক শ' একতলা থেকে ওসব দেখতে আরও অনেক সুন্দর।

একসময়ে ওখান থেকে অদ্ভুত মায়াবী প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্টি সৌন্দর্য দেখে বিভোর হতো হুয়াং লি ল্যাং। তবে আজকাল ওই দৃশ্য কাঁটা হয়ে বেঁধে তার বুকে।

'বন্ধ করো সব শাটার!' হুঙ্কার ছাড়ল হুয়াং লি ল্যাং।

প্রায় দৌড়ে গিয়ে নিজের ডেস্কের সামনে হাজির হলো ল্যাং-এর সেক্রেটারি, পটাপট টিপল একপাশের বোর্ডের চারটে বাটন। সর-সর করে ছাত থেকে নামল স্টিলের শাটার। অদৃশ্য করছে চারপাশের চমৎকার দৃশ্য। মাত্র দশ সেকেণ্ডে প্রকাণ্ড ওই ঘর হলো স্টিলের একটা বাক্স। সিলিঙে জ্বলে উঠেছে নরম, সাদা আলো।

সামান্য মাথা কাত করল ল্যাং, সঙ্গে সঙ্গে চালু হলো যান্ত্রিক হুইল-চেয়ারের ইলেকট্রিক মোটর। বন্ধ জানালা ছেড়ে ঘরের মাঝে এসে থামল হুইল-চেয়ার। বিলিয়নেয়ার খেয়াল করছে, তাকে দেখছে বেশ কয়েকজন লোক।

তারা সেক্রেটারি, টেকনিশিয়ান, সিকিউরিটি প্রধান, আন-অফিশিয়াল চিফ অভ স্টাফ ও মোটা এক লোক।

শেষজনের নাম ক্যাং লাউ।

এরা সবাই বোকা, অবজ্ঞা নিয়ে দেখছে কী করুণ পরিণতি হয়েছে দুর্দান্ত ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ী ল্যাং-এর।

সবই টের পাচ্ছে ল্যাং। একসময়ে সত্যি দেখার মত পুরুষ ছিল সে। দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট, ওজনে এক শ' আশি পাউণ্ড। দু'হাতে ষাঁড়ের ঘাড় মুচড়ে ফেলে দিত ওটাকে মাটিতে।

আর আজ?

গত ক'বছরের নিউরোলোজিকাল ডিসঅর্ডার শেষ করে দিয়েছে তাকে। ওই অসুখ প্রথমে ফুরিয়ে দিল কর্মশক্তি ও দৈহিক সমন্বয়, তারপর চুরি করল গায়ের সব জোর।

এখনও হাঁটে ল্যাং, তবে সেটা চিকিৎসা ও থেরাপির জন্যে। দিনে দিনে বাড়ছে অসুখ। এ কারণেই আজকাল বেশিরভাগ সময় বসে থাকে হুইল-চেয়ারে। বারবার মুচড়ে ওঠে শরীর, থরথর করে কাঁপে। এসব হচ্ছে অসুখের জন্যে। রোগ কমিয়ে দিতে দেহে যোগ করতে হয়েছে ইলেকট্রিকাল

স্টিমুলেটর, নইলে আরও ক্ষয়িষ্ণুতার কবলে পড়বে দুর্বল পেশি।

চোখে বিস্ময় ও করুণা নিয়ে চেয়ে আছে সবাই।

কিন্তু সেজন্যে তাদেরকে অন্তর থেকে ঘৃণা করছে ল্যাং।

তার আপত্তির আরেকটা কারণ: আজকাল বাধ্য হয়ে নির্ভর করতে হচ্ছে এদের ওপর। বিশেষ করে ক্যাং লাউ—খুবই কঠিন হয়ে উঠছে ওকে সহ্য করা।

'ওই মেয়ে এখন ফাটকে?' জানতে চাইল ল্যাং।

'আপনার হুকুম অনুযায়ী ওকে ওখানে রাখা হয়েছে,' বলল ক্যাং লাউ। 'কিন্তু আমার মনে হয়...'

হাতের ঝাপ্টায় তাকে থামিয়ে দিল বিলিয়নেয়ার, 'তোমার ধারণা জানতে চাইনি। আমাকে বিরক্ত না করে তোমার চিন্তা নিজের কাছেই রাখো।'

'জী, স্যর,' মাথা দোলাল লাউ, 'তবে ওই মেয়ে আমাদের কোনও কাজেই আসবে না। আমাদের জানা নেই, এমন কিছুই জানে না সে। আমাদের বোধহয় উচিত ওকে মেরে ফেলা, বা বিক্রি করে দেয়া। আপনি তো জানেন, স্যর, ওই মেয়ে যেরকম সুন্দরী, অনেকেই লাখ লাখ ডলারে ওকে কিনতে চাইবে। তা ছাড়া, ওই মেয়ে এখানে রয়ে গেলে, যে-কোনও সময়ে হামলা করবে আমেরিকান কোনও আইনী সংস্থা। ঝুঁকিটা না নেয়াই ভাল।'

সময় ও ঝুঁকি, ভাবল হুয়াং লি ল্যাং। *ওই সময় আর ঝুঁকিই সব!*

কৃপার সুরে বলল ল্যাং, 'তুমি যা জানো, তার বাইরেও কিছু ব্যাপার আছে। আমি যতদূর দেখছি, তা দেখতে পাবে না তুমি।'

হুইল-চেয়ার সরিয়ে লাউয়ের মুখোমুখি হলো বিলিয়নেয়ার। 'আপাতত ওই মেয়ে কাজে আসবে না, এ

কথা ঠিক। কিন্তু পরে ওর কাছ থেকেই আসবে জরুরি তথ্য। ওগুলো আমার দরকার। এখন তোমার কথা মত ওই মেয়েকে খুন করলে, বা পতিতালয়ে বিক্রি করলে কী হবে? তোমার তো জানা আছে, টাকার কোনও অভাব নেই আমার!'

ক্যাং লাউ মাথা খাটিয়ে কিছু বুঝতে চাইছে। তাকে চুপচাপ দেখছে ল্যাং। একসময়ে পরস্পরের সহায়তা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় মাস্তানি করে ধাপে ধাপে উঠেছে তারা সমাজের ওপরতলায়।

আজ ল্যাং-এর আছে আধুনিক সব জিনিসের উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরি, শিপিং ও নির্মাণ ব্যবসা। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের গোড়া ছিল নানান রকম অপরাধ। মাস্তানি, কিডন্যাপিং, পতিতালয়, স্মাগলিং, আদম পাচার বা ড্রাগ চোরাচালান। কিছুই বাদ দেয়নি ল্যাং ও লাউ।

এসবে ওদের সঙ্গে ছিল আরও তিনজন।

কিন্তু তারা ক্ষমতা চাইলে এক এক করে তাদেরকে খুন করিয়ে নেতৃত্ব বজায় রেখেছে ল্যাং।

যখন দৈহিক শক্তি ছিল, খালিহাতে ছিঁড়ে ফেলত যে-কোনও মানুষের গলা। এখনও মনে পড়ে সেই পাশবিক শক্তির কথা।

কী ভালই না লাগত আঙুলের মাঝ দিয়ে অসহায় মানুষের রক্ত বইলে! আবারও চাই তার ওই আনন্দ! জগৎকে বুঝিয়ে দিতে হবে, সে কী পারে!

লাউ কোনও ঝামেলা করবে, তা হতে দেবে না সে!

'কিন্তু, স্যর...' বলল লাউ।

'আমার কথার ওপর কথা বলবে না,' গর্জে উঠল ল্যাং। যেন থরথর করে কেঁপে উঠেছে প্রকাণ্ড ঘর। থতমত খেয়ে গেছে সবাই।

মুখ বন্ধ করে ফেলেছে ক্যাং লাউ।

তার চোখে আপত্তি দেখল ল্যাং। বুঝে গেল, তার দোসরের মনে জেগে উঠেছে বিদ্রোহ। বহু বছর বিশ্বস্ত ছিল লাউ, কিন্তু আজকাল নিজেকে ভাবছে আরও বড় কিছু। এমনই হওয়ার কথা। মানুষ তো!

হুইল-চেয়ার ঘুরিয়ে কনফারেন্স রুমের দিকে চলল হুয়াং লি ল্যাং। সে এগিয়ে যেতেই আপনাআপনি খুলে গেল বৈদ্যুতিক দরজা। বিলিয়নেয়ারের জন্যে ভেতরে রয়েছে দুটো জিনিস। এ ছাড়া, অপেক্ষা করছে একদল টেকনিশিয়ান ও দু'জন ডাক্তার।

একপাশে ল্যাং-এর দু'জন লোক পরীক্ষা করছে মেক্সিকো থেকে আনা পাথরের প্রাচীন মূর্তি। ভেতরের অবস্থা বুঝতে ব্যবহার করা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ইকুইপমেণ্ট।

'আর কী জানলে?' জিজ্ঞেস করল ল্যাং।

'এই মূর্তির ভেতরে কিছুই নেই,' বলল ডানদিকের কর্মচারী। 'সলিড গ্র্যানেটের। ফাটল বা গর্ত নেই। আসছে না কোনও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ডিসচার্জ। এনআরআই যে ধরনের জিনিস খুঁজছে, তেমন কিছুই নেই এই মূর্তির ভেতর।'

'তাই?' বলল ল্যাং। 'কিন্তু তোমরা যখন ছেলেটাকে নিয়ে এলে, তখন কিন্তু ছিল মৃদু ডিসচার্জ। মূর্তির গায়ের লেখা থেকে কিছু বোঝা গেল?'

কমপিউটারের সামনে বসে আছে আরেক কর্মচারী, সে বলল, 'আমরা এখন কমপিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে তৈরি করছি মূর্তির চুরমার হয়ে যাওয়া অংশের ছবি। বেশকিছু ছবি পেয়েছি মেয়েটার কাছ থেকে। কিন্তু ওগুলোর রেযোলুশন খুব খারাপ। অবশ্য বড় করে নেয়ার পর বুঝতে শুরু করেছি হায়ারোগ্লিফের কোড।'

'আর কত দিন লাগবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল কমপিউটার বিশেষজ্ঞ। 'মূর্তির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওই মেয়ে।'

'চেষ্টার ত্রুটি করছি না, স্যর,' বলল দ্বিতীয় টেকনিশিয়ান।

'সময় ফুরিয়ে আসছে,' বলল ল্যাং, 'তোমাদের চেষ্টা আরও বাড়াতে হবে।'

লোকগুলোর প্রতিক্রিয়া খেয়াল করল বিলিয়নেয়ার। চোখের কোণে দেখেছে, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বড় করে দম ফেলেছে ক্যাং লাউ।

ল্যাং-এর মনে হলো, সবাই মিলে মস্করা করছে তার সঙ্গে। বিশেষ করে লাউ। হাসছে লোকটা আড়ালে!

দাঁতে দাঁত পিষে ল্যাং ভাবল, মন্দ হতো না এদের সবক'টাকে খুন করলে। কাজটা কঠিন নয়, সিকিউরিটি চিফকে নির্দেশ দিলেই এ ঘরে বইয়ে দেবে রক্তের স্রোত।

কিন্তু এখন নয়!

নিজেকে সামলে নিল ল্যাং। হিসেব ভুল না হলে, আগামী ক'দিনেই সুস্থ হয়ে উঠবে সে। তখন, দৈহিকভাবে সক্ষম হলেই নিজ হাতে খুন করবে এই বেয়াদবগুলোকে!

চোদ্দ

মেঘভরা কালচে আকাশ। হঠাৎ হঠাৎ ওপর থেকে খসে এসে

এখানে-ওখানে পড়ছে বৃষ্টির বড় ফোঁটা। বন্দরের একটা টাগ-এর বো-তে দাঁড়িয়ে আছে রানা। পরনে উলের ভারী কোট। পায়ে বুট। মাথায় কালো ক্যাপ। কেউ দেখলে ভাববে, টাগের ক্রু।

কার্গো নিয়ে দক্ষিণে চলেছে টাগ।

নদীর দূরে চেয়ে অতীত স্মৃতির মাঝে ডুব দিয়েছে রানা।

ম্যানুয়াস শহরের নামকরা এক হোটেলের বার-এ বসে ছিল ও। ওই হোটেলেই উঠেছিল ওরা। আরেকটা ড্রিঙ্ক নেবে, এমনসময় ওর পাশের টুলে এসে বসল মেয়েটা। মৃদু মাথা দুলিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'আপনি খুব নিঃসঙ্গ, তাই না?'

'কখনও কখনও,' বলল রানা। 'আপনি?'

'আমি?' মিষ্টি হাসল মিতা। 'বেশ কয়েক বছর ধরেই একা।'

'তাই? তার আগে একা ছিলেন না?' জানতে চাইল রানা।

'না,' মাথা নাড়ল মিতা। 'বাবার মৃত্যুর পর থেকেই একা।'

মিতার ডোশিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে সোহেল। ওটা পড়েছে রানা। মেয়েটার বাবার মৃত্যু হয়েছে ফুসফুসের ক্যান্সারে। শেষ দেড় বছর খুবই কষ্ট পেয়েছেন বিনয় দত্ত। তখন প্রায় সারাক্ষণ পাশে ছিল মিতা। ওর মা কয়েক বছর আগেই স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে চলে যায় লস অ্যাঞ্জেলিসে প্রেমিকের কাছে। এজন্যে কখনও মাকে ক্ষমা করতে পারেনি মিতা।

'দুঃখিত,' নরম সুরে বলল রানা, 'বুঝিনি কষ্ট দিয়ে বসব।'

'না, ঠিক আছে,' বলল মিতা। 'আজ কেন যেন মনে পড়ছে শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি।'

রানার হাতের ইশারায় মিতার সামনে সফট ড্রিঙ্ক রেখে গেল বারটেণ্ডার।

'থ্যাঙ্কস্।' স্প্রাইটের গ্লাসে চুমুক দিল মিতা। 'খুব মন চাইছে নিজের কথা কাউকে বলি।'

'বলুন না,' বলল রানা।

'খুব ভালবাসতাম বাবাকে। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে হোক, কিন্তু হলাম আমি— মেয়ে। জেদ কাজ করত আমার মাঝে। মেয়ে বলে পিছিয়ে পড়ব না। দশ বছর বয়সে পেলাম কারাতে দো-র ব্ল্যাক বেল্ট। চোদ্দ বছরে শুটিং-এ প্রথম। পনেরো বছরে সাইক্লিং-এ দ্বিতীয়। বাবা শেখালেন কীভাবে মেরামত করতে হয় গাড়ির ইঞ্জিন। হয়ে উঠলাম দক্ষ মেকানিক। আঠারো বছর বয়সে ভর্তি হলাম নিউ ইয়র্কের নামকরা ইউনিভার্সিটিতে।' চুপ হয়ে গেল মিতা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'কিন্তু একমাস পরেই ধরা পড়ল বাবার ক্যান্সার। ফিযিক্স পড়া বাদ দিয়ে ফিরলাম বাড়িতে। খুব বকলেন বাবা। বললেন, আমি নাকি হেরে গেছি। একটা কথাও বলিনি। সাধ্যমত সেবা করলাম তাঁর, কিন্তু ফেরাতে পারলাম না, চলেই গেলেন তিনি। এরপর পুরো মনোযোগ দিলাম ফিযিক্সের বইয়ে। নতুন করে ভর্তি হলাম। বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী যে সময় দেয় বইয়ে, তার দ্বিগুণ দিলাম। আড়াই বছরের ভেতর শেষ করলাম অনার্স। এরপর মাস্টার্স ও ডক্টরেট। ভাল কোনও চাকরি খুঁজছি, তখনই যোগাযোগ করলেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান। বাবার বন্ধু, প্রায় আদর করেই দায়িত্ব দিলেন, যেন একটা অভিযানে ফিযিক্সের দিকটা দেখি। চলে এলাম ডক্টর জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে যোগ দিতে। তার পরের ঘটনা আপনার জানা।'

সে রাতে অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কথা বলেছিল মিতা। 'আপনি' থেকে সম্বোধন

নেমে এসেছিল ‘তুমি’-তে।

বাবাকে ফেলে গিয়েছিল বলে মাকে মানুষ বলেই মনে করে না। আদর যা পেয়েছে, সবই বাবার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে। এ কারণে অদ্ভুত ভালবাসা আছে ওর বুকে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির প্রতি। দায়িত্বপূর্ণ চাকরি পেলে চলে যাবে সহজ, সরল মানুষের ওই সবুজ দেশে।

ভাঁপ-ভাঁপ বিকট শব্দ শুনে চমকে বাস্তবে ফিরল রানা। সামনেই একটা বার্জ, উপচে পড়ছে কয়লায়। দূরের পাওয়ার প্ল্যান্টেশনে নামিয়ে দেবে পেটের বোঝা। টাওয়ার ল্যাং-এর ঠিক সামনে দিয়ে যাবে বার্জ। সেসময়ে টাগ থেকে নদীতে নেমে পড়বে রানা, ডুব সাঁতার কেটে হাজির হবে পুরনো দুর্গের পায়ের কাছে।

মিতা ও পাবলোকে উদ্ধারের জন্যে কয়েকটা পরিকল্পনার বিষয়ে ইগোরের সঙ্গে ক'বার আলাপ হয়েছে রানার।

ইগোরের যুক্তি ছিল: চিরকাল ওদেরকে কারাগারে রাখবে না ল্যাং। যখন সরাতে যাবে, তখনই হামলা করা ভাল। সেজন্যে চাই ল্যাং-এর পরিকল্পনার শেকলে দুর্বল একটা খুঁত।

রানা বুঝে গেল, ইগোরের পরিকল্পনায় ত্রুটি আছে।

রাশানের কথা অনুযায়ী: প্রথমেই জানতে হবে কখন-কোথায় তারা নেবে মিতা বা পাবলোকে। অথচ এটা স্বাভাবিক, কারাগার থেকে বেরোলেই পালাতে চাইবে বন্দি, কাজেই অত্যন্ত সতর্ক থাকবে প্রহরীরা। সেক্ষেত্রে খুব কঠিন হবে হামলা করে কাউকে ছিনিয়ে নেয়া। তা ছাড়া, ল্যাং কখন কোথায় সরাবে ওদেরকে, সেজন্যে অপেক্ষা করতে হবে। অথচ, নরকে কাটছে মিতা ও পাবলোর প্রতিটা পল।

দুর্গ ও টাওয়ারের স্কিম্যাটিক্স্ দেখে ওরা বুঝেছে, পুরনো দুর্গে আছে অদ্ভুত স্যানিটেশন সিস্টেম। ওটা তৈরি করেছিল

ব্রিটিশ সৈনিকরা। কারাগারের বন্দিদের টয়লেটের সঙ্গে যুক্ত দুটো সুড়ঙ্গ, জোয়ারের সময় ওই দুই টানেলের কাঠের দরজা খুললে নদীতে বেরিয়ে যায় সমস্ত বর্জ্য।

'শেষে ইঁদুরের মত সুয়ারেজ দিয়ে ঢুকবে?' জানতে চেয়েছে ইগোর।

মন্তব্য করেনি গম্ভীর রানা।

পরে দেখা গেল, আজ আর নেই সে কাঠের দরজা, সেখানে আছে কংক্রিটের প্লাগ। তখন মিতা ও পাবলোকে ছুটিয়ে আনার মাত্র একটা উপায়ই থাকল।

বাধ্য হয়ে বাঙালী গুপ্তচরের যুক্তি মানল ইগোর দিমিতভ।

মুখ তুলে কালচে আকাশ দেখল রানা। ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা, যে-কোনও সময়ে ঝাঁপিয়ে নামবে বৃষ্টি। আঁধারে সহজেই লুকিয়ে পড়তে পারবে ও।

টাগ-এর পাইলট হাউসে এসে ঢুকল রানা। কোনও কথা হলো না ইগোরের সঙ্গে। চুপচাপ হাত লাগাল ওরা, পরীক্ষা করছে দরকারি গিয়ার।

'হেলিকপ্টার তৈরি রাখতে বোলো,' বলল রানা, কাজে ব্যস্ত। 'মাত্র একটাই সুযোগ পাব।'

দু'মিনিট পর টাগ-এর উল্টোদিক দিয়ে নদীতে নামল ও। পরনে কালো ওয়েট সুট, পিঠে রিব্রিদার। খয়েরি আকাশ হয়ে গেছে প্রায় কালো।

পানির নিচে তলিয়ে অপেক্ষা করল রানা। টাগ পেরোবার পর সাঁতার কেটে এগোল দুর্গের দিকে। চলেছে পানির পনেরো ফুট তলা দিয়ে। গতি ধীর, ছন্দোবদ্ধভাবে চলছে দু'পা।

প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাচ্ছে সিসিআর থেকে। স্কুবা গিয়ারের মত ভারী নয় হালকা ক্লোয্ড্-সার্কিট রিব্রিদার। ব্যবহৃত বাতাস আবারও ফিল্টার করবে। উঠবে না কোনও

বুদ্বুদ।

শত্রুপক্ষ বিপদের আশঙ্কা করবে, তা মনে করছে না রানা। কিন্তু প্যারানোইয়া আছে হুয়াং লি ল্যাং-এর। হয়তো দলের লোককে বলেছে নদীর দিকে চোখ রাখতে। সেক্ষেত্রেও কিছুই দেখবে না তারা।

কয়েক মিনিট সাঁতরে দুর্গের কাছে পৌঁছুল রানা। বন্দরের এদিকে উঠে এসেছে নদীর তলদেশ। কাদাগোলা পানি। সাবধানে এগোবার পর হঠাৎ থামল ও। নাকের এক ইঞ্চি দূরে দুর্গের ঢালু ভেড়িবাঁধ। উঠতে শুরু করে কাদাটে পানির স্তর ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। সামনে কালো রঙের রুক্ষ পাথরের ভিত্তি।

জলসমতল থেকে দু'ফুট নিচে থেমে, চিত হয়ে ওপরে চোখ রাখল রানা। কালচে পানি ভেদ করে আসছে সামান্য আলো, তবে ওটার মালিক ডিসেম্বরের সূর্য নয়। জেগে উঠেছে ঝলমলে শহর। বিশেষ করে টাঁওয়ার ল্যাং নদীতে ফেলেছে সাদা রশ্মি।

ঘুটঘুটে আঁধার নামবে, সে আশা নেই, বুঝে গেল রানা। চট্ করে একবার দেখল হাতঘড়ি। কাজে নেমেছে শিডিউলের চেয়ে আগে। সমতল পাথরের স্তরে পিঠ ঠেকিয়ে শুয়ে থাকল। চুপচাপ দেখছে ওপরের পানি। নদীর বুকে টুপটাপ করে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা, তৈরি করছে গোল আংটি। ছড়িয়ে গিয়ে মিশে যাচ্ছে অন্য ফোঁটার আংটির সঙ্গে। বোঝার উপায় নেই, এবার কোথায় হবে আলোড়ন। একটু পর শুরু হলো মাঝারি বর্ষণ।

মৃদু হাসল রানা। কপাল ভাল ওর। বর্ষার কারণে বেশিদূর দেখবে না কেউ। নদীতীরে শীতের রাতে যে ভিজতে আসবে পাহারাদার, সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ । তা ছাড়া, রানা যাবে এমন দিকে, যেখানে ভুলেও কারও যাওয়ার

কথা নয়।

সতর্ক কুমিরের মত চোখ জাগাল রানা। সামনেই ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো কালো পাথরের ভেড়িবাঁধ ঢালু হয়ে গেছে ওপরে। নদীতীর থেকে আশি ফুট দূরে আকাশে উঠেছে কারুকাজ করা সাদাটে ইটালিয়ান গ্র্যানেট দিয়ে তৈরি এক শ' এগারোতলা দালান। ওটার বুক থেকে বেরোচ্ছে উজ্জ্বল আলো। নিচের কালো পাথরের মাঝ দিয়ে কালো পোশাক পরা এক লোক উঠে এলে টের পাওয়া কঠিন।

নদীতীরের পাথরে বসে ফ্লিপার, সিসিআর ও মুখোশ খুলল রানা, তারপর কালো পাথরের ঢালু ভেড়িবাঁধ বেয়ে উঠতে লাগল কাঁকড়ার মত। খুঁজে নিল আগেই দেখে রাখা ফাটলটা। ওটা বেয়ে দশ ফুট ওঠার পর পেল দুর্গের দেয়াল। একফুট চওড়া স্ল্যাব দিয়ে তৈরি ওটা। ক্ষয়ে গেছে চুন-সুরকি। শুধু ওজনের কারণে এখনও জায়গামত রয়ে গেছে দেয়াল।

ওখানে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা। চারতলা ওপরে প্রাচীন দুর্গের ছাত এখন ম্যানিকিওর করা উঠান। এক পাশে ফুলের বেড, আরেকদিকে ওয়াকওয়ে, সোজা থেমেছে ল্যাং-এর টাওয়ারের প্রবেশপথে।

অনেক নিচে কালো নদী। পাথুরে দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে এক পাশে সরতে লাগল রানা। একটু পর থামল উল্লম্ব এক ফাটলের সামনে। ওটা মাত্র একফুট উঁচু, চওড়ায় ছয় ইঞ্চি। আগে ছিল পুরনো কেল্লার গানপোর্ট। মাস্কেট ব্যবহার করে ওদিক দিয়ে গুলি চালাত শত্রুপক্ষের ওপর। রানা ঠিক করেছে, ওখানেই বসাবে বিস্ফোরক। কিন্তু তার আগে বুঝতে হবে, ঠিক জায়গায় পৌঁচেছে কি না।

ব্যাকপ্যাক পিঠ থেকে নামিয়ে ওখানে বসল রানা। ব্যাগ থেকে বের করল ছোট এক স্বচ্ছ বাক্স। ওটার পাশে রয়েছে

ব্যাটারি, ট্র্যান্সফর্মার, মাইক্রোফোন, ক্যামেরা ও অ্যান্টেনা।

এনআরআই ওই জিনিসের নাম দিয়েছে: দুর্ধর্ষ মাকড়সা।

আমেরিকা থেকে রওনার সময় ওটা জেমস ব্রায়ান দিয়েছিলেন রানাকে। বাটন টিপলে বাক্স থেকে বেরোয় সরু আট পাওয়ালা পোকা, দুর্গম জমিতে এগুলো চলে অনায়াসে। এমন কী লাফিয়ে উঠতে পারে সিঁড়ির ধাপ। তবে এ মিশনে তার প্রয়োজন পড়বে না। ইগোরের জোগাড় করা নক্সা অনুযায়ী নিচে নামতে হবে মাকড়সাকে।

যন্ত্রটা চালু করে সরু গানপোর্টের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল রানা। ওদিকে কেউ নেই, ভেতরে ফেলতেই টুপ্ শব্দে নিচে পড়ল ডিভাইসটা।

একটু ডেবে যাওয়া দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল রানা। বৃষ্টির ছাঁট ওখানে লাগছে না। ব্যাকপ্যাক থেকে নিল কন্ট্রোল ইউনিট। কানে পরল হেডসেট। ওটায় আছে ছোট্ট স্পিকার। মাইক্রোফোনের ধরা শব্দ শুনতে পাবে ও। ডান চোখে দেখবে ক্যামেরায় ধরা দৃশ্য। সেজন্যে আছে খুদে এলএসডি স্ক্রিন।

ডিভাইস অন করতেই চালু হলো আইপিস। দুর্গের ভেতর অংশ ষোলো শতকের কারাগারের মত। নোংরা, ঘিঞ্জি। নিচু ছাত। নানাদিকে জংধরা লোহার দরজা। সবই মেডেইভেল আমলের মত, কিন্তু দূর কোণে স্টিল ও রিএনফোর্স্ড্ দশ ফুটি বৃত্তাকার কলাম। ওটা কারাগার ভেদ করে নেমেছে পাথরের বুকে। এ ধরনের কলাম ধরে রেখেছে ল্যাং-এর সুউচ্চ টাওয়ার। এক পাশে এলিভেটর শাফ্ট্।

বাটন টিপে যন্ত্রটাকে সামনে পাঠাল রানা।

একটু দুলছে ক্যামেরার দৃশ্য। মালিকের নির্দেশে শিকারে বেরিয়ে পড়েছে মাকড়সা!

পনেরো

ল্যাং-এর কারাগারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানান উঁচু জায়গা বেছে শুয়ে-বসে আছে বন্দিরা। এ ছাড়া উপায়ও নেই। বৃষ্টির ছাঁট লেগে ভিজে গেছে শীতল মেঝে। একদিকের সেল-এ গিয়ে ঢুকেছে মিতার হাতে পিট্টি খাওয়া, আহত দুই বন্দি। মিতার সেল-এ রয়ে গেছে ও নিজে, দিমিতভ, পাবলো, বুড়ো চাইনিজ ও ভারতীয় মহিলা।

আপাতত জেগে আছে মিতা ও পাবলো। ঘুমিয়ে পড়েছে অন্যরা। একটু আগে নেমেছে সন্ধ্যা। এ নরকের মত গারদে বাস করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে উঠছে ওরা, তাই চাই বিশ্রাম। জানে, জীবনেও আর কখনও বেরোতে পারবে না এখান থেকে।

মিতা অবশ্য হাল ছেড়ে দেয়নি। নিজেকে বুঝিয়েছে, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আগের চেয়ে হয়ে উঠেছে অনেক সতর্ক। ঠিক সময়ে খাবার পেলে খেয়ে নিচ্ছে। শরীর ঠিক রাখতে হবে। প্রথম সুযোগেই চেষ্টা করবে এখান থেকে বেরোবার।

পাবলোর দিকে তাকাল মিতা।

মাথা না ঘুরিয়েই ওর দিকে তাকাল ছেলেটা। কী করে যেন বুঝে গিয়েছে, ওর দিকে চেয়েছে কেউ। সত্যি কথাই বলেছে দিমিতভ, কখনও ঘুমায় না এই ছেলে।

মিষ্টি করে হাসল মিতা।

বদলে পেল মধুর হাসি।

পাবলোর দিকে চেয়ে চোখ পিটপিট করল মিতা। একই কাজ করল ছেলেটা। দুষ্টুমি করছে? বোঝা মুশকিল!

হঠাৎ ঝট্ করে ঝাঁকি খেল পাবলোর মাথা। কিছু শুনলে ওভাবে চমকে ওঠে অনেকে। ছেলেটার চোখ গেল করিডোরে।

কান পাতল মিতা। বাইরে দমকা হাওয়ায় ভর করে কাত হয়ে নামছে তুমুল বৃষ্টি। না, এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। আগেই দেখেছে, এলিভেটর নামলে কীভাবে যেন জেনে যায় ছেলেটা। কিন্তু এবার তেমন কিছু তো হয়নি?

উঠে বসল পাবলো। চুপ করে চেয়ে আছে করিডোরের দূরে। সাবধানে গা থেকে ফেলে দিল পাতলা কাঁথা।

হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকল মিতা। 'এসো। আমার কাছে বসবে।'

দ্বিধা করল বাচ্চা, তারপর এসে বসল মিতার উঁচু বাঙ্কে।

মাত্র কয়েকটা রাশান শব্দ জানে মিতা, তাতে কোনও কাজ হবে না। আসলে উপায় নেই আলাপ করার। আলতো হাতে পাবলোর কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিল মিতা।

খুশি হয়ে ওকে দেখল বাচ্চাটা, পরক্ষণে আড়ষ্ট হয়ে গেল। হাত তুলে মেঝে দেখিয়ে রাশান ভাষায় বলল, 'ওদিকে! ওদিকে!'

করিডোরে চোখ বোলাল মিতা।

কেউ নেই।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর ও শুনল তবলার বোলের মত মৃদু আওয়াজ। ওটা আসছে এলিভেটরের কাছ থেকে। থেমে গেল শব্দটা। শুরু হলো আবার। এবার আবছা অন্ধকারে ওর মনে হলো, কী যেন এসে থামল সেল-এর দরজার সামনে।

মিতা ভাবল, ওটা হয়তো ইঁদুর। আগেও এখানে দেখেছে

ওই প্রাণী। কিন্তু আলোর অভাব বলেই ঠিক বোঝা গেল না, কী করছে ওটা। এটা ঠিক, থেমে গেছে। একদম নড়ছে না।

বাঙ্ক থেকে দশফুট দূরে দরজা। আঙুল তুলে বারবার ওটাকে দেখাচ্ছে পাবলো। মিতা কিছুই করছে না দেখে হাতের তালু ওদিকে তাক করল ছেলেটা। ভাব দেখে মনে হলো ঠেকিয়ে দেবে কিছু। বার কয়েক বলল, 'মেশিন... মেশিন!'

'ঠিক আছে, ভয়ের কিছু নেই,' ওকে শান্ত করতে চাইল মিতা। বাচ্চাটার হাত ধরে নিজের মুঠোয় নিল। 'ভয় নেই।'

'মেশিন! মেশিন!' আবারও বলল পাবলো।

বাঙ্ক থেকে নেমে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে চমকে গেল মিতা। ধক-ধক করছে হৃৎপিণ্ড।

সত্যিই একটা যন্ত্র!

আগেও ওই জিনিস দেখেছে ও এনআরআই অফিসে!

তা হলে কি সাহায্য করতে পৌঁছে গেছে কেউ?

মুক্তি পাবে ও?

আঙুল তাক করে যন্ত্রটা বারবার দেখাচ্ছে পাবলো।

ওই যন্ত্রে আছে ছোট মাইক্রোফোন, মনে পড়ল মিতার। দেরি না করে নিচু স্বরে বলতে লাগল এদিকের পরিস্থিতি।

'আমরা সাতজন বন্দি। কোনও পাহারাদার নেই। কোনও ক্যামেরা নেই। বেরোবার কোনও পথও নেই। উঠতে বা নামতে ব্যবহার করতে হয় এলিভেটর। বুঝতে পেরেছেন?'

চার পা ব্যবহার করে কয়েকবার ওপর-নিচ করল মাকড়সা। যেন বুঝিয়ে দিল সবই বুঝতে পেরেছে সে।

চারপাশ দেখে নিয়ে বলল মিতা, 'আপনি কি রেকি করতে এসেছেন?'

এদিক-ওদিক দুলল মাকড়সা।

‘তা হলে মুক্ত করতে এসেছেন?’

কয়েক সেকেণ্ড পর পায়ে ভর করে উঁচু-নিচু হলো মাকড়সা। তিনবার ওঠা-নামার পর থামল। বোকার মত যন্ত্রটার দিকে চেয়ে রইল মিতা। কী বলতে চাইছে লোকটা?

একটু বিরক্ত হয়ে বলল, ‘কী বোঝাতে চেয়েছেন বুঝলাম না!’

আবারও তিনবার ওঠা-নামার পর থামল মেশিন। হতাশ হয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাঙ্কে জুত হয়ে বসল মিতা। তখনই এল করিডোর থেকে বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ।

থরথর করে চারপাশ কাঁপিয়ে দিল শকওয়েভ। আরেকটু হলে কাত হয়ে বাঙ্ক থেকে পড়ে যেত মিতা। পুরনো কারাগারের ভেতরে ঢুকেছে একরাশ ধুলো ও ধোঁয়া।

কাশতে শুরু করে করিডোরের দিকে তাকাল মিতা। ওর হাত ধরে আছে পাবলো। জেগে গেছে এ ঘরের সবাই, হতবাক।

‘কী হয়েছে?’ বেসুরো কণ্ঠে জানতে চাইল চাইনিজ বৃদ্ধ।

ওপর থেকে এল আবছা আওয়াজ। মিতা বুঝল না, ওটা আর্থকোয়েক না ফায়ার অ্যালার্ম। বেজে চলেছে একটানা।

পাবলোর টানে বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল মিতা। তখনই দেখল করিডোরের উড়ন্ত ধুলোর মাঝ দিয়ে হাজির হয়েছে এক লোক। জানতে চাইল সে, ‘মিতা, ঠিক আছ তো?’

ওই গম্ভীর কণ্ঠ চেনা চেনা লাগল মিতার। ধুলো ও ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে এসে ওর সামনে থামল লোকটা।

ভীষণ অবাক হলো মিতা। ‘রানা? তুমি? এখানে কী করে?’

জবাব দিল না রানা, ব্যস্ত। ব্যাকপ্যাক থেকে বের করছে কী যেন! ‘কী করে তা পরে শুনো, আগে ভাগতে হবে এখান থেকে!’

বাজতে শুরু করেছে আরও কয়েকটা অ্যালার্ম।

ল্যাং-এর সিকিউরিটি অফিসাররা জেনে গেছে, জোর করে কারাগারে ঢুকেছে কেউ।

'এখন কী করব আমরা?' জানতে চাইল মিতা। রানাকে পাশে পেয়ে নিশ্চিন্ত।

'কিন্তু যাব কোথায়?' জানতে চাইল চাইনিজ বৃদ্ধ।

'করিডোরের সামনে পাবেন ভাঙা গানপোর্ট, ওদিক দিয়ে বেরিয়ে নেমে পড়বেন নদীতে,' বলল রানা, 'দক্ষিণে গেলে স্রোতের সঙ্গে ভেসে গিয়ে উঠবেন তীরে। পালাতে চাইলে এখনই।'

চাইনিজ বৃদ্ধ বা ভারতীয় মহিলা যে এত চালু, আগে বুঝতে পারেনি মিতা। রানার কথা শেষ হতে না হতেই আঁধারে হারিয়ে গেল তারা।

চারপাশ দেখল রানা। 'তুমি বলেছিলে তোমরা সাতজন।'

করিডোরের ওদিকের সেল দেখাল মিতা। আহত লৌ এবং তার মার খাওয়া বন্ধু গিয়ে ঢুকেছে ওদিকে।

'ওরা আসছে না কেন?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের মতাদর্শে বিভেদ তৈরি হয়েছিল,' নরম সুরে বলল মিতা। 'এখন দেহে-মনে কষ্ট নিয়ে শুয়ে আছে। কাউকে না কাউকে তো কয়েদখানার মালিক হতে হবে!'

'ও, তার মানে মার খেয়েছে?'

'হুঁ, চলো, বেরিয়ে যাই।'

'ছেলেটাকে সঙ্গে নেব,' বলল রানা, 'ওর দায়িত্ব থাকল তোমার ওপর।'

'চেনো পাবলোকে?' জানতে চাইল মিতা।

'আমাদের চুক্তির অর্ধেক অংশ ও,' বলল রানা। 'পরে বলব কী হয়েছে।'

আরও কিছু বলত মিতা, কিন্তু লোহার গেটের সামনে থামল রানা। ওই গেট পেরোলেই সামনে এলিভেটর। তালার ভেতর সামান্য প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ঠুসে দিল ও, তারপর পিছিয়ে এল।

চিৎকার জুড়ল পাবলো। যে কারণেই হোক, ভীষণ ভয় পেয়েছে। এক হাতে চেপে ধরেছে ডান কান, বাম হাতে দেখাচ্ছে এলিভেটর। 'ওরা! ওরা!'

হঠাৎ খুলে গেল এলিভেটরের দরজা, ভেতর থেকে ছিটকে এল কয়েকটা ডার্ট। পেছনে রয়েছে কেব্‌ল্‌। রাইফেলের মত দেখতে কোনও টেইযার থেকে এসেছে ওগুলো। রানা ঝট্‌ করে সরে গেলেও একটা ডার্ট লাগল মিতার গায়ে। হায়-হায় করে উঠল ওর মন, যাহ্‌, আবারও বন্দি হয়ে গেলাম!

শরীর জুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র ব্যথা।

কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে মিতা। কিন্তু এক টানে ওর দেহ থেকে ডার্ট খুলে নিল রানা। বাম হাতে ধরল মিতাকে। পরক্ষণে পাবলো আর ওকে ঠেলে সরিয়ে নিল দেয়ালের ওদিকে। নিজেও আড়াল নিল ওখানে।

নিজের ওপর রেগে গেছে রানা। সিকিউরিটির লোক নেমে আসবে, আগেই জানত। কিন্তু এরা নিভিয়ে দিয়েছিল এলিভেটরের ভেতরের বাতি। দরজা খুলে যাচ্ছে, এমনসময় চেঁচিয়ে উঠল রাশান ছেলেটা— তখন সামান্য মনোযোগ হারিয়ে বসে।

হাতের কারবাইন দিয়ে ওদিকে গুলি পাঠাল রানা।

বুকে গুলি বিঁধতেই করিডোরের মাঝে শিয়ালের মত হুক্কাহুয়া করে উঠল এক লোক। ধুপ্‌ আওয়াজ হলো মেঝেতে লাশ পড়ার।

'একজন গেল,' বিড়বিড় করল মিতা।

এদিকে ডেটোনেটর সুইচ টিপেছে রানা।

গেটের তালায় গুঁজে রাখা সি-৪ বিস্ফোরিত হতেই ছিটকে খুলল লোহার শিকের দরজা। ওটার বাড়ি খেয়ে নাক ও চোয়াল ভেঙে অচেতন হলো দ্বিতীয় গার্ড।

কিন্তু তখনই করিডোর থেকে গুলি পাঠাল তৃতীয় গার্ড।

পাথরের ঘরে নানান দিকে ছিটকে যাচ্ছে বুলেট। ব্যাকপ্যাক থেকে গ্রেনেড নিয়ে পিন খুলে করিডোরে ছুঁড়ল রানা। ঠং শব্দে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ল হাতবোমা।

জানা আছে বলে এক এক করে সেকেণ্ড গুনতে শুরু করেছিল মিতা, কিন্তু তিন বলার আগেই করিডোরের ওদিকে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। ওই কংকাশন ছিটকে ফেলে দিয়েছে তৃতীয় গার্ডকে।

এক সেকেণ্ড পর দেয়ালের বাঁক ঘুরে বুলডোযারের মত করিডোরে বেরোল রানা। দুই লাফে পৌঁছুল গার্ডের পাশে। মাত্র উঠে বসেছে সে। তার হাত থেকে টেইযারের মত অস্ত্রটা কেড়ে নিল রানা, পরক্ষণে ট্রিগারে তর্জনী ভরে মাযল তাক করল গার্ডের বুকে। বিদ্যুতের প্রচণ্ড শক খেয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল লোকটা, মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে হয়ে উঠল সত্যিকারের যোম্বি।

এলিভেটরের দিকে তাকাল রানা। শাফট থেকে আসছে বেশ কয়েকটা অ্যালার্মের কান্না। তাল মিলিয়ে সুর ধরেছে বাইরের কিছু অ্যালার্ম। ওদিকে রাতের ঘুটঘুটে আঁধার ও ধোঁয়া চিরে নানা দিকে গেছে ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল সাদা আলো। চিৎকার শোনা গেল প্রাচীন দুর্গের ছাতে।

ওদিক দিয়ে গার্ডদের নামতে লাগবে কয়েক মিনিট। এখন ভাঙা গানপোর্ট দিয়ে বেরোলে খুন হবে রানারা।

'মিতা, ছেলেটাকে নিয়ে এসো,' ডাকল রানা। কটুগন্ধী

ধোঁয়ার মাঝে দেখল, আরেক বন্দিকে উঠতে সাহায্য করছে মিতা ও পাবলো। হাতে একফোঁটা বাড়তি সময় নেই, তবুও ওদিকে পা বাড়াল রানা।

'এমনিতেই মরব, রেখে যান,' জড়ানো কণ্ঠে বলল লোকটা। 'পাবলোকে নিয়ে বেরিয়ে যান আপনারা!'

'না, আপনাকে রেখে যাব না,' শক্ত হাতে দিমিতভের কবজি ধরল মিতা।

'তা হলে খুন হবেন,' বলেই উল্টো মিতাকে রানার দিকে ঠেলে দিল ট্রলারের ক্যাপ্টেন। ভারসাম্য সামলাতে না পেরে পড়ে গেল এক পাশের বাঙ্কের পাশে। 'বাঁচান পাবলোকে!'

তার পাশে থামতেই রানা দেখল, কাটা হাঁটু রক্তাক্ত ন্যাকড়ায় মুড়িয়ে রেখেছে রাশান। তখনই নাকে লাগল গ্যাংগ্রিনের দুর্গন্ধ। এই লোক মারাত্মকভাবে আহত, বাঁচবে না।

'দয়া করে পাবলোকে নিয়ে যান, ওকে বাঁচান!' আবারও বলল রাশান। তার একটা হাত ধরে বসে পড়েছে ছেলেটা। নীরবে কাঁদছে। যাবে না বন্ধুকে ফেলে।

আবছা আলোয় রানার চোখে তাকাল মিতা, পরক্ষণে নিল সিদ্ধান্ত। খপ্ করে ধরল পাবলোর হাত, টান দিয়ে সরিয়ে নিল রাশান ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে। গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল বাচ্চা ছেলেটা।

'আমাকে একটা অস্ত্র দিয়ে যান,' কাঁপা কণ্ঠে বলল দিমিতভ।

মানুষটা বন্দি হতে চায় না। ব্যাকপ্যাক থেকে রাশান পিস্তল ও একটি ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড নিল রানা, ধরিয়ে দিল লোকটার দু'হাতে। উঠে দাঁড়িয়ে মিতার হাত ধরে ছুটল এলিভেটরের দরজা লক্ষ্য করে।

পাবলোর কনুই শক্ত করে ধরে রেখেছে মিতা। বেসুরো

কণ্ঠে জানতে চাইল, 'আমরা এলিভেটরে উঠব?'

'ওরা বাইরের সীমানা পাহারা দিচ্ছে, কাজেই ছাতে উঠব,' বলল রানা। 'ওদের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

এলিভেটরে চাপল ওরা। রানা দেখল, এখনও স্লট-এ ঝুলছে গার্ডের চাবি। ওটা মুচড়ে দিলে ওপরে উঠবে এলিভেটর কার। কিন্তু তার আগে কাজ আছে। এক পাশে রাইফেল ঠেস দিয়ে রেখে কণ্ট্রোল প্যানেল টেনে খুলল রানা।

'কী করছ?' জানতে চাইল মিতা।

'ওভাররাইড করব ওদের কমপিউটার,' বলল রানা। প্যানেলের ভেতর থেকে টান দিয়ে বের করল চিরুনির মত দেখতে ইলেকট্রনিক ইণ্টারফেস। ওটার সঙ্গে যুক্ত ক্যালকুলেটর আকৃতির কী যেন।

এলিভেটরের ইণ্টারফেস-এ ঢুকেছে অসংখ্য তার। ওগুলো সাবধানে বের করে নিল রানা, তারপর আটকে নিল ওর আনা ইলেকট্রনিক ইণ্টারফেস-এ। চিরুনি গেঁথে দিল ক্যালকুলেটরের বুকে। কি প্যাডে টাইপ করল: ১১১। কাজটা শেষ করেই টিপল এণ্টার। ডিসপ্লেতে দেখা গেল: লক্। বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা, তীব্র গতি তুলে উঠতে লাগল এক্সপ্রেস কার।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে পাবলো। দু'হাতে তুলে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল মিতা। 'কিচ্ছু হয়নি। কাঁদে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সত্যিই ভাল মা হবে মিতা, ভাবল রানা। পরক্ষণে পরীক্ষা করল ডিসপ্লের রিডআউট। পেরিয়ে যাচ্ছে বিশতলা। গতি আরও বাড়ছে। যে ডিভাইস ব্যবহার করছে রানা, ওটা পেয়েছে এনআরআই চিফের কাছ থেকে। এই টাওয়ারের এলিভেটরের কমপিউটার সিকিউরিটি প্রোটোকল ওভাররাইড তো করছেই, কমপিউটারকে জানাচ্ছে ভুল তথ্য: এলিভেটর

রয়ে গেছে এখনও জেলখানায়।

দুর্গ ঘিরে রাখবে হুয়াং লি ল্যাং-এর বাহিনী, আর আরেক দল লবিতে দাঁড়িয়ে বারবার কল বাটন টিপে ডাকবে এলিভেটর। এই বুঝি এল ওটা।

কিন্তু ততক্ষণে তাদেরকে কাঁচকলা দেখিয়ে ওরা উঠে যাবে ছাতে।

রানার মগজে ঘুরছে একটা চিন্তা: ঠিক সময়ে আসবে তো ইগোর দিমিতভের হেলিকপ্টার?

ব্যাকপ্যাক থেকে তিনটে হার্নেস বের করল রানা, ওগুলোর সঙ্গে রয়েছে স্টিলের তার। শেষমাথায় স্ন্যাপ রিং। একটা মিতার জন্যে, একটা পাবলোর জন্যে, অন্যটা ওর।

পাবলোকে হার্নেস পরাতে শুরু করে বলল রানা, 'মিতা, পরে নাও।'

হার্নেস নিয়ে প্রথমে পা ওটার ভেতর ভরল মিতা, তারপর দুই হাত।

রানা হার্নেস পরিয়ে দিচ্ছে বলে খুব অবাক হয়েছে পাবলো। বন্ধ হয়েছে কান্না। ফোলা চোখ লাল। গালে লোনা জলের দাগ।

'জানলে কী করে, আমি এখানে?' জানতে চাইল মিতা।

'মিস্টার ব্রায়ান নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন তোমার খবর দিতে। অনুরোধ করেন, যেন হংকং থেকে তোমাকে নিয়ে পৌঁছে দিই আমেরিকায়।'

'উনি জানলেন কী করে যে আমি এখানে?'

'হুয়াং লি ল্যাং-এর লোক তোমাকে কিডন্যাপ করলে ব্রায়ানকে ফোন দেন প্রফেসর হ্যারিসন। এরপর কোথায় আছ তা খুঁজে বের করেন ব্রায়ান।'

'তা হলে বেঁচে আছেন ডক্টর জর্জ হ্যারিসন?' ঝলমল করছে মিতার দুই চোখ। 'ভেবেছিলাম খুন হয়ে গেছেন

বুঝি।'

এলিভেটর রিডআউট দেখল রানা। ঝড়ের গতি তুলে উঠছে ওরা। 'নব্বুই তলা। পনেরো সেকেণ্ড পর পৌঁছাব ছাতে।'

'তারপর কী করবে?' জানতে চাইল মিতা।

'আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে হেলিকপ্টার।'

'তা হলে হার্নেস আনলে কেন?'

'ছাতে নামতে পারবে না হেলিকপ্টার।'

বৃষ্টিভেজা, আঁধার ছাতে উঠে থামল এলিভেটর, খুলে গেল দরজা।

রানা রাইফেল হাতে বেরোতেই পাবলোর হাত ধরে ছাতে পা রাখল মিতা। জানতে চাইল, 'কোথায় হেলিকপ্টার?'

মস্ত ছাতের আশপাশে কোথাও নেই ওই জিনিস!

তুমুল বৃষ্টি, সেই সঙ্গে দমকা হাওয়া।

রানার মনে হলো, গতরাতের মতই শহরের রঙিন আলো মেখে মাথার কাছে নেমে এসেছে ধূসর মেঘ। বাস্তবে ছাত থেকে আছে অন্তত সিকি মাইল ওপরে। ভাবছে রানা, স্কাইস্ক্র্যাপার ভরা শহরে বাজে এ আবহাওয়ায় কপ্টার আকাশে তুলবে না সুস্থ মগজের পাইলট। বৃষ্টির কারণে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

অবশ্য ইগোরের বক্তব্য অনুযায়ী, সঠিক সময়ে পৌঁছাবে যান্ত্রিক ফড়িং। রাশান ছেলেটাকে খুব দরকার তাদের।

ছাতে রেলিং বলতে কিছুই নেই, কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল রানা। অনেক নিচে পাথুরে জমিন। আকাশ ভেঙে নেমেছে বৃষ্টি।

'এল না কেউ,' ভিজতে ভিজতে বলল হতাশ মিতা।

বৃষ্টির শব্দ পাত্তা না দিয়ে কান পাতল রানা। কোথাও নেই পাখার ধুব-ধুব আওয়াজ। কিছুক্ষণ পর দূর থেকে এল

চাপা বিস্ফোরণের শব্দ। একবার মৃদু কাঁপল গোটা ছাত।

চট্ করে রানার দিকে তাকাল মিতা। বুঝে গেছে, কী হয়েছে। গ্রেনেড ফাটিয়ে দিয়েছে ট্রলারের ক্যাপ্টেন দিমিতভ, মারা যাওয়ার আগে বোধহয় সঙ্গে নিয়েছে কয়েকজন গার্ডকে।

'এবার ওরা বুঝবে, এলিভেটর নিচে নেই,' বলল মিতা।

মৃদু মাথা দোলাল রানা। একটু আগেই হয়তো টের পেয়েছে সিকিউরিটির লোক।

ওরা শুনল ভারী মেশিনের গুঞ্জন। দ্রুত উঠে আসছে দ্বিতীয় এলিভেটর।

'নিশ্চয়ই ব্যাকআপ প্ল্যান আছে?' আশা নিয়ে রানার দিকে তাকাল মিতা।

'নেই।' ব্যাকপ্যাক থেকে পিস্তল নিয়ে মিতার হাতে দিল রানা। রাইফেল হাতে নিজে কাভার করল এলিভেটর শাফট ও সিঁড়িঘর।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু দূরে সরে বসল মিতা। একহাতে ধরে রেখেছে পাবলোর কনুই, অন্য হাতে ম্যাকারভ পিস্তল।

গন্তব্যে পৌঁছে টুং আওয়াজ তুলল এলিভেটর। রানা দেখল, দরজার তলা দিয়ে আসছে আলো। রাইফেল হাতে ওদিকে চোখ রাখল। তিন সেকেণ্ড পর খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। ভেতরে কেউ নেই!

ঝট্ করে সিঁড়িঘরের দিকে রাইফেল তাক করল রানা।

তখনই পেছন থেকে এল কড়া ধমক: 'অস্ত্র ফেলো, নইলে খুন হবে!'

কুঁচকে গেল রানার ভুরু। অস্বাভাবিক হলেও এই ছাতের পাশে উঠেছে ফায়ার এস্কেপ, ওই পথে এসেছে ল্যাং-এর লোক!

হাত থেকে রাইফেল ফেলে দিল রানা। ঠনাৎ আওয়াজে

ছাতে পড়ল মিতার পিস্তল।

'ঘুরে দাঁড়াও!'

পাবলোকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে মিতা। খুব ধীর গতি তুলে ঘুরল রানা। তিনজন গার্ডকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মোটা এক চাইনিজ লোক। আগে তাকে দেখেনি রানা, কিন্তু ডোশিয়ে পড়েছে, বুঝে গেল এই লোকই ক্যাং লাউ— ল্যাং-এর খাস লোক, ডানহাত!

'ছাতে শুয়ে পড়ো,' আরেক ধমক দিল মোটকু।

অলসভঙ্গিতে ছাতে শুয়ে পড়ল রানা। দূর থেকে এল ভারী ধুব-ধুব আওয়াজ। আসছে খুব দ্রুত। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে হাজির হলো দালানের ছাতের ওপরে।

ঘাড় কাত করে হেলিকপ্টারের দিকে তাকাল রানা। ওটা চকচকে কালো ইউরোপিয়ান জিনিস। খুলে গেছে একদিকের দরজা। ওখান থেকে এল এক পশলা গুলি।

কিছু বোঝার আগেই বুক-পেটের বেশিরভাগ রক্ত ছড়িয়ে ছাতে লাশ হলো দুই গার্ড। জান বাঁচাতে ফায়ার এস্কেপের দিকে ছুটল ক্যাং লাউ এবং অন্য গার্ড।

রানাদের খুব কাছে এসে ঘুরে গেল হেলিকপ্টার।

সিঁড়িঘর থেকে হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে এল গুলি।

আবারও রাইফেল তুলে নিয়েছে রানা, অর্ধেক ম্যাগাযিন খালি করল ওদিকের গার্ডদের উদ্দেশে।

এদিকে আরও কাছে এল হেলিকপ্টার। ওটার দরজা থেকে নিচে পড়ল স্টিলের কেব্‌ল্। রানা গুলি ছুঁড়তে ব্যস্ত, লাফিয়ে উঠে কেব্‌ল্ টেনে নিল মিতা।

'হার্নেসে আটকে নাও!' নির্দেশ দিল রানা।

আগে পাবলোর হার্নেসে কেব্‌ল্ আটকে দিল মিতা। ফায়ার এস্কেপ থেকে এল একরাশ গুলি। হেলিকপ্টারের ফিউজেলাজে লেগে ফুলকি তুলল।

'জলদি!' তাড়া দিল রানা। আরেক পশলা গুলি পাঠাল সিঁড়িঘরের দিকে। মিতা ঝুলে পড়তেই নিজের হার্নেসের আঙটা চট্ করে কেব্‌ল্-এ আটকে নিল।

হৈ-হৈ করে সিঁড়িঘর ও ফায়ার এস্কেপ থেকে তেড়ে এল ল্যাং-এর গার্ডরা। গুলি করছে ককপিট লক্ষ্য করে। পাল্টা গুলি পাঠাল রানা। কিন্তু ওকে ঝুলিয়ে-দুলিয়ে সরে গেল হেলিকপ্টার, ল্যাং টাওয়ারের ছাত ছেড়ে সোজা চলল নদীর ওপর দিয়ে।

রানার মনে হলো, বহু ওপর থেকে লাফ দিয়েছে জাম্পারদের মত। ওরা যেন মস্ত ঘড়ির পেণ্ডুলাম। কেব্‌ল্-এ ঘুরতে ঘুরতে গলা ছেড়ে কাঁদছে পাবলো। মিতার দিকে তাকাল রানা। নিচে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। গুলির ভয়ে অনেক নেমে এসেছে কপ্টার। সাঁই-সাঁই করে পিছিয়ে পড়ছে নদী। ওদের গতি কমপক্ষে ঘণ্টায় এক শ' মাইল। বৃষ্টি ও তুমুল বাতাসের ভেতর আঁধার আকাশ চিরে ছুটে চলেছে। দেখতে না দেখতে এক হাজার ফুট পেছনে পড়ল ভিক্টোরিয়া হার্বারের ব্যস্ত এলাকা।

সামনে দুলতে দুলতে যাচ্ছে রানারা, পরক্ষণে হয়ে উঠছে ওজনশূন্য। আবার ধপ্ করে পড়ছে নিচে। তবে পাইলট স্পিড স্বাভাবিক করার পর কমল ঝাঁকি। হেলিকপ্টারের পেছনে লেজের মত ঝুলতে ঝুলতে চলল ওরা। মুখে-হাতে গুলির মত লাগছে বৃষ্টির ফোঁটা। মিতা ও পাবলোকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানা, তাতে একটু কমল দুলুনি।

হেলিকপ্টারের হালকা উইঞ্চ টেনে তুলতে পারবে না তিনজনকে। কাজেই ঠিক করা হয়েছে, কাউলুনের দিকে যাওয়ার পর ল্যাণ্ড করবে পাইলট। তখন দেরি না করে যে যার পথে সরে পড়বে ওরা।

শোঁ-শোঁ আওয়াজের ওপর দিয়ে চিৎকার করে জানতে

চাইল মিতা, ‘রানা, কে চালাচ্ছে হেলিকপ্টার?’

‘আমার অচেনা কেউ,’ জবাব দিল রানা।

‘এরা কারা? আবার কিডন্যাপ করবে না তো আমাদেরকে?’

‘এরা রাশান,’ বলল রানা।

‘আমার ধারণা হয়েছিল আঙ্কেল ব্রায়ান সবকিছু জানিয়েছে তোমাকে।’

‘ঠিক তা নয়।’

‘তা হলে কী?’

‘এখানে পৌঁছেই পড়েছি রাশানদের প্যাঁচে।’

‘রাশান? এরা কী চায় আবার?’

‘ওরা ছেলেটাকে ফেরত চায়। পাবলোর মা বিজ্ঞানী, তাকে ব্ল্যাকমেইল করতে ওকে কিডন্যাপ করেছে হুয়াং লি ল্যাং।’

মাথা কাত করল মিতা। মনে হলো ভুল শুনেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, ‘একদম মিথ্যা! পাবলো এতিম। ওর ওপর নানান কঠিন এক্সপেরিমেণ্ট করছে ওরা।’

খুব গম্ভীর হয়ে গেল রানা। ওরও মনে হয়েছিল, অর্ধসত্য বলছে ইগোর দিমিতভ। এ ধরনের তথ্যের জন্যে তৈরি ছিল না। ‘তুমি ঠিক জানো তো, মিতা?’

‘আমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।’

পাবলোকে একবার দেখে নিয়ে মিতার চোখে চোখ রাখল রানা।

‘আমি ওদের হাতে পাবলোকে তুলে দেব না,’ বলল মিতা।

নিচের নদী দেখল রানা, আবারও দেখল মেয়েটাকে।

‘একজনকে কথা দিয়েছি,’ বলল মিতা। ‘পাবলোকে কারও হাতে তুলে দেব না।’ জোরালো হাওয়া ও বৃষ্টির মাঝ

দিয়ে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাল ও।

ভাবছে রানা। ওরা আছে জলসমতল থেকে বড়জোর পঞ্চাশ ফুট ওপরে। পাঁচ শ' গজ দূরেই তীর।

'আমি কিন্তু ওদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম,' বোঝাতে চাইল রানা। 'এখন সেটা ভঙ্গ করা অনুচিত হবে।'

'জান থাকতে ওকে দেব না!' ছেলেটাকে আরও আঁকড়ে ধরল মিতা। 'ওকে নিয়ে যাব আমার সঙ্গে আমেরিকায়!'

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রানা, তারপর বলল, 'তো তৈরি হও।' কনুইয়ের ভাঁজে পাবলোকে রেখে চট্ করে মিতার স্টিলের কেব্‌ল্ খুলে দিল ও। মেয়েটা আলুর বস্তার মত নিচে রওনা হতেই পাবলো আর ওর নিজের কেব্‌ল্ খুলল রানা। মিতাকে পেছনে ফেলে অন্ধকার নদীতে পড়ছে ওরা।

পাথরের মত পড়তে পড়তে রানার মনে হলো: 'ওই রাশান ব্যাটা সহজে ছাড়বে না! ঝামেলা হওয়ার আগেই মিতা আর পাবলোকে পৌঁছে দিতে হবে আমেরিকায়! কাজেই গোপনে বেরিয়ে যেতে হবে এই দেশ ছেড়ে!

নতুন কিছু ভাবতে পারল না রানা, অনেক ওপর থেকে ঝপাস্ করে নামল নদীতে। পরক্ষণে একহাতে পাবলোকে জাপ্টে রেখে তলিয়ে গেল পানির ত্রিশ ফুট নিচে!

ষোলো

তাঁর সর্বনাশ করতেই এসেছেন সিআইএ চিফ মার্ল ক্যালাগু, ভাবলেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান। ওই লোকের সঙ্গে

এসেছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট। এবার চেপে ধরা হবে তাঁকে: কার অনুমতি নিয়ে হংকং থেকে সরানো হয়েছে মিতা দত্তকে?

ভার্জিনিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের পঞ্চম ভবনে নিজ অফিসে প্রেসিডেন্ট ও সিআইএ চিফকে আপ্যায়ন করছেন ব্রায়ান। চট্ করে একবার দেখলেন সিনিয়র বন্ধুর চোখ। কী যেন ভাবছেন তিনি, অস্বাভাবিক গম্ভীর। মনে হচ্ছে, কী যেন দায়িত্ব দিয়েছেন সিআইএ চিফ ক্যালাগুর ওপর। এ কারণেই খুব চিন্তিত ব্রায়ান।

এদিকে কেমন যেন হতোদ্যম মনে হচ্ছে কমাণ্ডার ইন চিফকে, ভাবলেন ক্যালাগু।

'আসল কথা, আমরা যখন শুনলাম আপনি আমেরিকার শত্রুর সাহায্য নিয়েছেন, অবাক না হয়ে পারিনি,' নতুন উদ্যমে বললেন সিআইএ চিফ। 'আমরা আশা করেছিলাম, সহযোগী এবং অনেক দক্ষ কোনও এজেন্সির সহায়তা চাইবেন আপনি।'

ফাঁদের হুক বুঝতে পারছেন ব্রায়ান। মাসুদ রানার অফিসে গিয়ে সাহায্য চেয়েছেন, এটা যদি প্রেসিডেন্টের কাছে অস্বীকার করেন, দেরি না করে প্রমাণ দেখাবেন ক্যালাগু। আবার যদি স্বীকার করেন কী করেছেন, তা হলেও বলা হবে বোকার মত ঝুঁকি নিয়েছেন তিনি।

আপাতত কিছুই করার নেই বুঝে আত্মরক্ষা করতে চাইলেন ব্রায়ান, নরম সুরে বললেন, 'এনআরআই অফিসকে ব্যবহার করে কিছুই করিনি।'

'তার মানেটা কী?' ঘেউ করে উঠলেন ক্যালাগু।

'ওই অপারেশনে ব্যবহার করা হয়নি এনআরআই ফাণ্ড,' বললেন ব্রায়ান।

'তো টাকা এল কোথা থেকে?' জানতে চাইলেন ক্যালাগু।

'এনআরআই ফাণ্ড থেকে আমার প্রাপ্য সব টাকা তুলে নিয়ে ট্র্যান্সফার করেছি মাসুদ রানার অ্যাকাউন্টে।'

চট্ করে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন ক্যালাগু। আশা করছেন, এবার কঠিন একখানা গযল ঝাড়বেন তিনি। কিন্তু প্রেসিডেন্টকে চুপ দেখে বাধ্য হয়েই আবার তাকালেন ব্রায়ানের দিকে। 'আপনি কি পাগল হয়েছেন, ব্রায়ান? আপনার তো বোঝার কথা, চাইলেও সাধারণ নাগরিকের মত যা খুশি তাই করতে পারেন না। আপনি গুরুত্বপূর্ণ একটা অফিস চালান। আপনার জানার কথা, কতবড় ঝুঁকির ভেতর ফেলেছেন আমাদেরকে। তা ছাড়া...'

'রস পেরো যদি নিজের লোককে শত্রুদেশ থেকে তুলে আনতে পারেন, এবং সেজন্যে হিরো হয়ে যান, তো আমি কেন আমার প্রিয় কাউকে ফিরিয়ে আনতে পারব না? আইনের বাইরে গিয়ে অন্য দেশের কোনও নাগরিক আমার দেশের নাগরিককে তুলে নিয়ে গেলে আমি বসে থাকব?'

বিস্ফোরিত হলেন ক্যালাগু, 'স্রেফ পাগল হয়ে গেছেন, ব্রায়ান! আপনি যদি আমার চাকরি করতেন, পেছনে লাথি দিয়ে চাকরি থেকে বের করে দিতাম, বা গ্রেফতার করাতাম।'

চুপ করে নিজের সিটে বসে আছেন ব্রায়ান। নিজের আসল ইচ্ছে জানিয়ে ফেলেছেন ক্যালাগু। খুব নরম সুরে বললেন এনআরআই চিফ, 'ও, তা হলে এটাই আপনার মনের খায়েশ? যেভাবে হোক এনআরআইকে পায়ের নিচে দলবেন? অর্থাৎ আপনার চাই আরও ক্ষমতা? যা খুশি করবে সিআইএ?'

'যথেষ্ট কারণ আছে বলেই আমার সংগঠনকে বলা হয় সেণ্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন ক্যালাগু।

'আপনারা একদল খুনি ছাড়া আর কিছুই নন,' বললেন ব্রায়ান। 'ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধি আবার কোথায় পেলেন?'

সান লোশন ছাড়াই যেন বসে আছেন সাহারা মরুভূমির মাঝে, রাগে লাল হয়ে গেল ক্যালাগুর চেহারা। ধমকে ওঠার আগেই এক হাত ওপরে তুললেন প্রেসিডেন্ট। 'ধরে নিন বক্সিঙের এই রাউণ্ড শেষ। আপনার কথায় পয়েন্ট আছে, ক্যালাগু। কিন্তু ব্রায়ান যা বলেছেন বা করেছেন, তাতে আমেরিকার বেশিরভাগ মানুষ খুশি হবে; আদালতে গেলেও বাহবা পাবেন ব্রায়ান।'

চুপ করে কথাটা শুনলেন ব্রায়ান। বুঝে গেলেন, এখনও তাঁর পক্ষেই আছেন প্রেসিডেন্ট।

'তা ছাড়া, মৌখিকভাবে নির্দেশ দেয়ার পর কাজে নামেন ব্রায়ান।'

হতভম্ব হয়ে গেলেন ক্যালাগু। 'মৌখিক নির্দেশ?' ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। 'দয়া করে খুলে বলবেন, স্যর?'

'সহজ কথা,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'চেয়েছি পরবর্তী সময়ে আদালত যেন আমাকে দায়ী না করে। আবার এ-ও চাইনি, আমার দেশের মানুষকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে অন্য দেশের লোক, অথচ কিছুই করতে পারব না। কাজেই মিতা দত্তকে চিন থেকে তুলে আনার দায়িত্ব চেপে বসে ব্রায়ানের ওপর।' একবার এনআরআই চিফকে দেখলেন তিনি, তারপর বললেন, 'হুয়াং লি ল্যাং-এর কপাল ভাল, সে আছে চিনে। ওই দেশকে ঘাঁটাতে চাই না। কিন্তু মাসুদ রানা যখন ঝুঁকি নিয়ে মেয়েটাকে সরিয়ে আনতে রাজি হলেন, খুবই খুশি হয়েছি।'

মুচকি হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'খারাপ কিছু হলে ভুলে যেতাম, এসবের সঙ্গে আমি জড়িত। আর আপনিও কিছুই টের পেতেন না, ক্যালাগু।'

বিমর্ষ হয়ে গেছেন সিআইএ চিফ।

চুপ করে আছেন ব্রায়ান। বাস্তবে তাঁকে কোনও মৌখিক

নির্দেশ দেননি প্রেসিডেন্ট। কাজেই বুঝতে পারছেন, তাঁকে রক্ষা করছেন তিনি। ঋণী ও কৃতজ্ঞ হয়ে গেলেন ব্রায়ান।

'কথা তো শেষ, নাকি?' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এবার আলাপ হোক... যে কাজে এসেছি।'

চুপ করে অপেক্ষা করছেন ব্রায়ান।

'গতকাল আপত্তিকর কিছু তথ্য পেয়েছেন ক্যালাগু,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'সিআইএ গুজব শুনেছে এনআরআই সম্পর্কে। এখানে, কমপ্লেক্স-এ নাকি তৈরি করা হয়েছে এক্সপেরিমেন্টাল ফিউশন রিঅ্যাক্টর। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ বেআইনী। এ ধরনের কিছু ঘটে থাকলে, রাজধানীর সাধারণ মানুষ ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

ব্রায়ান ভাবলেন, সিআইএর গুজব ভুল, কিন্তু ওই কাহিনির মাঝে যে একতিল সত্যি নেই, তা নয়। প্রথম দিনই প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে কাজে নেমেছেন তিনি। ইচ্ছে করলে যে-কোনও সময়ে ওই তথ্য ক্যালাগু বা অন্য কাউকে দিতে পারতেন প্রেসিডেন্ট। এজন্যে ভার্জিনিয়ার এনআরআই অফিস ভিযিট করা প্রয়োজন ছিল না তাঁর।

অর্থাৎ, অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে তাঁর।

ব্রায়ান আন্দাজ করলেন, প্রেসিডেন্ট চাইছেন এবার খুলে বলা হোক সব।

অনেক দিন ধরেই এমনসময় আসবে ভেবে আতঙ্কে ছিলেন ব্রায়ান। এবার হয়তো বন্ধ হবে সব। প্রেসিডেন্ট হয়তো চাইছেন সিআইএকে জানাতে, যাতে তারাও জড়াতে পারে এনআরআই-এর পঞ্চম ভবনের নিচতলার প্রোগ্রাম-এ। নিজ চোখে দেখবেন তিনি। বুঝে নেবেন জিনিসটা আসলে কী।

'তার মানে নিজের চোখে আপনারা ওই প্রোগ্রাম দেখতে চান,' বললেন ব্রায়ান।

মৃদু নড করলেন প্রেসিডেন্ট।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ব্রায়ান। 'আপনি অনুমতি দিলে, চলুন, যাওয়া যাক।'

ব্রায়ানের পেছনে চললেন প্রেসিডেন্ট ও দ্বিধান্বিত সিআইএ চিফ। সবাইকে ঘিরে এগোল প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি ডিটেইল। কিন্তু সিকিয়োর এক এলিভেটরের সামনে থামলেন এনআরআই চিফ, তাকালেন সিনিয়র বন্ধুর দিকে।

হাত তুলে দলের অন্যদেরকে নিষেধ করলেন প্রেসিডেন্ট। 'এখানেই অপেক্ষা করো। আমাদের সময় লাগবে।'

ব্রায়ান কোড দেয়ার পর খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। তাঁরা তিনজন উঠে পড়ার পর পেছনে রয়ে গেল সিকিউরিটির লোকগুলো। একবার ভাবলেন এনআরআই চিফ, বলবেন নাকি: না-ই-বা গেলেন ওই প্রোগ্রাম দেখতে, স্যর! কিন্তু গম্ভীর চেহারায় দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। এখন আর ওই বিষয়ে আলাপ করার উপায় নেই। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চাইছেন সিআইএ জড়িয়ে যাক এনআরআই-এর এই প্রোগ্রামে। আর কোনও কথা চলে না।

এক মিনিট পেরোবার আগেই তাঁরা নেমে এলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ল্যাবোরেটরিতে। এয়ার ফিল্টারেশনের জন্যে মৃদু গুনগুন আওয়াজ ছাড়া চারপাশ নীরব। প্রকাণ্ড ঘরের দেয়াল ও ছাতে জ্বলছে নরম বিশেষ নীলচে লেড বাতি।

চুপচাপ বসে কমপিউটারের মনিটরে রিডআউট দেখছে এনআরআই-এর দুই টেকনিশিয়ান। এনআরআই চিফ, সিআইএ চিফ এবং স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে দেখে উঠে দাঁড়াল তারা।

'নিজের কাজ করুন,' বললেন প্রেসিডেণ্ট।

দুই অতিথিকে কাঁচের একটা প্যান-এর সামনে নিয়ে গেলেন ব্রায়ান। দুই ইঞ্চি পুরু কাঁচ আসলে কেভলার, রাইফেলের বুলেট লাগলেও কিছুই হবে না। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাঁকা, সহজেই যেন দেখা যায় ভেতরের জিনিস।

পাঁচ ফুট নিচে বৃত্তাকার জ্বলন্ত লেড বাতির মাঝে মুকুটের মত বসে আছে ত্রিকোণ এক স্ফটিক। খুব সুন্দর করে পলিশ করা। নীলচে আলোয় ঝিকঝিক করছে হীরার মত।

'কোনও পরিবর্তন?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান।

টেকনিশিয়ানদের একজন বলল, 'না, স্যর। গত মাসের বাইশ তারিখ থেকে আর কিছুই ঘটেনি।'

কোহিনূর হীরার মত ঝলমলে স্ফটিক মনোযোগ দিয়ে দেখছেন সিআইএ চিফ মার্ল ক্যালাগু।

আগেও বহুবার দেখেছেন, তবুও ওই জিনিসের দিকে না চেয়ে পারলেন না ব্রায়ান।

আগে মাত্র দু'বার ওই স্ফটিক দেখেছেন প্রেসিডেণ্ট। অবশ্য, অতীতের কৌতূহল এখন নেই, এবার দেখছেন অস্বস্তি নিয়ে। চান না ওটার কারণে মস্ত কোনও ক্ষতি হোক মানুষের।

'ওটা আসলে কী?' জানতে চাইলেন ক্যালাগু।

'আমরা ওটার নাম দিয়েছি: ব্রাযিল স্টোন,' বললেন ব্রায়ান। 'আমাযন থেকে উদ্ধার করে এ দেশে আনা হয়েছে এক বছর আগে।' প্রেসিডেণ্টের দিকে মাথা কাত করলেন তিনি। 'দেরি না করে জানানো হয়েছে প্রেসিডেণ্ট এবং কংগ্রেসের বড় মাপের কয়েক নেতাকে।'

দু'জনের চেহারা ও মনোভাব ভালভাবে বুঝতে একটু সরে দাঁড়ালেন ব্রায়ান।

'ওই জিনিস কী করে?' জানতে চাইলেন ক্যালাগু।

‘শক্তি উৎপাদন করে,’ বললেন ব্রায়ান, ‘কীভাবে কী হচ্ছে তা আমরা এখনও জানি না।’

‘এখানে রেখেছেন কেন?’ জানতে চাইলেন ক্যালাগু। ‘ওটা কি রেডিয়োঅ্যাকটিভ বা ওই ধরনের কিছু?’

‘না, তেমন নয়,’ বললেন ব্রায়ান, ‘তবুও এই ভল্ট এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন হলেও ক্ষতি হবে না মানুষের।’ চারপাশের দেয়াল দেখালেন তিনি। ‘আমরা আছি মাটির পঞ্চাশ ফুট নিচে। এই ভল্ট বাক্সের মত, টাইটানিয়ামের তৈরি। বাইরে ষোলো ইঞ্চি সীসার দেয়াল। তার বাইরে আছে চার-পাঁচ ইঞ্চি সিরামিক সিলিকন। সব আবার ঘিরে রেখেছে একফুট চওড়া স্টিল-রিএনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রিট। এ ছাড়া, ব্যবহার করা হচ্ছে শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ড্যামপেনিং ফিল্ড।’

‘আসলে আমাদেরকে কী থেকে বাঁচাতে চাইছেন, ব্রায়ান?’ জানতে চাইলেন ক্যালাগু।

‘ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ডিসচার্জ। বিচ্ছুরণ হচ্ছে গামা ও এক্স-রে। হাই-এনার্জি। ছিটকে বেরোলে বারোটা বাজিয়ে দেবে ইলেক্ট্রনিক ইকুইপমেন্টের। ক্ষতি হতে পারে মানব দেহের টিশুর।’

চারপাশ দেখলেন ক্যালাগু। ‘দেখে তো মনে হচ্ছে সবই ঠিকঠাক চলছে।’

‘সতেরো ঘণ্টা চৌত্রিশ মিনিট পর পর নিয়মিতভাবে বিচ্ছুরণ হচ্ছে। সে সময়ে সব সিস্টেম বা ইকুইপমেণ্ট বন্ধ রাখা হয়। ওই সময় পেরোলে নতুন করে আবারও চালু করা হয় সব। এসব যথেষ্ট সহজভাবেই করতে পারি আমরা। কিন্তু নভেম্বরের বাইশ তারিখে অন্য কিছু হলো।’

‘নভেম্বরের বাইশ তারিখ,’ আউড়ালেন ক্যালাগু। ‘কী যেন মনে পড়তে গিয়েও পড়ছে না।’

'ওই দিন সার্চ পার্টি নিয়ে বেরিয়েছিল রাশান ও চিনারা,' বললেন ব্রায়ান। 'সেদিন গামা-রে বিচ্ছুরণ হয়েছিল বেরিং সি-র আর্কটিক সার্কেলে। কাজ থামিয়ে দিয়েছিল আমাদের চারটে জিপিএস স্যাটেলাইটের।'

চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ক্যালাগু, হঠাৎ গভীর পানিতে পড়ে বুঝতে চাইছেন, কীভাবে উঠবেন তীরে। কিছুই তো বুঝছেন না তিনি! একইসময়ে রাগ, কৌতূহল, দ্বিধা এল তাঁর মনে।

তাঁকে রক্ষা করলেন প্রেসিডেন্ট। 'ব্রায়ান, ওই একই দিনে হংকং থেকে মিতা দত্তকে তুলে আনার বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল। আলাপ হয় রাশান ও চিনাদের বিষয়ে। সার্চ পার্টি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাদের নেভি। অন্যরা না জানলেও এনআরআই পেয়েছিল একটা তথ্য: এনার্জির বিচ্ছুরণ হয়েছে ওই দুই দেশের তৈরি কোনও এনার্জি ওয়েপন থেকে। দুই দেশের কোনওটা সম্ভবত হারিয়ে বসে তাদের অস্ত্র।'

'তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই জিনিসের?' রাগ নিয়ে ব্রায়ানের দিকে তাকালেন ক্যালাগু।

'আমি তা বলছি না,' বললেন ব্রায়ান। 'কিন্তু ওই বিচ্ছুরণের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে এই জিনিসের।'

জ্বলজ্বলে স্ফটিকের দিকে তাকালেন ক্যালাগু। সন্দেহ নিয়ে দেখলেন প্রেসিডেন্ট ও ব্রায়ানকে। বুঝতে চাইছেন, সত্যি কথা বলা হয়েছে কি না। 'আপনারা ওটা নিয়ে কোনও এক্সপেরিমেন্ট করছেন?'

'না, তা করছি না,' বললেন ব্রায়ান, 'ওই স্ফটিক আমরা তৈরি করিনি। খুঁজে পেয়েছি। এখন স্টাডি করছি। এখনও জানি না এ থেকে নতুন কী বেরোবে।'

'কী জানতে পারবেন ভাবছেন?'

'আগেই বলেছি, এটা এমন কোনও উপায়ে শক্তি তৈরি

করছে, যেটা আমরা বুঝি না। ভেঙে দিয়েছে ফিযিক্সের প্রথম সূত্র।'

'আমি এনআরআই-এর বিজ্ঞানী নই, ব্রায়ান। তবে উজবুকও নই। সব সহজ করে বুঝিয়ে বলুন।'

এ ধরনের ঝামেলায় পড়বেন বলেই সিআইএকে এসবে জড়ানো হোক, তা চাননি ব্রায়ান। এনআরআই প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞান সংস্থা, এর একটা কাজ অন্য দেশের আবিষ্কার হাতিয়ে আনা। এদিকে সিআইএর কাজ ক্ষমতা বদল করা এবং রাজনৈতিক জ্ঞান সংগ্রহ করা। এরা হুমকি দেয়: তোমরা এটা করলে, আমরা ওটা করব। চাইলেও সিআইএ বা ক্যালাগুকে সহজে কিছু বোঝাতে পারবেন না ব্রায়ান। তবুও চেষ্টা করতে হবে। নরম সুরে বললেন তিনি, 'ফিযিক্সের প্রথম সূত্রের কথা ভাবুন। আমরা কিছুই তৈরি করি না বা নষ্ট করতে পারি না। ধরুন, আপনি চালু করলেন আপনার গাড়ি। তাতে পুড়তে লাগল তেল। ওটা জ্বলছে বলে তৈরি হলো তাপ। ওই তাপ আবার সৃষ্টি করল প্রসারিত গ্যাস। ওই গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে বলেই নড়তে লাগল পিস্টন। এত শক্তি এসেছে পেট্রোলিয়াম থেকে। ওই কেমিকেল ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। কী থেকে হয়েছে? লাখে লাখে মৃত ডাইনোসরের দেহ থেকে। নইলে পেতেন না ক্রুড অয়েল।'

ক্যালাগু বুঝলেন কি না, তা জানতে গিয়ে থেমে গেলেন ব্রায়ান। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন বলে বিচ্ছুরণ হচ্ছে এনার্জির। নিজে কিছুই তৈরি করছেন না। ওই একই কাজ করে নিউক্লিয়ার প্লান্ট, অবশ্য সেটা করে অন্য উপায়ে, ভাঙতে থাকে অ্যাটম। ওটা পেট্রোলিয়ামের কেমিকেলের বন্ধনের মতই। বেরিয়ে আসে জমে থাকা প্রচণ্ড নিউক্লিয়ার শক্তি বা এনার্জি। এই দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আগে

থেকেই ছিল শক্তি, আমরা শুধু জেনে নিয়েছি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে।'

স্ফটিকের দিকে আঙুল তুললেন ব্রায়ান। 'কিন্তু ওই পাথর একেবারেই অন্যরকম। আমাদের জানা কোনও উপায়ে ওটা তৈরি করছে না শক্তি। কখনও কখনও ওটা থেকে বেরোচ্ছে বিপুল পরিমাণের এনার্জি। আমরা শুধু আঁচ করছি, যেভাবেই হোক কোয়ান্টাম কোনও কারণে শক্তি তৈরি করছে ওটা, বা অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসছে শক্তি।'

ব্রায়ান থেমে যাওয়ার পর কেমন অসহায় চোখে তাঁকে দেখলেন ক্যালাগু। 'ও, বুঝলাম। শক্তি তৈরি করে। এমন এক পাথর, যেটা এনার্জি দিচ্ছে। খুবই ভাল, তো ব্যবহার করুন গ্রিড-এ, কয়লার প্লান্ট বাতিল করে বন্ধ করুন গ্লোবাল ওঅর্মিং। ...কিন্তু আমি এসব জানতে চাইনি। জানতে চাইছি, কী কারণে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই পাথর। সাধারণ কেউ ওটার ব্যাপারে কিছু জানল না কেন? বা কী কারণে এখন জানাচ্ছেন আমাদেরকে?'

প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন ব্রায়ান।

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। সময় হয়েছে সব খুলে বলার।

'প্রাকৃতিক কোনও পদার্থ নয় এই স্ফটিক,' বললেন ব্রায়ান। 'নিরেট পাথর নয়। এক ধরনের মেশিন। অতীতে কখনও তৈরি করেছে মানুষ।'

নাকের কাছে কালাকুত্তার গু দেখেছেন এমন ভঙ্গিতে নাক বাঁকা করে ফেললেন ক্যালাগু। 'বলতে চাইছেন হাজার হাজার বছর আগে তৈরি করেছে মানুষ ওই জিনিস?'

'প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন যেসব মায়ান গ্লিফ পান, ওগুলো থেকে তা-ই জেনেছেন,' বললেন ব্রায়ান। 'মাত্র সামান্য কিছু বোঝা গেছে, অনেক কিছুই আমরা জানতে পারিনি। আসলে

অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি বললেও ভুল হবে না।'

বিরক্ত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন ক্যালাগু।

ব্যাখ্যার দায়িত্ব নিলেন প্রেসিডেন্ট। 'এনআরআই ভাবছে, ওই পাথর বা স্ফটিক তৈরি করা হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে। ওটা তৈরি করেছিল অন্য কোনও সভ্যতা। হয়তো আমাদের সভ্যতার চেয়েও অনেক আধুনিক ছিল তারা।'

প্রেসিডেন্টের দিকে না চেয়ে ব্রায়ানকে বললেন ক্যালাগু, 'তা হলে এই জিনিস মানুষের স্বাভাবিক জীবনে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে?'

'পারে,' বললেন ব্রায়ান, 'ডক্টর হ্যারিসন ব্রাযিলে পাওয়া হায়ারোগ্লিফ পড়ে যে ডেটা পেয়েছেন, তাতে পৃথিবীতে আছে এমন আরও তিনটে স্ফটিক বা পাথর।'

'আরও তিনটে?'

'হ্যাঁ। দুটো মধ্য আমেরিকায়। একটা ইউরোশিয়ান প্লেইন-এ। সম্ভবত মধ্য রাশায়।'

'আমরা কি এ কথা রাশাকে জানিয়েছি?' প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন ক্যালাগু।

মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট।

'আচ্ছা,' বললেন ক্যালাগু। 'এই পাথরের মত কিছু কী খুঁজছে এফএসবি?'

'জানি না,' বললেন ব্রায়ান, 'ওই পাথর খুঁজতে গিয়ে ওদেরকে সতর্ক করতে চাইনি আমরা।'

'গুড,' খুশি হলেন ক্যালাগু। কিন্তু পরক্ষণে আবারও হামলে পড়লেন, 'ধরে নিন আপনার কথা বিশ্বাস করলাম, কিন্তু তাতে এ পাথরের ব্যাপারে জরুরি কিছুই তো জানা গেল না। সেক্ষেত্রে কী বুঝব?'

'আমরা ঠিক জানি না, তবে একটা ব্যাপার আন্দাজ

করছি, হাজার হাজার বছর আগের ওই পরিবেশ এখনকার মত সহজ ছিল না। তখন অনেক বেশি পরিমাণে ছিল রেডিয়োঅ্যাকটিভ পদার্থ, আকাশ থেকে পড়ত অ্যাসিড বৃষ্টি। তার সঙ্গে থাকত কার্বন ও সালফার।'

'তো এই পাথর এমন কিছু করেছে, যে কারণে হ্রাস পেয়েছে ওসব ক্ষতিকর পদার্থ?'

'এটা অযৌক্তিক নয়,' বললেন ব্রায়ান।

'এই পাথর এত গুরুত্বপূর্ণ হলে, আজ হঠাৎ কী মনে করে সব খুলে বলছেন?'

প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন ব্রায়ান।

'কারণ, আমি চাই এনআরআই এবং সিআইএ মিলেমিশে এ বিষয়ে কাজ করুক,' বললেন প্রেসিডেন্ট, 'আপনারা কাজে লাগাবেন আপনাদের সেরা লোকজন।'

'এর ভেতরে সিআইএকে জড়িয়ে নেয়া কেন, স্যর?' জানতে চাইলেন ক্যালাগু।

জবাবটা এবার দিলেন ব্রায়ান, 'কারণ স্ফটিক তৈরি করছে স্রোতের মত বিপুল এনার্জি। আমরা এখনও জানি না, ওই ভয়ঙ্কর শক্তি কী করবে। কমপিউটার সঠিক হলে ওটা চরম পর্যায়ে যাবে এবছরই ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে।'

সতেরো

মালবাহী পুরনো জাহাজের ডেক থেকে হংকং শহর পিছিয়ে পড়তে দেখছে মিতা দত্ত। পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে

পাবলো। একটু দূরে রানা, হাতে স্যাটেলাইট ফোন।

ক্যাপ্টেনকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়ে নিজেদের জন্যে কেবিনের ব্যবস্থা করেছে রানা। ভোর হতে না হতেই রওনা হয়েছে এই জাহাজ। ছোট সব ইঞ্জিনের পার্ট্স্ দিয়ে ভরা পেট। দক্ষিণ-পুবে গিয়ে সব উগরে দেবে ম্যানিলা বন্দরে।

আরও হাজার মাইল দূরে মিতার বাড়ি। কিন্তু ঠিক করেছে, আপাতত ফিরবে না ইউনাইটেড স্টেট্স্ অভ আমেরিকায়।

রানার সঙ্গে কথা হয়েছে ওর।

প্রায় রাজিও হয়েছে রানা।

প্রথম সুযোগেই মিতা চলেছে দক্ষিণ আমেরিকায়।

'হংকং ছেড়ে আমরা বেরিয়ে এসেছি,' ওদিক থেকে ফোন কল রিসিভ হতেই জানাল রানা।

'ল্যাং-এর টাওয়ারে বিস্ফোরণ হওয়ায় দুশ্চিন্তায় ছিলাম,' বললেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান। 'চিনের প্রতিটি টিভি চ্যানেলে এসেছে ওই নিউয। মারা গেছে কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ড, তাদের হাতে খতম হয়েছে একদল টেরোরিস্ট। আপনি মিতাকে নিয়ে ডুব দিলে, মনে হচ্ছিল খুব খারাপ কিছু হয়েছে।'

'সত্যিই ডুব দিতে হয়েছে নদীর মাঝে,' বলল রানা। ওর মনে পড়ল হাঁটু কেটে ফেলা লোকটার কথা। 'মারা গেছে দু'একজন। কিন্তু তারা টেরোরিস্ট ছিল না। মিতা এখন চাইছে দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে প্রফেসর জর্জ হ্যারিসনকে খুঁজে বের করতে।'

'আপনি কি ওর পাশে থাকবেন?' অনুরোধের সুরে জানতে চাইলেন ব্রায়ান।

'ওকে বলেছি, ভেবে দেখব।'

'খুব ভাল হয় ওকে একা ছেড়ে না দিলে,' বললেন

ব্রায়ান।

'অফিস থেকে জরুরি কোনও কাজ না এলে থাকছি ওর পাশে।'

'মিতা কিডন্যাপ হওয়ার পর যোগাযোগ করেছিলেন জর্জ হ্যারিসন,' বললেন ব্রায়ান। 'বলেছিলেন, তিনি আহত। তবে গুরুতর কিছু নয়। তারপর থেকে কোনও খবর নেই। বিশাল দেশ মেক্সিকো। লোক পাঠিয়েও তাঁর কোনও খোঁজ পাইনি।'

'মিতার কাছে শুনেছি, সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই প্রাণের ভয়ে পালাবেন প্রফেসর,' বলল রানা। 'ল্যাং-এর লোক তাঁকে ধরে নিয়ে যায়নি তো?'

'মনে হয় না,' বললেন ব্রায়ান, 'আমাদের ডেটা অনুযায়ী পুরো ইউক্যাটান জুড়ে তল্লাসী করছে বিলিয়নেয়ারের লোক। এমন কোনও তথ্য পাইনি যে ধরা পড়েছেন প্রফেসর। বুদ্ধি খাটিয়ে লুকিয়ে পড়েছেন উনি। এখন তাঁকে খুঁজে বের করা জরুরি। আপনার বা মিতার কথা শুনবেন তিনি।'

প্রফেসরের কথা মনে আছে রানার। সৎ মানুষ। তবে একবার মগজে কিছু ঢুকলে সেটা বেরোয় না। কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছেন। তবে নিজের কাজ শেষ না করে কোনওভাবেই ফিরবেন না দেশে।

'এখন আপনার সঙ্গেই আছে মিতা?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান।

একটু দূরেই পাবলোর কাঁধে হাত রেখে তীরের দিকে চেয়ে আছে মিতা। কেউ দেখছে টের পেয়ে ঘুরে তাকাল। চোখে রানার প্রতি শ্রদ্ধা, সেই সঙ্গে আরও কী যেন অচেনা কিছু।

রানা ঠিক বুঝল না, তবে ওর মন বলল, মস্তবড় কিছু হারিয়ে বসেছে মেয়েটা, তাই এত কষ্ট ওর চোখে।

'হ্যাঁ, কাছেই আছে, কথা বলবেন?' বলল রানা।

‘আশপাশের পরিস্থিতি কেমন বুঝছেন?’

‘কর্তৃপক্ষ বা শত্রুপক্ষ টের পায়নি আমরা ছেড়ে এসেছি হংকং। তবে অন্য ঝামেলা হয়েছে।’

‘একটু খুলে বলুন। দেখি দূর করতে পারি কি না।’

‘সমস্যার নাম ইগোর দিমিতভ। একজন রাশান। নামটা আগে শুনেছেন?’

‘ইগোর দিমিতভ?’ বললেন ব্রায়ান, ‘পড়েছি ওর ফাইল। এফএসবির প্রডেজি। তরুণ বয়সেই নাম করে। তারপর অবসর নিলেও তাকে প্রয়োজনে ডাকতে থাকে ওরা। এতদিনে যত টাকা রোজগার করেছে, ওর তো অবসর নেয়ার কথা। আপনাদের এসবের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?’

‘অবসর নেয়নি,’ বলল রানা। ‘আপনার কণ্ট্যাক্টকে ঘুষ দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে গেছিল।’

‘তারপর?’ বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন ব্রায়ান।

‘রাশান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু চুরি করে ল্যাং, ওটা ফেরত নেয়ার চেষ্টা করছে।’

‘জিনিসটা কী?’

‘জিনিস নয়, এক ছেলে। বয়স পাঁচ বছর। নাম পাবলো।’

‘ওকে নিয়ে কী করবে?’

ইগোর দিমিতভের কাছ থেকে যা শুনেছে রানা, সংক্ষেপে বলল। এবার জানাল, ‘ছেলেটা অনেকটা অটিস্টিক টাইপের। তবে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বোধহয় কাজ করে এনার্জি ফিল্ড, ইলেকট্রিসিটি ও ম্যাগনেটিযমের বিষয়ে।’

‘তাই?’ বললেন ব্রায়ান, ‘সেক্ষেত্রে ব্রাযিলে আপনাদের আবিষ্কার করা ওই স্ফটিকের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে।’

‘ছেলেটার ওপর চোখ পড়েছে ল্যাং-এর। ইলেকট্রো-

ম্যাগনেটিক বিষয়ে হয়তো ওর ওপর এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইছে।'

'তাই?' বললেন ব্রায়ান, 'অনেক দিন ধরেই সাইকিক বা অলোকদৃষ্টির ব্যাপারে পরীক্ষা চালাচ্ছে রাশানরা। অবাক হচ্ছি না, ওই ছেলের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেছে ওরা। আজ পর্যন্ত কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু ইগোর দিমিতভ যেহেতু এসবে জড়িত, ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিতে হবে।'

'সব কথা না জানিয়ে আমার সঙ্গে চুক্তি করেছিল ইগোর দিমিতভ, কাজেই ওই চুক্তি ভেঙেছি,' বলল রানা। 'আমার ভুল না হয়ে থাকলে, উন্মাদের মত আমাদেরকে খুঁজছে ও এখন।'

'মিস্টার রানা, খুব গর্বিত লোক সে,' বললেন ব্রায়ান। 'এফএসবি মানা করে দিলেও ধরে নিন, জান থাকতে আপনার পিছু ছাড়বে না সে।'

চুপ করে আছে রানা।

'আমি চেষ্টা করব ওকে অন্য পথে সরিয়ে দিতে,' জানালেন ব্রায়ান। 'ফলে বাড়তি সময় পাবেন।' একটু চুপ করে থেকে তারপর বললেন তিনি, 'এবার কী করবেন, মিস্টার রানা?'

'কয়েক দিনের ভেতর পৌঁছুব ম্যানিলা।'

'গুড। আপনাদের আবিষ্কৃত ব্রাযিল স্টোন নিয়ে আমিও আছি বিপদে,' বললেন ব্রায়ান, 'প্রেসিডেন্ট চাইছেন, আমরা যেন সিআইএর সঙ্গে মিলে গবেষণা করি।'

'তাই করুন,' বলল রানা। 'অসুবিধে কী?'

'ওরা ওয়াশিংটনে আমাদের কমপ্লেক্স থেকে ওটাকে সরাতে চাইছে নেভাডায়,' বললেন ব্রায়ান। 'আপনাকে আমার এসব বলার কথা নয়। বলছি, কারণ আপনিই

আবিষ্কার করেছিলেন ওটা। ইয়াকা মাউন্টেনে একটা ল্যাবোরেটরিতে রাখা হবে ওটা। ওখানেই ফেলার কথা ছিল সব নিউক্লিয়ার বর্জ্য।'

রানা জানতে চাইল, 'এখনও এনার্জি বেরোচ্ছে ওই স্ফটিক থেকে?'

'বিপদ হতে পারে আমাদের কণ্টেইনমেন্ট এরিয়ায়, তাই ভয় পেয়েছেন সিআইএ চিফ— যখন-তখন বিস্ফোরিত হবে ব্রাযিল স্টোন বা ওটার কারণে অন্যকিছু। সুপার কমপিউটার থেকে জানা গেছে, ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে প্রচণ্ড শক্তি বিচ্ছুরণ করবে ওটা। জর্জ হ্যারিসন বলেছিলেন, ওটার মত আরও তিনটে স্ফটিক আছে কোথাও। জরুরি কোনও কাজ করে ওগুলো।'

'কবে আপনাদের স্ফটিক সরিয়ে নেবেন?' জানতে চাইল রানা।

'এই সপ্তাহের শেষ দিকে। এর ভেতর যদি বুঝতে না পারি আসলে কী ওটা, হয়তো ধ্বংস করে দিতে হবে। আমাদের ওপর চাপ তৈরি করছে সিআইএ চিফ মার্ল ক্যালাগু।'

সিআইএ চিফ চাপ সৃষ্টি করছে শুনে রানা ভাবল, ওই হারামি লোক অন্যের ক্ষতি করতে পারলে খুব খুশি হয়।

'ক্যালাগু হয়তো এনআরআই-এর কাছ থেকে আদায় করে নেবে স্ফটিক, ওটা ধ্বংস না করে ব্যবহার করবে অস্ত্র তৈরিতে,' বললেন ব্রায়ান, 'তাতে খুব খুশি হবে আমেরিকান আর্মি। আবার অন্য কিছুও করতে পারে। একবছর ধরে আরও বাড়ছে ব্রাযিল স্টোনের শক্তি। কে জানে, সত্যিই হয়তো ওটা ভয়ঙ্কর কোনও অস্ত্রই!'

'হয়তো গ্লিফ পড়ে এ বিষয়ে আরও অনেক কিছুই জানাতে পারবেন প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন,' বলল রানা।

'আগে দরকার তাঁকে খুঁজে বের করা।'

'কিন্তু আমাদের জানা নেই, কোথায় আছেন তিনি। ...এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি, ওই ছেলের ব্যাপারে কী করবেন? মনে করি না এ দেশে ওকে আনা উচিত। আর্মি বা সিআইএ ওকে পেলে কী করবে বলা মুশকিল। নিজেরা কাজে লাগাতে না পারলে সোজা ফেরত দেয়া হবে রাশান কর্তৃপক্ষের কাছে।'

'আমিও এটা নিয়ে ভেবেছি,' বলল রানা। 'আপাতত থাকুক মিতার কাছে। ভাল খাতির হয়েছে ওদের। অন্য কোনও সমস্যা না এলে, আমরা তিনজনই যাচ্ছি ঘুরতে।' ঠিক করেছে, মিতার কাছ থেকে জরুরি আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে।

'কোথায় যাবেন?' জানতে চাইলেন এনআরআই চিফ।

'মেক্সিকোর ক্যামপেচেতে,' বলল রানা, 'ওখান থেকেই খুঁজতে শুরু করব প্রফেসরকে।'

এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্যান্টের পকেটে স্যাটেলাইট ফোন রাখল রানা। মিতার সামনে গিয়ে থামল।

ওর চোখের দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা, কৌতূহলী। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'পাবলোকে উড়তে শেখাচ্ছি।' পেলব দু'হাত দু'দিকে মেলে দিয়েছে ও।

ওকে অনুকরণ করছে ছেলেটা।

আদর করে পাবলোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'ইউক্যাটানের কোথাও লুকিয়ে পড়েছেন প্রফেসর হ্যারিসন। যোগাযোগ করছেন না কারও সঙ্গে।'

'আমি যাব তাঁকে খুঁজতে,' দৃঢ় স্বরে বলল মিতা। 'পাশে কি পাব তোমাকে?'

'তিনি বিপদে আছেন, আর সেজন্যে নিজেকে দায়ী ভাবছ

তুমি,' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল মিতা। 'যে দায়িত্ব নিয়েছি, সেটা পালন করতে পারিনি। উচিত ছিল না দায়িত্ব নেয়া। আমি তো আর মানুষকে নিরাপত্তা দেয়ায় তোমার মত দক্ষ নই।'

'আবারও মেক্সিকোতে গেলে হয়তো পড়বে আরও বড় বিপদে,' বলল রানা।

'জানি।' সাগরের দূরে তাকাল মিতা।

'এনআরআই চিফের সঙ্গে কথা হয়েছে।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

মধুর চেয়েও মিষ্টি এক টুকরো হাসি ফুটল মিতার লোভনীয় ঠোঁটে। 'থ্যাঙ্ক্স্!'

'দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।'

'পাবলো, আমরা বেড়াতে যাব, মজা হবে না?' ছেলেটার কাঁধে আলতো চাপড় দিল মিতা।

জবাব দিল না পিচ্চি। একবার মিতাকে আবার রানাকে দেখছে। মনোযোগ পেয়ে খুশি।

মুখে স্বীকার করবে না মিতা, কিন্তু যাকে সবসময় চেয়েছে পাশে, আচমকা পেয়ে গেছে সেই দেবতাকে!

রানা তাকাতেই রক্তিম হলো ওর ফর্সা দুই কপোল।

আঠারো

রঙচটা, পোড়ো দোতলা বাড়ি ছেড়ে বেরোলেন প্রফেসর

হ্যারিসন, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পৌঁছুলেন জেলে গ্রাম পুয়ের্তো আয়ুলের বুলেভার্ড-এ। যে বাড়িতে উঠেছেন, ওটা হোটেল বা মোটেল নয়। এ কারণেই বেছে নিয়েছেন। সদর দরজা ছাড়া অন্য কোনও গেট নেই। খাড়া সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠলে বারান্দার একপাশে পাঁচটা ঘর ও অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুম। তাঁর মনে হয়েছে, ওখানে ঢুকে চট্ করে তাঁকে কিডন্যাপ করতে পারবে না কেউ।

আরও একটি কারণ: প্রিয় স্ত্রীকে নিয়ে হানিমুনে এসে ওই বাড়িতেই উঠেছিলেন। একটু দূরেই ছিল তাঁর খননের সাইট।

চিয়াপাস গ্রামে পড়ে থাকার সময় হ্যারিসনের মনে হয়েছে, আবারও ফিরে এসেছেন তাঁর স্ত্রী। তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন, সাহায্য করছেন, বিপদ হলে আগেই জানিয়ে দেবেন।

গত কয়েক দিন বারবার দেখেছেন স্বপ্ন। সব ছিল সিনেমার মত। কোনওটা আনন্দের, কোনওটা প্রায় দুঃস্বপ্নের। আজকাল সবার সামনেই আলাপ করছেন অদৃশ্য স্ত্রীর সঙ্গে, তাতে মন্দ লাগছে না তাঁর।

অসুখ রয়ে গেছে, দূর হয়নি ইনফেকশন; তবে দুষ্ট ওঝার খপ্পরে পড়ে চূড়ান্ত ভুগে যাই-যাই অবস্থা, এমনসময় পাহাড়ি গ্রামে তরুণ গাইড পিকো আনল এক বোতল অ্যাণ্টিবায়োটিক। ওটা খেয়ে একটু সুস্থ হলেন। হাঁটার শক্তি ফিরতেই, তিন দিন হলো বদমাশ ওঝাকে লুকিয়ে ভেগে এসেছেন।

প্রথমে ভেবে পাননি, কোথায় যাবেন। পরে মনে হলো, যারা হামলা করেছে, তারা ধরে নিয়েছে মারা গেছেন তিনি। নইলে আর রক্ষা ছিল না। তখনই ভাবলেন, কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা অনুচিত। মিতার কাছ থেকে সব শুনতেন এনআরআই চিফ, হয়তো তাঁর অফিস থেকেই সব তথ্য

পেয়েছে শত্রুরা। কাজেই, কাউকে জানানো যাবে না যে তিনি বেঁচে আছেন।

যেখানে উঠেছিলেন মিতা ও তিনি, ভুলেও সেখানে যাননি। প্রাণরক্ষা প্রথম কাজ, হোটেলে থাক দামি, দরকারী মালপত্র। চলে এলেন উত্তরদিকে ইউক্যাটান উপকূলে ক্যানকুন থেকে আশি মাইল দূরে। এ গ্রামেই আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে স্ত্রীসহ উঠেছিলেন পুরনো ওই বোর্ডিং হাউসে।

গত কয়েক দিনে বড় হয়েছে দাড়ি, চট্ করে কেউ চিনবে না তাঁকে। প্রতিদিন গ্রামটা ঘুরে দেখতে আসে শ'দুয়েক টুরিস্ট। কাজেই সহজে তাঁকে খুঁজে পাবে না শত্রুরা। উপকূলীয় এই এলাকায় রয়েছে অজস্র মায়ান সাইট। মিতা ও তিনি ধারণা করেছিলেন, এদিকেই কোথাও আছে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী পরের স্ফটিক।

বুলেভার্ড ছেড়ে ধুলোময় পথে চললেন প্রফেসর হ্যারিসন। প্রতিদিন একই রুটিন তাঁর। এমনিতেই চুল-দাড়ি সব ধূসর, তার ওপর হাতে মোটা লাঠি, অন্যহাতে কালো নোটবুক— এসব দেখে আজকেও হৈ-হৈ করে উঠল গ্রামের ছেলেরা: মোযেস নিগ্রো! ওই যায় কুচকুচে কালো মুসা নবী!

নিজেকেও তেমনই মনে হয় প্রফেসরের। এনআরআইকে পথ দেখাচ্ছেন। ওই স্ফটিক খুঁজতে গিয়ে ইহুদি জাতির মত চল্লিশ বছর পার করতে হবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ব্রাযিলের জঙ্গলে ও মেক্সিকোর দ্বীপে যেসব গ্লিফ পেয়েছেন, তা থেকে জানতে পেরেছেন বহু কিছুই। এ ছাড়া, সাহায্য করেছে দুর্গম, পাহাড়ি গ্রামের মানুষগুলোর ফিসফিস করে বলা কথা, স্যাটেলাইট ইমেজারি ও ইনফ্রারেড এরিয়াল ফোটোগ্রাফি।

আগ্নেয় দ্বীপে স্ফটিক বিষয়ে সূত্র পাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু সেসময়ে হামলা করল শত্রুরা। কোনওমতে পাথরের গ্লিফের ছাপ লিনেন শার্টে তুলেই পালাতে হয়েছে। শার্টটা থেকে উদ্ধার করেছেন কিছু তথ্য। ওই দ্বীপের পাথরে লেখা ছিল: *আহাউ বালামের মাধ্যমে শুরু আত্মার পথ। বর্শার ডগা গেছে বিশাল ওই শহরের যোদ্ধার মন্দিরে। ওখানেই হবে আত্মা বলিদান। তারপর যেতে হবে দেবতার ঝলমলে পথে, ত্যাগ করতে হবে দেহ। আর তখনই জাগুয়ারের ঢালের সাহায্য পেয়ে পৌঁছুবে স্বর্গে।*

এসবের মানে জানেন না হ্যারিসন। দ্বীপের ওই রাজার কোনও ঢাল বা বর্শা ছিল না। শত শত সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই দেখেননি। লেখা ছিল: *ওই পথে যাও অন্যসব পথে, তারপর যাও তৃতীয় পথে।*

প্রফেসর বুঝেছেন, এসব কোনও কাজে আসবে না। দরকার আরও তথ্য। সৈকতে যাওয়ার সময় মাঝপথে পেয়ে গেলেন ছোট এক ইন্টারনেট ক্যাফে। পয়সা দেয়ার পর নড়বড়ে চেয়ারে বসে লগ ইন করলেন। ট্যাপ করতে চাইলেন তাঁর ইউনিভার্সিটির মেইনফ্রেম কমপিউটার। ওটাতে আছে ইুউক্যাটানের স্যাটেলাইট সার্ভের ডেটা। কানেকশন হওয়ার সময় ভাবলেন, চোখ রাখেনি তো শত্রুরা তাঁর অ্যাকাউন্টে? সেক্ষেত্রে তারা জেনে যাবে, তিনি বহাল তবিয়তে আছেন মেক্সিকোতে।

হ্যারিসন ভাবলেন, কেমন হয় বাসে চেপে অন্য শহরে গিয়ে কোনও ইন্টারনেট ক্যাফে থেকে ইউনিভার্সিটির কমপিউটার ট্যাপ করলে? কিন্তু কাজটা কঠিন। রাতে বারবার লাগে শীত, আবার একটু পর ঘেমে ওঠেন গরমে। গুলির ইনফেকশনের কারণে বড্ড ক্লান্ত তিনি।

সাবধানে নিজের পাসওঅর্ড লেখার পর এণ্টার টিপে দিলেন

প্রফেসর। একটু পর স্ক্রিনে দেখলেন এদিকের এলাকার বড়-ছোট সব মায়ান সাইট। বেশিরভাগ ধ্বংসাবশেষে গিজগিজ করছে টুরিস্ট। এসব সাইট দিয়ে চলবে না তাঁর। অনেক পুরনো হবে স্ফটিকের মন্দির। এত দিনে গভীর জঙ্গল ঘিরে ফেলেছে ওটাকে।

মনোযোগ দিয়ে ইনফ্রারেড ইমেজ দেখতে লাগলেন তিনি। জঙ্গলের নানান ধরনের তাপ অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে ছবি। এ এলাকার নিচের দিকের জমির তাপ খেয়াল করতে গিয়ে নতুন করে মনে আশা জন্মাল তাঁর।

কিন্তু একটু পর আবারও হতাশ হয়ে গেলেন।

ইউক্যাটানে রয়েছে অনাবিষ্কৃত হাজারো মায়ান ধ্বংসাবশেষ। এ গ্রামের বিশ মাইলের ভেতর রয়েছে অন্তত এক ডজন। কোন্ সাইট দিয়ে কাজ শুরু করবেন তিনি?

হঠাৎ ভীষণ চমকে গেলেন প্রফেসর।

ঠাস্ করে পড়েছে পেছনের চেয়ারটা।

'সরি!' বলে উঠল এক কাস্টোমার।

হামলার ভয়ে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে হ্যারিসনের। ঘুরে তাকালেন লোকটার দিকে।

শেয়ালের চোয়ালের মত ভাঙা চোয়াল যুবকের। মাথা ভরা বাদামি চুল। চেয়ার তুলে ওটাতে বসে পড়ল সে।

হঠাৎ প্রফেসরের মনে হলো, তিনি আছেন মস্ত বিপদে। কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে কমপিউটার লগ অফ করে বেরিয়ে এলেন বাইরে। পাশের দোকানের মালিক তীক্ষ্ণ চোখে দেখল তাঁকে।

তাতে খুব অস্বস্তি লাগল। এরা কি চোখ রেখেছে তাঁর ওপর?

ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া সব টুরিস্ট।

না, এরা শত্রু হতে পারে না।

'আমাকে সাহায্য করো, হান্না,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

জবাব দিল না কেউ।

ভীষণ একা লাগল তাঁর।

নিরাপত্তা চাইলে ফিরতে হবে নিজের ঘরে।

তাই করলেন তিনি। ফিরলেন ওই বাড়িতে। দোতলার ঘরে ঢুকে ধপ্ করে বসলেন চেয়ারে। প্রিন্টআউট ও ডেটা রাখলেন টেবিলে। ভাবছেন, এসব তথ্য পেলে খুব খুশি হবে শত্রুরা। নতুন কিছু পেলেই তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেবে। তখন মেরেও ফেলতে পারে তাঁকে।

ঠিক করলেন, এখন থেকে কোনও নোট রাখবেন না। সবই জমিয়ে রাখবেন নিজের মগজে। কিন্তু তা খুব কঠিন কাজ।

না, অন্য কিছু করতে হবে।

সহজ উপায় আছে। চকবোর্ড কিনবেন তিনি। চক দিয়ে লিখবেন ডেটা। কাজ শেষ হলে ভেজা রুমাল দিয়ে মুছে ফেলবেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, প্রায় ঘুমন্ত এই গ্রামে কোথায় পাবেন তিনি চকবোর্ড?

না, পাবেন না।

খুব অসহায় বোধ করলেন হ্যারিসন। জানালাপথে চোখ গেল দূরে। ওই যে, সাগরে চলছে ভাটা। সরু রাস্তা মিশেছে মসৃণভাবে লেপে থাকা রুপোলি বালির সৈকতে। মন চাইলে যা খুশি লিখতে বা আঁকতে পারেন।

একবার মাথা দোলালেন প্রফেসর হ্যারিসন।

পেয়ে গেছেন তিনি মস্ত এক চকবোর্ড!

খুশিমনে আবারও সব গুছিয়ে নিয়ে নেমে এলেন। সৈকতের দিকে হাঁটতে শুরু করে বিড়বিড় করলেন, 'তুমিই কি পথ দেখালে, হান্না? ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না!'

সৈকতে লুটিয়ে পড়ছে মেক্সিকো উপসাগরের ঢেউ, তার

পাঁচ ফুট আগে থামলেন। ভেজা বালি বেশ জমাট।

একবার চারপাশ দেখলেন প্রফেসর।

কেউ নেই।

বহু রাত ঘুমুতে পারেননি। মনে এসেছে নানান থিয়োরি। বসলেন ভেজা বালিতে, তর্জনী ব্যবহার করে লিখতে লাগলেন দরকারী সব তথ্য।

আগ্নেয় দ্বীপের মূর্তির মত আরও কিছু মূর্তি দেখেছেন। ওগুলোতেও ছিল প্রায় একই তথ্য। তথ্যের পাশে মানচিত্রের মত করে আঁকতে লাগলেন গুরুত্বপূর্ণ মায়ান মন্দির। ওগুলো থেকে সোজা সামনে বাড়বে বর্শা। ওটাই দেখিয়ে দেবে যোদ্ধার মন্দির। ছোট নুড়িপাথর হলো ছোট মন্দির, বালির ঢিবি হলো বড় মন্দির।

নিজের কাজে মগ্ন হয়ে গেলেন তিনি।

পেরিয়ে গেল কয়েক ঘণ্টা।

বারবার পরিবর্তন করলেন নানান সাইট।

পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় হাসিহাসি চোখে তাঁকে দেখল টুরিস্টরা, পাত্তা দিলেন না তিনি।

ওরা ভাবুক না, তিনি আসলে পাগল! কী যায়-আসে?

বুঝতে চাইলেন কোন্ ধ্বংসাবশেষ হিসেবের ভেতর রাখবেন, আর কোন্গুলো বাদ দেবেন।

আরও অনেকক্ষণ পর তৃতীয়বারের মত আঁকলেন বর্শা। এবার ওই রেখা গেছে উত্তরদিকে।

কিন্তু ওদিকে বড় কোনও মায়ান সাইট নেই!

নতুন করে বর্শা এঁকে দেখলেন, উপকূলের ঘন জঙ্গল!

হতাশ হলেন হ্যারিসন। হাতের চেটো দিয়ে সরাতে

চাইলেন ভুরুর ওপর থেকে ঘাম। ফলে বালিতে মেখে গেল তাঁর পুরো কপাল। মন খারাপ করে ঢালু সৈকত থেকে চোখ রাখলেন সাগরে।

প্রায় বিকেল, রোদ উষ্ণ করে তুলেছে বালি।

মৃদু ঢেউ সৈকত থেকে আবারও ফিরছে উপসাগরে।

ডক থেকে প্রচণ্ড শব্দে দূরে গেল স্পিডবোট। ফেনাভরা বড় ঢেউ এসে মুছে দিল তাঁর আঁকা বর্শার সামনের অংশ। ঘুরপাক খেল পানি। আবারও ফিরল উপসাগরে।

'মুছে দিতে চায় চকবোর্ড,' বিড়বিড় করলেন প্রফেসর। 'তা হলে কি আবারও নতুন করে আঁকতে হবে সব?'

উঠে দাঁড়ালেন। চোখ পড়ল তাঁর তৈরি মানচিত্রে।

মন্দির বা অন্যসব সাইট না মুছে বর্শার ডগা গায়েব করে দিয়েছে ঢেউ। হঠাৎ প্রফেসরের মনে পড়ল একটা তথ্য। চট্ করে দেখলেন নিজের প্রিন্টআউট।

আজ থেকে হাজার বছর আগে নিচু ছিল সাগর!

তখন তৈরি হয়েছে ওই মন্দির!

তাঁর তৈরি বর্শা এখন সোজা দেখাচ্ছে এই উপসাগর!

নিশ্চয়ই অজস্র ঢেউয়ের নিচে রয়েছে যোদ্ধার মন্দির?

'হান্না, ডার্লিং?' বিড়বিড় করলেন তিনি, 'অনেক ধন্যবাদ!'

উনিশ

গভীর রাত।

প্রশান্ত মহাসাগরের সাঁইত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে মেঘভরা আকাশ চিরে ছুটে চলেছে এয়ারবাস এ-থ্রিএইটি

বিমান।

ল্যাং-এর ব্যক্তিগত কমিউনিকেশন সুইটে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাং লাউ। দেয়াল ঘেঁষে এক সারি ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট, রেডিয়ো ও স্যাটেলাইট ট্র্যান্সিভার। অপরিসর ককপিটের কথা মনে পড়ল লাউয়ের। ওখানে জানালা আছে। এখানে সেসবও নেই।

অবশ্য, জানালা থাকলেই বা কী হতো?

কিছুই দেখার নেই আঁধারে।

লাউয়ের হাতে একটা প্রিন্টআউট দিল রেডিয়ো অফিসার। একটু আগে ডিক্রিপ্ট করেছে স্যাটেলাইট ট্র্যান্সমিশন।

কাগজে চোখ বুলিয়ে খুশি হয়ে উঠল লাউ। বিমানের মাঝের সরু পথে গিয়ে থামল হুয়াং লি ল্যাং-এর ব্যক্তিগত সুইটের সামনে। এমনিতে জরুরি তথ্য পেলেও ভোরের আগে ল্যাং-কে ঘুম থেকে তোলে না সে, কিন্তু আজ অপেক্ষা করতে হবে না, বিলিয়নেয়ারের চিকিৎসায় ব্যস্ত বেশ কয়েকজন ডাক্তার।

কেবিনের দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে কবাট খুলল সুন্দরী এক চাইনিজ নার্স। আজ ল্যাং-এর দেহে ব্যবহার করা হচ্ছে নতুন এক শক্তিশালী ইলেকট্রিকাল স্টিমুলেটর। বরাবরের মত ত্বকে ইলেকট্রোড নেই, তার বদলে অপারেশন করে শরীরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কিছু ওয়ায়্যার। ডাক্তাররা আশা করছেন, এবার নতুন করে আবারও কাজ করবে বিশেষ কিছু নার্ভ। তার ফলে ল্যাং ব্যবহার করতে পারবে সদ্য আবিষ্কৃত কিছু যন্ত্র।

চিকিৎসার এ পর্যায়ে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছেন ডাক্তাররা। রাজি হতেন না, কিন্তু হুইল-চেয়ারের বন্দিজীবন আর সহ্য হচ্ছিল না ল্যাং-এর। গত ক'বছরে মেডিকেল সায়েন্সের আধুনিক প্রত্যেকটা চিকিৎসা নিয়েছে সে। স্টেম সেল, নিউরোলজিকাল

ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট, অপরীক্ষিত ড্রাগ থেকে শুরু করে কবিরাজের হাজারো ওষুধ কোনও কাজেই আসেনি।

রোগের আক্রমণ কমিয়ে দিয়েছে ইলেকট্রিকাল স্টিমুলেশন। কিন্তু ওই চিকিৎসার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে ল্যাং। পেশির ক্ষয় কমলেই খুশি হওয়ার কিছু নেই। বারবার তাগিদ দেয়ায় নতুন থিয়োরি অনুযায়ী কাজ করছেন ডাক্তাররা। সঠিক ইলেকট্রিকাল স্টিমুলেশন ব্যবহার করেই সুস্থ করা হবে নার্ভ।

এগযামিনেশন টেবিলে ল্যাং-কে দেখল লাউ। প্রতিবার স্টিমুলেটর চালু হলেই ভীষণভাবে মুচড়ে উঠছে বিলিয়নেয়ারের দেহ। প্রথমে ঝাঁকি শুরু হচ্ছে হাতে, তারপর ছড়িয়ে পড়ছে পায়ে। আড়ষ্ট আঙুল সোজা হয়ে কাঁপছে থরথর করে। তারপর বিদ্যুৎ বন্ধ হলেই আঙুলগুলো আবারও কুঁকড়ে তৈরি করছে ছোট একটা বল।

গত কয়েক বছর ধরে অসুস্থ ল্যাং। আজ হঠাৎ তার হাত-পা নড়তেই চমকে উঠল লাউ। কেমন বিরক্তি এল তার।

ব্যথায় মুখ কুঁকড়ে ফেলেছে ল্যাং।

লাউয়ের মনে হলো, ভাল হতো এখান থেকে সে চলে যেতে পারলে।

কয়েকটা ঝাঁকুনির পর আবারও শিথিল হলো ল্যাং-এর দেহ। ডাক্তারের দিকে তাকাল সে। নরম আলোর এলসিডি মনিটরে ডেটা দেখছেন ডাক্তার।

'মুখ খুলতে সময় নিচ্ছেন,' বলল বিলিয়নেয়ার, 'দুঃসংবাদটা কি এতই খারাপ?'

'সরি,' ডাক্তারদের নেতা বললেন, 'আপনার নিউরোলজিকাল রেসপন্স এখনও খুব দুর্বল।'

'সেক্ষেত্রে বাড়ান স্টিমুলেশন,' বলল ল্যাং।

'তাতে লাগবে প্রচণ্ড ব্যথা,' বললেন ডাক্তার। 'আপনার

মনে হবে দাউদাউ আগুনে পুড়ছে সারাদেহ। সহ্য করতে পারবেন না। চট্ করে দূরও হবে না সেই যন্ত্রণা।'

'আমার যা অবস্থা, ব্যথাও আজকাল হয়ে উঠেছে আনন্দের,' বলল ল্যাং।

মৃদু মাথা দোলালেন ডাক্তার। 'কয়েক মিনিট লাগবে সেটিং অ্যাডজাস্ট করতে।' কিছু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সামনে গেলেন তিনি।

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল লাউ।

তার চেহারা পড়ছে ল্যাং। কড়া সুরে বলল, 'তোমার এসব ভাল লাগছে না।'

'ভাল-মন্দ স্থির করার মালিক তো আমি নই,' বলল লাউ।

'তা ঠিকই বলেছ,' বলল ল্যাং। 'কিছু বলবে?'

'নতুন তথ্য পেয়েছি। ওই যে, আমেরিকান কালো প্রফেসর, যাকে আমরা মনে করেছিলাম মরে গেছে? ওই লোক নাকি বেঁচে আছে।'

'তোমার আরেকটা ভুল,' বলল ল্যাং। 'ওই লোককে অনেক আগেই মেরে ফেলা উচিত ছিল।'

অপমান বোধ করতেই রেগে গেল লাউ। তবে চেহারা রাখল নিস্পৃহ। আজকাল একটু সুযোগ পেলেই জিভের ক্ষুর চালায় মৃতপ্রায় বস।

'ওই ইউনিভার্সিটির মেইনফ্রেম কমপিউটারে ট্যাপ করেছিল প্রফেসর হ্যারিসন বা তার চেনা কেউ। কিছু তথ্য ডাউনলোড করেছে। তার ভেতর আছে ইউক্যাটানের স্যাটেলাইট ফোটো।'

'জানতে পেরেছ ওই লোক এখন কোথায়?'

'না। তবে যে কমপিউটার টার্মিনাল ব্যবহার করেছে, ওটা আছে মেক্সিকোর এক গ্রামে। যেখান থেকে কাজ শুরু করেছিল, সেখান থেকে অনেক সরে গেছে সে। ওই মেয়ে যদি যোগাযোগ

করে তার সঙ্গে...' চুপ হয়ে গেল লাউ।

'অবশ্যই যোগাযোগ করবে,' জোর দিয়ে বলল ল্যাং। 'এখন কোথায় আছে তোমার লোক?'

'তুলুম আর পুয়ের্তো মোরেলসে। এ ছাড়া আছে মেক্সিকো সিটির অ্যানথ্রোপলজির জাদুঘরে। ওখানে কিছু রিসার্চ করেছিল প্রফেসর আর ওই মেয়ে।'

'গুড,' বলল ল্যাং, 'চোখের আড়ালে থাকুক ওরা। এবার সময়ের অনেক আগেই কাজে নেমে পড়েছ।'

মাথা দোলাল লাউ।

যন্ত্রপাতির আড়াল থেকে মাথা বের করলেন ডাক্তার। 'আমরা তৈরি।'

লাউকে বিদায় করতে হাত নাড়ল বিলিয়নেয়ার।

মৃদু নড করে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল লাউ। পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। আবারও ফিরছে কমিউনিকেশন সুইটে। শুনতে পেল পেছনের ঘরে শুরু হয়েছে যান্ত্রিক গুঞ্জন। ব্যথা ও আনন্দের মিশেলে বিকট চিৎকার ছাড়ল হুয়াং লি ল্যাং।

বিশ

ঝরঝরে পুরনো, প্রায় বাতিল জিপ ড্রাইভ করছে রানা। পাশের সিটে মিতা। পেছনে পাবলো। কয়েক ঘণ্টা ভাজা ভাজা হয়েছে ওরা মেক্সিকোর কড়া রোদে। হংকং ও দক্ষিণ চিন সাগরের বিশ্রী বৃষ্টির চেয়ে তা অনেক ভাল।

উপকূলীয় সড়ক ধরে চলেছে পুয়ের্তো আয়ুল গ্রাম লক্ষ্য

করে। যাওয়ার পথে সাগরের বুকে সূর্যের ঝিকিমিকি দেখছে রানা। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওরা এসেছে বেড়াতে। যেখানেই থেমেছে, সবাই ধরে নিয়েছে, মিতা এবং ও বিবাহিত। যে কারণেই হোক, পাবলোকে দত্তক নিয়েছে ওরা।

রিয়ারভিউ মিররে তাকাল রানা।

চুপ করে বসে আছে পাবলো। মাথায় টুরিস্টদের সমব্রেরো হ্যাট। চোখে প্লাস্টিকের সানগ্লাস। প্রায় কোনও কথাই বলে না ছেলেটা। রানা রাশান ভাষায় আলাপ করতে গিয়ে বুঝেছে, দুনিয়ার কোনও দিকেই মনোযোগ নেই পাবলোর। এখন দূরে চেয়ে দেখছে সবুজ জঙ্গল, নীলাকাশ ও সাগর।

'ওর সত্যি কী হয়েছে?' আনমনে বলল মিতা। পাবলো একটু পর পর খোলে সানগ্লাস। ডাঁটা দিয়ে ঠুক-ঠুক আওয়াজ করে, তারপর আবারও চশমা পরে। 'প্রথমে ভেবেছিলাম অটিস্টিক। কিন্তু পরে বুঝলাম, তা নয়।' দুঃখের ছাপ পড়ল মিতার মুখে। নরম সুরে বলল, 'আসলে ওর ওপর দিয়ে অনেক গেছে।'

চুপ করে থাকল রানা। গত ক'দিন ধরে ভাবছে, যে-কোনও সময় হামলা করবে ল্যাং বা দিমিতভ।

কোথায় রাখবে ছেলেটাকে?

ওকে ফেরত চাইবে রাশা, ঠেকাবার উপায় থাকবে না।

কী করে যেন রানার দুশ্চিন্তা টের পেয়ে বলল মিতা, 'আমরা হয়তো লুকিয়ে ফেললাম ওকে?'

'তা প্রায় অসম্ভব,' বলল রানা।

ঝড়ের বেগে পিছনে পড়ছে পিচঢালা পথ।

আবারও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখায় মন দিল মিতা।

ধুলোবালিতে মেখে আছে ওরা।

পুরো নয় ঘণ্টা হলো গাড়ি চালাচ্ছে রানা।

মিতার পরনে টি-শার্ট, সাদা জিন্সের প্যান্ট, মাথায় কাউবয়

হ্যাট। সোনালি রোদে ঝিকঝিক করছে ফর্সা ত্বক। হ্যাঁ, দেখতে ভাল। মনে মনে ওর রূপের প্রশংসা না করে পারল না রানা।

কিছুক্ষণ পর ওরা ঢুকল মাঝারি এক জেলে গ্রামে।

জেলেরা তীরে তুলে রেখেছে রঙিন কিছু নৌকা।

একটু দূরেই ছোট কিছু বাড়িঘর।

'ব্যস, আপাতত যাত্রা শেষ,' বলল রানা।

'প্রফেসর এখনও মেক্সিকোতে রয়ে গেলে, এখানেই থাকবেন,' বলল মিতা।

'নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই,' বলল রানা।

'বারবার বলতেন এখানে এসে ক'দিন বিশ্রাম নেবেন,' বলল মিতা। 'আগেও কয়েক মাস এখানে ছিলেন স্ত্রীকে নিয়ে।'

রাস্তার পাশে জিপ রাখল রানা। পরের পুরো একঘণ্টা ধরে গ্রামের সব মোটেল ঢুঁড়ে দেখল ওরা।

কোথাও নেই প্রফেসর হ্যারিসন।

সাগরতীরে ছোট এক খাবারের হোটেলের মালিক জানাল, 'কালো লোকটা তো? তাকে পাবেন ওদিকে।' আঙুল তুলে দূরের দোতলা এক বাড়ি দেখাল সে।

পাঁচ মিনিট পর বোর্ডিং হাউসের সামনে জিপ রাখল রানা। মিতা নেমে পড়ার আগেই বলল, 'অপেক্ষা করো, আশা করি পাঁচ মিনিটের ভেতর ফিরব।'

বাড়ির প্রথম ঘরে ডেস্কের পেছনে বসে আছে এক ক্লার্ক। প্রফেসরের গায়ের রঙ ও চেহারার বর্ণনা দিতেই মাথা দোলাল সে। 'মোযেস নিগ্রো! বদ্ধ উন্মাদ!'

কথাটা মানতে পারল না রানা। ব্রাযিলের ওই অভিযানে গিয়ে খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ বলে মনে হয়েছে ওর হ্যারিসনকে।

সিঁড়ি দেখিয়ে দিল ক্লার্ক। 'দোতলা। তৃতীয় ঘর।'

কট-মট আওয়াজ তুলে নড়বড়ে সিঁড়ির ধাপ পেরোতে লাগল রানা, উঠে এল চওড়া এক বারান্দায়।

বাইরে থেকে বাড়িটা দেখলে ভুতুড়ে মনে হলেও ভেতর দিক পরিষ্কার। দেয়ালে সাদা রঙ। ঘরগুলোর দরজার সামনে পাতলা কার্পেট। উল্টো দিকে মাঝারি সব ড্রামে লতাগাছ, নেমে গেছে একতলায়। ফুটেছে লাল ফুল। একপাশে উঠান। মাঝখানে পাথরের তৈরি ভাঙা ফোয়ারা। ছড়াৎ-ছড়াৎ শব্দে পড়ছে পানি। পাশের চাতালে কিচিরমিচির করছে এক ঝাঁক পাখি।

তিন নম্বর ঘরের দরজায় থেমে টোকা দিল রানা। 'প্রফেসর হ্যারিসন?'

জবাব দিল না কেউ।

ক্লার্ক বলেছে, আজ এখনও বেরিয়ে যাননি হ্যারিসন।

স্কেলিটন কি বের করে তালায় ভরল রানা, ডানহাতে বেরিয়ে এল .৩৮ ক্যালিবারের ওয়ালথার পি.পি.কে. পিস্তল।

প্রায় নিঃশব্দে তালা খুলে কবাট সরাল। ঘরে পা রেখেই কাভার করল চারপাশ। ভেবেছিল ঘর খালি, কিন্তু আছে কেউ!

পিছু নিয়ে ঘরে ঢুকেছে সোনালি রোদ, মেঝেতে পড়েছে ওর ছায়া, ওদিকে চেয়ে রানা দেখল, দরজার পাশ থেকে লাঠির মত কিছু সরাসরি নামছে ওর মাথা লক্ষ্য করে!

একলাফে সরে গেল রানা, পরক্ষণে ঘুরেই পিস্তল তাক করল আততায়ীর বুকে।

থমকে গেছেন প্রফেসর। উদ্যত পিস্তল বুকে তাক করা দেখে হাত থেকে ফেলে দিলেন লাঠি। কেমন বিভ্রান্ত চেহারা। বিড়বিড় করে বললেন, 'রানা? মাই গড!'

সত্যিই মানুষটাকে পাগলাটে লাগছে, ভাবল রানা।

উস্কোখুস্কো চুল, মুখ ভরা গোঁফ-দাড়ি, চোখ গাঁজাখোরদের

মতই লাল। 'কেমন আছেন, প্রফেসর?' জানতে চাইল ও।

'তুমি সত্যিই কি বাস্তব, রানা?' বেসুরো কণ্ঠে জানতে চাইলেন হ্যারিসন। খস-খস করে চুলকে নিলেন গাল।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' মৃদু হাসল রানা।

একটু শিথিল হলেন প্রফেসর। 'ঠিক... কিন্তু কোথা থেকে এলে তুমি?'

'আমেরিকা, হংকং, ম্যানিলা, মেক্সিকো... নানান জায়গা ঘুরে, প্রফেসর,' বলল রানা। 'আপনি কি সুস্থ?'

বিছানার কিনারায় বসলেন হ্যারিসন। মাথা নাড়লেন। 'জানি না। কখনও হান্নার সঙ্গে গল্প করে চমৎকার কাটছে সময়। মনে হচ্ছে ভাল আছি, একটু পরেই মনে হচ্ছে, আমি খুব অসুস্থ।'

হাই হিলের আওয়াজ উঠে এসেছে দোতলায়।

রানা বুঝল, গাড়িতে বসে থেকে বিরক্ত হয়ে চলে এসেছে মিতা। কয়েক সেকেণ্ড পর দরজা দিয়ে উঁকি দিল মেয়েটা। এক হাতে পাবলোর কবজি। 'আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। প্রফেসর, কেমন আছেন?'

ভীষণ চিন্তিত হয়ে গেলেন হ্যারিসন। খুব ভাল করেই চেনেন মিতাকে। কিন্তু ওর তো বিয়েই হয়নি! হচ্ছেটা কী? কোত্থেকে এল এই ছেলে?

'ও কে?' জানতে চাইলেন।

'অনেক দীর্ঘ কাহিনি, স্যর,' বলল মিতা। 'পরে সবই খুলে বলব।' প্রফেসরের পাশে বসল। তাঁর ক্ষতের পুঁজ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে প্যান্টের ওপর। চমকে গেল মিতা। বুঝতে দেরি হলো না, ক্ষতটা এখনও দগদগে হয়ে আছে।

'ওঝা বা আমার নানা চেষ্টার পরেও রাতে বারবার দেখি দুঃস্বপ্ন,' নালিশ করলেন হ্যারিসন, 'ভীষণ ভয় লাগে। আগে কখনও এমন হতো না।'

'একে জ্বর, তার ওপর নেই ঘুম,' বলল মিতা, 'এ ছাড়া আছে হামলার ভয়! স্যর, আপনার বোধহয় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া উচিত।'

প্রফেসরের টেবিলে চোখ গেল ওর। ওখানে এক বোতল বড়ি। মাথা নাড়ল মিতা। 'না, এগুলো ইনফেকশন ঠেকাতে যথেষ্ট নয়। আপনি বাড়তে দিয়েছেন ওটাকে। এবার সত্যিকারের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ চাই। সুস্থ হলেই সোজা আপনাকে পাঠিয়ে দেব আমেরিকায়।'

'কোথাও যাব না,' গোঁ ধরলেন হ্যারিসন। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝলেন, মনে কষ্ট পাবে মিতা। এবার বললেন, 'আসলে, ইয়ে, মিতা, আমিই তো শুরু করেছি সব, তাই কাজ শেষ না করে দেশে ফিরতে চাই না।'

প্রফেসরের মন ঘুরিয়ে দিতে বলল মিতা, 'সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও বড় কোনও বিপদে পড়বেন!'

নরম সুরে বললেন হ্যারিসন, 'তুমি বরং বাড়ি ফেরো।'

'আপনাকে না নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'তা হলে রয়েই যাও, দেখবে ক'দিনের মধ্যে পেয়ে গেছি পরের স্ফটিক।'

'বুঝলে, মিতা, তোমার মতই উনি, নিজের কাজ ফেলে রাখবেন না,' বলল রানা।

'ঠিকই পাব ওই স্ফটিক। ঠেকাতে পারবে না কেউ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিতা। 'আপনি রয়ে গেলে, বাধ্য হয়েই আপনার পাশে থাকতে হবে আমাকে। দায়িত্ব এড়াব না আমি।'

'তুমি কী করবে ভাবছ?' রানার কাছে জানতে চাইলেন বৃদ্ধ প্রফেসর।

'বিশেষ কোনও কাজ নেই আমার,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

জানালা দিয়ে দূরে দেখলেন প্রফেসর। পাতলা পর্দা নেড়ে ঘরে ঢুকছে সাগরের ঝিরঝিরে হাওয়া। তাতে নোনা জলের গন্ধ। আনমনে বললেন তিনি, 'তোমাকে দেখে ভরসা পাচ্ছি, এবার ঠিকই ওই মন্দির খুঁজে পাব আমরা।'

একুশ

মস্কোর পার্ক কালচুরি মেট্রো স্টেশনে সাবওয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল ইগোর দিমিতভ। এই স্টেশন ভবন এতই সুন্দর, যে-কেউ ভাববে, এটা জাদুঘর বা প্রকাণ্ড কোনও অপূর্ব প্রাসাদের অংশ। পালিশ করা বড় টাইল দিয়ে তৈরি মেঝে দাবার ছকের মত। দেয়ালে দেয়ালে মার্বেলের কারুকাজ, এখানে-ওখানে দুর্দান্ত সব মূর্তি। ছাত থেকে ঝুলছে একরাশ উজ্জ্বল ঝাড়বাতি।

এসব স্টেশন ছিল সোভিয়েত রাশার গর্ব। তৈরি উনিশ শ' পঞ্চাশ থেকে ষাট দশকে। কথা ছিল এ দেশে সবার ওপর সম্মান পাবে সাধারণ কর্মীরা, তাই যাওয়া-আসার পথে তাদেরকে খুশি রাখতে নির্মাণ করা হয় বিশাল এসব স্টেশন।

ইগোর দিমিতভের মনে পড়ল, উরাল থেকে এসে প্রথমবারের মত নেমেছিল এই স্টেশনে। নতুন রিক্রুট, মাত্র যোগ দিয়েছে এফএসবিতে। তকতকে স্টেশন দেখে এ দেশের নাগরিক বলে গর্ব হয়েছিল ওর। তারপর দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল সময়, দু'বছর আগে অবসর নিয়েছে। বিয়ে করেনি, সন্তান নেই, টাকার কোনও অভাব নেই। তবুও কাজই খুঁজে নেয় ওকে।

মেট্রো স্টেশন থেকে বেরোতে দরজার দিকে পা বাড়াল দিমিতভ। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে বাইরে। আগেই দু'হাত ভরে দিল কোটের পকেটে। সোজা দেখছে সামনের দিক। কিন্তু পেছন থেকে ডাকল কেউ। গলার আওয়াজ নুড়িপাথর বাড়ি খাওয়ার

মতই কর্কশ। 'ইগোর দিমিতভ। এত তাড়া কীসের?'

থমকে গেল দিমিতভ। ওই কণ্ঠস্বর ভাল করেই চেনে।

ইউরি ম্যাকারভ।

দিমিতভের পাশে পৌঁছল দানবাকৃতি লোকটা। 'চলো, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।'

'হঠাৎ এখানে কেন, ম্যাকারভ?' ধীর পায়ে এগোল দিমিতভ, 'আমাকে সকালে মিটিঙে আসতে বলা হয়েছে। তাড়া কীসের?'

'হাতে বাড়তি সময় নেই,' বলল ম্যাকারভ, 'এরই ভেতর বড়কর্তারা জেনেছেন হংকঙে কী হয়েছে। এবার আগুনে পুড়বে কেউ না কেউ।'

'আর সেই লোকটা আমি, না?'

'অথবা তোমার মতই আমিও পুড়ে মরব।'

চুপ করে হাঁটছে দিমিতভ।

'ওই বাঙালি গুপ্তচরকে কাজে নিলে কেন?' জানতে চাইল ম্যাকারভ।

থমকে দাঁড়িয়ে ম্যাকারভের মুখোমুখি হলো ইগোর। 'আমার মনে হয়েছিল, আড়াল থেকে কাজ করিয়ে নিতে পারব।'

তিক্ত হাসল ম্যাকারভ। 'মস্ত ভুল করেছ।'

যা হবার হবে, এখন ভেবে কী লাভ! আবারও হাঁটতে শুরু করল দিমিতভ। পৌঁছে গেল ওরা সিঁড়ির কাছে। এক পা পেছনে আসছে ম্যাকারভ। সতর্ক হয়ে উঠল প্রাক্তন এজেন্ট।

মস্কোর হিমঠাণ্ডা পরিবেশে বেরিয়ে এল ওরা। আকাশ থেকে নামছে পেঁজা তুলোর মত তুষার। শহরের আলোয় কেমন অস্বাভাবিক লাগছে দেখতে। রাস্তায় জমে গেছে পাঁচ ইঞ্চি তুষার। একটু দূরে অপেক্ষা করছে কালো এক ম্যাসেরেটি সেডান। ওটার চাকা বেলুনের মত ফোলা।

ইগোর দিমিতভের কাঁধে হাত রাখল ম্যাকারভ। 'তুমি আমার সঙ্গে আসছ।'

'কোথায় যেতে হবে? কেন?'

'সব খুলে বলার জন্যে।' শক্তভাবে দিমিতভের কাঁধ ধরল সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেডানের পেছনের দরজা খুলে সিটে বসল দিমিতভ। ভেতরে আছে আরেকজন। তাকে চিনল না ও। বিশাল দেহ নিয়ে সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে চাপল ম্যাকারভ। রওনা হয়ে গেল ড্রাইভার।

ও, তা হলে মস্কোর তুষার ঝরা এক রাতে শেষ হলো আমার সময়? ভাবল ইগোর দিমিতভ। আত্মীয়রা কেউ জানবে না কী হয়েছে। হারিয়ে যাবে লাশ। তবে পাওয়া যাবে গ্রীষ্মে।

মস্কো নদী পেরিয়ে গেল সেডান। থামল রেড স্কোয়্যার-এ।

এখানে খুন করবে? হয়তো তাই! তাতে সাবধান করে দেয়া যাবে অন্যদেরকে।

সেডানের পাশে থামল আরেকটা গাড়ি। এত ঘেঁষে আছে, দরজা খুলতে পারবে না কেউ।

জানালার কাঁচ নিচু করে দ্রুত কী যেন বলল ম্যাকারভ। খপ্ করে ধরে কী যেন রাখল সিটের পাশে। ড্রাইভারকে বলল, 'রওনা হও।'

চলতে শুরু করল ম্যাসেরেটি। আধঘুরে দিমিতভের দিকে তাকাল ম্যাকারভ। হাতে পুরু এনভেলপ। 'আরেকবার সুযোগ দিয়েছে। এখন থেকে সরাসরি এফএসবির নির্দেশে কাজ করবে।'

'কী লিখেছে?' জানতে চাইল দিমিতভ।

'খুঁজে বের করবে ওই ছেলেকে, নিয়ে আসবে সায়েন্স ডিরেক্টোরেট-এ। যদি মনে হয় দেশে আনতে পারবে না, দেরি না করে মেরে ফেলবে। যারা ওর সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত,

বাঁচতে দেবে না তাদেরকে।'

এনভেলপ নিয়ে খুলল ইগোর দিমিতভ। ভেতরে নতুন একটা পাসপোর্ট, প্রচুর টাকা ও পরামর্শের চিঠি। 'আজকাল আর এ ধরনের কাজ করি না,' বলল সে। 'ওদেরকে বলো, অন্য কাউকে যেন বেছে নেয়।'

'দেশকে ছোট করেছ,' রাগী গলায় বলল ম্যাকারভ। 'সার্গেই দিমিতভ তোমার ভাই ছিল।'

'সৎভাই,' বলল ইগোর।

'তাতে কী?' বলল ম্যাকারভ। 'তোমাদের পরিবার বেঈমানি করেছে। সুদে-আসলে সব বুঝে নেবে এফএসবি।'

বাইরে তাকাল ইগোর দিমিতভ। বংশের সুনাম কলঙ্কিত করেছে তার সৎভাই। এখন দেশের হয়ে কাজ না করলে বাঁচবে না ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কেউ।

'মেক্সিকো সিটিতে এফএসবির লোক যোগাযোগ করবে। তোমার কাছ থেকে নির্দেশ নেবে ওরা। কিন্তু তাদেরকে ফেলে কোথাও যাবে না। কথাটা বুঝতে পেরেছ?'

সবই বুঝেছে ইগোর। এফএসবির লোক ওরা। বেছে নেয়া হয়েছে নাইন্থ ডিরেক্টোরেট থেকে। খুন করা পেশা। যা বলা হবে, তাই করবে। যদি পাবলোকে ফেরত আনতে না পারে ও, খুন হয়ে যাবে তাদের হাতেই।

'হয়তো ভাবছ হারাবার কিছুই নেই,' বলল ম্যাকারভ, 'কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। তোমার ভাতিজা-ভাতিজিরা রয়ে গেছে। তুমি সফল না হলে কেউ বাঁচবে না ওরা।'

ম্যাকারভের দিকে চেয়ে রইল ইগোর দিমিতভ। পলক পড়ছে না দানবের চোখে। যা বলার বলে দিয়েছে সে। কোটের পকেটে এনভেলপ রেখে জানালা দিয়ে দূরে চেয়ে রইল ইগোর দিমিতভ। গাড়ি পৌঁছে গেছে মস্কো ইন্টারন্যাশনাল-এর কাছে। বাড়ি ফেরার সুযোগ নেই। একটু পর উঠতে হবে বিমানে।

বিশ্রাম নেয়ার কোনও উপায় তার নেই।

বাইশ

উপসাগরের ঢেউ কেটে তরতর করে চলেছে তিরিশ ফুটি ফিশিং বোট, বয়স চল্লিশ বছরেরও বেশি। এখানে-ওখানে চটে গেছে রঙ। সাগরের জল প্রায় পচিয়ে দিয়েছে পুরনো কাঠের খোল। ইঞ্জিন চালু হতেই প্রাচীন ট্রাক্টরের মত শুরু করল ফ্যাট-ফ্যাট আওয়াজ। কিন্তু থ্রটল ঠেলতেই খেলা দেখাল টুইন আউটবোর্ড মোটর, যেন খেপা ষাঁড়। এই মুহূর্তে শান্ত সাগরে তুমুল গতি তুলে পেছনে ফেলছে দীর্ঘ ঢেউ।

মিতা, পাবলো ও প্রফেসরকে দেখল রানা। সবাই হাসিখুশি। নতুন করে গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন হ্যারিসন। গত দু'দিন ধরে তাঁর ক্ষত ড্রেস করছে মিতা, দিয়েছে অ্যান্টিবায়োটিকের মেগা ডোয। বাপ-বাপ করে ভেগেছে সংক্রমণ। ঘুমের ওষুধ দেয়ায় বহু রাত পর নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পেরেছেন প্রফেসর। এখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে না পাগলাগারদ থেকে ভেগে এসেছে ভয়ঙ্কর উন্মাদ।

অন্যদের মতই, খুশি পাবলো। রানা ভেবেছে, সত্যি রাশান ক্যাপ্টেনের কথা ঠিক হলে এনার্জি ফিল্ড ভরা ব্যস্ত শহর ছেড়ে নীরব জেলেগ্রাম পুয়ের্তো আযুলে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল বেচারা। এখন চুপচাপ দেখছে শান্ত সাগর।

ওর পাশেই আছে মিতা। হঠাৎ সাগর থেকে চোখ সরিয়ে রানাকে বলল, 'এরচেয়ে ভাল বোট পেলে ভাল হতো।'

‘পাব কোথায়?’ মাথা নাড়ল রানা। ‘সবগুলোর ভেতর এটাই সবচেয়ে দ্রুতগামী।’

‘তাই?’ মৃদু হাসল মিতা।

‘ওরা এই বোট ব্যবহার করে ওয়্যাহু মাছ ধরতে।’

‘আমাদের ডাইভ গিয়ারও প্রথম সারির,’ বলল মিতা, ‘সাগরে নামলে বিপদে পড়ার কথা নয়।’

চুপ করে থাকল রানা। আধুনিক ইকুইপমেন্ট বলতে ওদের রয়েছে জিপিএস রিসিভার ও সস্তা এক সোনার ডেপ্থ্ সাউণ্ডার। এতেই চলবে। বারবার হিসেব কষে প্রফেসর স্থির করেছেন, কোথায় যেতে হবে। তাঁর হিসেব অনুযায়ী, বর্শার ডগা উপকূল থেকে সাত মাইল দূরে। সাগরের গভীরতা ওখানে কম। তবে কিছুই নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। ওদিকের সাগরতলের ডেটা কখনও পরীক্ষা করেনি কেউ। তাতে সমস্যা নেই, নিচে পুরনো ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেলে দাম্ভিক মেয়ের মত নাক উঁচু করে রাখবে ওটা।

‘আচ্ছা, পানির নিচে কেন মন্দির তৈরি করবে মায়ারা?’ জানতে চাইল মিতা। ‘ওদের দ্বারা এ কাজ তো প্রায় অসম্ভব!’

‘দুই কারণে ওদিকে হয়তো আছে মন্দির,’ বললেন প্রফেসর, ‘প্রথম কথা, ওরা ওটা সাগরে তৈরি করেনি। ডাঙায় করেছিল, পরে তলিয়ে গেছে।’ হাত দিয়ে চারপাশ দেখালেন। ‘এদিকের সাগরে প্রায়ই বদলে যায় স্রোত ও টেকটোনিক প্লেট। নিচের পাথর নরম। কিছু দিনের জন্যে জেগে উঠছে অনেক দ্বীপ, আবার তলিয়ে যাচ্ছে যখন-তখন। তা ছাড়া, হাজার বছরে পাল্টে যায় বহু কিছুই। আমাদের জানা আছে, চার-পাঁচ হাজার বছর ধরে এ এলাকায় বাস করেছে মায়ারা। ওই সময়ে তৈরি করা মন্দির সাগরে ডুবে যাওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয়।’

‘আর অন্য কারণটা কী?’ জানতে চাইল মিতা।

‘সাগরের বুকেও তৈরি করা যায় মন্দির,’ বললেন

প্রফেসর। 'তোমরা জানো, কেমিকেল রিঅ্যাকশনে শক্ত হয় কংক্রিট। সঠিকভাবে মিশ্রণ তৈরি করলে পানির নিচেও বাড়িঘর বা মন্দির তৈরি সম্ভব। বিশেষ করে যদি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায় আগ্নেয় ছাই।'

মিতার দিকে তাকালেন হ্যারিসন। 'আমরা যখন গেলাম আইলা কিউবিয়ার্তায়, জানলাম হাজার হাজার বছর আগে আগ্নেয় এলাকার মাঝ দিয়ে গেছে মায়ারা। এমনি এমনি নিশ্চয়ই তা করেনি? জরুরি কারণ ছিল কঠিন পথে যাওয়ার। তারা চেয়েছিল স্ফটিক রাখার মত ভাল জায়গা। এমন কোথাও, যেখানে তৈরি করবে টেকসই মন্দির। আগ্নেয়গিরি থেকে দরকারী সব উপাদান নিয়েছিল তারা।'

মনের চোখে মিতা দেখল, হাজার হাজার লোক টুকরি ভরা ছাই নিয়ে হাঁটছে সাগরের দিকে।

জিপিএস রিসিভারে চোখ রাখল রানা। 'আরেকটু গেলেই জানব, সত্যিই মন্দির আছে কি না।'

থ্রটল পিছিয়ে নিতেই কমে গেল বোটের গতি।

সহজ পরিকল্পনা করেছে ওরা।

যেহেতু নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছে গেছে, দু'ঘণ্টা করে গ্রিড প্যাটার্ন অনুযায়ী খুঁজবে মন্দির।

অবশ্য বিশ মিনিট তন্নতন্ন করে চারপাশ খুঁজেও কিছুই পাওয়া গেল না। আগের মতই থাকল সাগরের গভীরতা।

'এটা খারাপ নয়,' বললেন প্রফেসর হ্যারিসন। 'ভাবছিলাম আসলে কী খুঁজছি আমরা। মনে আছে, ব্রাযিলের জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল বিশাল মনুমেণ্ট। পাহারা দিচ্ছিল একদল অদ্ভুত হিংস্র জন্তু। মায়ারা চেয়েছিল মন্দিরটাকে নিরাপদে রাখতে, যদিও থাকবে ওটা সবার চোখের সামনে।'

'যাওয়া কঠিন, কিন্তু খুঁজে পাওয়া সহজ,' মন্তব্য করল মিতা।

'আমাযনের জঙ্গলে খুঁজে বের করাও সহজ ছিল না,' বললেন প্রফেসর। 'মায়ারা এমন মন্দির তৈরি করেছে, যেটা কখনও হারাবে না।'

'জন্তুগুলোর হামলায় আরেকটু হলে খুন হতাম আমরা,' বলল মিতা। 'আপনি ভাবছেন, এবারও সহজে পাওয়া যাবে, এমন কোথাও থাকবে মন্দির— কিন্তু ওটাকে রক্ষা করবে কোনও কিছু?'

'জরুরি কোনও কারণে স্ফটিক নির্দিষ্ট সব জায়গায় রেখেছে ওরা,' বললেন প্রফেসর। 'চেয়েছে এমন কোথাও রাখতে, যেখান থেকে চুরি হবে না ওসব।'

'নিশ্চয়ই জরুরি কাজেই রেখেছে,' বলল মিতা, 'ফিযিক্সের সূত্র কাজ করছে না ওগুলোর ওপর। আমাদের জানতে হবে, বাইশ ডিসেম্বরে কী করবে এসব স্ফটিক। কেউ চাইবে না, প্রচণ্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের কারণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিহীন হয়ে উঠুক পৃথিবীর মানুষ।'

ধীর গতি তুলে ধিকধিক করে চলেছে বোটের ইঞ্জিন।

সবাই চুপ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পাবলো। চলে গেল রেলিঙের পাশে। চোখ রেখেছে বামদিকের সাগরে।

বোটের গতি আরও কমাল রানা। ঘুরে আবারও চলল ফিরতি পথে। মিতা বসল হুইলে।

বিপ-বিপ আওয়াজ ছাড়ল ডেপ্‌থ্ সাউণ্ডার।

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে পাবলো। রেলিং থেকে ঝুঁকে তাকাল সাগরে। পানি ভেদ করে যেন দেখবে অনেক নিচে।

চট্ করে পোর্ট সাইড থেকে সরে স্টারবোর্ড সাইডে দৌড়ে গেল বাচ্চা ছেলেটা। আঁকড়ে ধরল রেলিং। চিৎকার করে বলল, 'সাইরেন! সাইরেন! সাইরেন!'

মনে হলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না নিজেকে। সামনে-

পেছনে দুলছে। কী মনে করে সাগরে নেমে পড়তে চাইল। কিন্তু দু'কাঁধ ধরে ওকে পিছিয়ে নিল রানা।

'শান্ত হও, বাছা!' বললেন প্রফেসর।

'সাইরেন! সাইরেন! সাইরেন!'

জোর আওয়াজে বাজতে শুরু করেছে ডেপ্‌থ্‌ গজ। সাগরের খুব অগভীর অংশে হাজির হয়েছে ওরা।

রানার মুঠো থেকে নিজেকে ছুটিয়ে নিতে চাইছে পাবলো। ঘুরে কামড় বসাতে চাইল গত কয়েক দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর হাতে।

বাচ্চা ছেলেটাকে শূন্যে তুলল সতর্ক রানা। ওর থুতনির নিচে ঝুলতে ঝুলতে চিৎকার করল পাবলো, 'সাইরেন! সাইরেন! সাইরেন! সাইরেন!'

'মিতা, বোট সরিয়ে নাও,' বলল রানা।

থ্রটল ঠেলে দিতেই লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল বোট।

ঘাড় কাত করে পেছনের সাগর দেখল পাবলো। নরম সুরে বলল, 'সাইরেন। সাইরেন।'

কিছু দূর যাওয়ার পর বোটের গতি কমাল মিতা। বুকের কাছ থেকে পাবলোকে ডেকে নামাল রানা।

দৌড়ে গিয়ে মিতার কোমর জড়িয়ে ধরল বাচ্চা ছেলেটা।

'রাশানরা জটিল কোনও অপারেশন করেছে ওর মগজে,' রানাকে বলল মিতা। হাত বুলিয়ে দিল পাবলোর মাথায়। বসে কোলে নিল ছেলেটাকে। 'বলো তো, বাবু সোনা, সাইরেন আসলে কী জিনিস?'

ঘাড় কাত করে অবাক চোখে ওকে দেখছে পাবলো, মুখে কোনও বোল নেই।

'ঠিক আছে, কিচ্ছু হয়নি, তাই না?' বলল মিতা। পাবলো অস্বস্তির ভেতর পড়েছে বলে মনে হচ্ছে ওর।

'তুমি ঠিক আছ তো, পাবলো?' জানতে চাইল রানা।

জবাব দিল না ছেলেটা। আবারও সানগ্লাসের দুই ডাঁটি ঠুকছে ঠুক-ঠাক শব্দে।

'ওর কোনও ক্ষতি হয়নি তো?' জানতে চাইলেন প্রফেসর হ্যারিসন।

মন খারাপ হয়ে গেছে মিতার। নিচু স্বরে বলল, 'জানি না।'

'তবে আপনি বোধহয় পেয়ে গেছেন আপনার বর্শার ডগা,' মন্তব্য করল রানা। ঘুরিয়ে নিয়ে একটু দূরে বোট রাখল ও।

মুখে কিছু না বলে কাজে নেমে পড়ল মিতা। কতক্ষণ সাগরতলে থাকবে, কেমন হবে এয়ার মিক্সচার, বা কত সময় লাগবে ডিকমপ্রেশনে, এসব বুঝতে ডাইভ কমপিউটার ব্যবহার করছে।

এদিকে শার্ট খুলে উদোম গায়ে ইকুইপমেন্ট লকার থেকে গিয়ার বের করছে রানা।

একবার মুখ তুলে তাকাল মিতা।

যুবকের চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বুক, সরু কোমর, বটগাছের মত উরু— পৌরুষদীপ্ত, পেশিবহুল সুঠাম দেহ দেখে রক্তিম হলো মিতা।

ভারী অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বোটের পেছনে রাখল রানা।

বেখেয়াল রানার দিকে আবারও চোরা চোখে তাকাল মিতা। ওই দেহে নানান অংশে পুরনো ক্ষতের দাগ। মিতার ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে মানুষটার ক্ষতগুলো স্পর্শ করে।

'মিতা, মন শক্ত রাখো,' বললেন প্রফেসর হ্যারিসন। 'রানার মত মানুষকে কখনও বাঁধা যায় না। ও মুক্ত বিহঙ্গ।'

'তাই আসলে, স্যর,' মুখ নিচু করে নিল মিতা। গত কয়েক দিন জাহাজে খুব কাছে ছিল রানা, কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একটিবারও হাত বাড়ায়নি ওর দিকে।

'তবে, তাই বলে হতাশ হয়ো না,' দর্শনের বুলি ঝাড়লেন হ্যারিসন, 'আমার বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ চোখে ধরা পড়েছে,

গোপনে গোপনে পাকা চোরের মত তোমাকে দেখছে ছোকরা।'

মাথা নিচু করে হাসল মিতা, লজ্জা গোপন করার ব্যর্থ প্রয়াস। চোখ তুলে দেখল: এখনও মুচকি হাসি লেগে আছে প্রফেসরের ঠোঁটে। আবার মনোযোগ দিল সে কমপিউটারের স্ক্রিনে। ওখান থেকে চোখ না সরিয়ে নিচু গলায় বলল, 'খবরদার! ও যেন টের না পায়!'

হাসি বেড়ে গেল বদমাস বুড়োর।

যন্ত্র ঠিক হয়ে থাকলে এখানে সাগরতল বালিময়, গভীরতা আশি ফুট। সাগরের যেখানে এসে চেঁচিয়ে উঠেছিল পাবলো, ডেপ্‌থ্‌ ফাইণ্ডার অনুযায়ী পানির গভীরতা ওখানে পঞ্চান্ন থেকে সত্তর ফুট। সেডিমেন্ট থেকে ওপরে উঁচু হয়ে আছে কিছু। হয়তো রিফ, তলিয়ে যাওয়া দ্বীপ, অথবা মানবসৃষ্ট কোনও দালানকোঠার ধ্বংসাবশেষ।

হাতের ইশারা করছে রানা।

বোটের সামনে চলে গেল মিতা। আড়ালে সরে গিয়ে পরল ত্বকের মত পাতলা ডাইভ স্কিন লাইক্রা। ওটা নিয়োপ্রেন ওয়েট সুটের মতই, তবে ব্যবহার হয় উষ্ণ জলে। নিয়োপ্রেনের মত ভেসে ওঠে না, ছড়েও দেয় না ত্বক।

মিতার কোমল দেহে রাবারের গ্লাভসের মত এঁটে বসেছে পোশাকটা। গোড়ালির কাছে বেল্ট দিয়ে বেঁধে নিল চার ইঞ্চি ফলার ছোরা। ফিরল বোটের পেছনে।

রানাও তৈরি, পরনে ডাইভ শর্ট্‌স্‌ ও র‍্যাশ-গার্ড শার্ট। পরীক্ষা করে দেখছে ফুল ফেস ডাইভিং মাস্ক। সঙ্গে রয়েছে রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম এবং মিনিয়েচার হেড-আপ ডিসপ্লে। শেষের জিনিসটা আধুনিক ফাইটার বিমানের পাইলটের মুখোশের মতই ডানদিকে দেখাবে সাগরের গভীরতা, সময় ও কমপাস।

একেকটা মাস্কের দাম হাজার ডলার। এ ছাড়া, আরও

আছে দুই ডাইভারের জন্যে অ্যালিউমিনিয়ামের দুই ট্যাঙ্ক ও প্রপালশান ভেহিকেল বা ডিপিভি। সবমিলে খরচ পড়েছে প্রায় দশ হাজার ডলার।

রানার এক মেক্সিকান বন্ধুর মাধ্যমে কেনা হয়েছে বলে দাম পড়েছে কম। গতকাল বিকেলে সব পৌঁছে দিয়েছে সে পুয়ের্তো আযুল গ্রামে।

স্ট্র্যাপ দিয়ে মিতার পিঠে ট্যাঙ্ক বেঁধে দিল রানা।

'আমরা এই ডাইভের জন্যে নাইট্রক্স ব্যবহার করছি,' বলল মিতা।

গভীর পানিতে বেশিক্ষণ রয়ে যেতে ব্যবহার করা হয় বিশেষ ওই মিক্সচার— তৈরি হয়েছে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশিয়ে।

'ফোরটি পার্সেন্ট মিক্সচার?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল মিতা।

মাত্র আশি ফুট নিচে নামতে প্রয়োজন পড়ে না নাইট্রক্স, কিন্তু সাগরতলের ওই সাইটের ভেতর অংশ কতটা নিচে গেছে জানা নেই, তাই ওই মিক্সচার ব্যবহার করছে ওরা। মন্দিরের ভেতর পারতপক্ষে দ্বিতীয়বার ফিরতে চায় না।

'ডিকমপ্রেশন ছাড়াই সত্তর মিনিট থাকতে পারব,' বলল মিতা, 'সবমিলে পারব দু'ঘণ্টা। তবে সেক্ষেত্রে ওঠার সময় দিতে হবে পুরো আধঘণ্টা।'

ডাইভ ঘড়ি চালু করে পিঠে ট্যাঙ্ক ঝুলিয়ে নিল রানা। প্রফেসর হ্যারিসনকে বলল, 'নোঙর ফেললেও এদিক-ওদিক চলে যেতে পারেন। যেখানে আছি, সেটা জিপিএস-এ তুলে দিয়েছি। কিছুই ডিলিট করবেন না, নইলে ঠিক জায়গায় ফিরে তুলে নিতে পারবেন না আমাদেরকে।'

'তোমাদের মাস্কে না রেডিও আছে?' বললেন হ্যারিসন।

'বোটের ট্র্যান্সমিটার শক্তিশালী, কিন্তু আমাদেরগুলো অনেক

দুর্বল,' বলল রানা। 'মিতা আর আমি নিজেদের কথা শুনব, কিন্তু তিরিশ ফুট গভীরে যাওয়ার পর আপনার সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারব না।'

মাথা দোলালেন প্রফেসর।

রানা ইশারা করতেই বোটের পাশে সাগরে নামল মিতা। আগেই পরে নিয়েছে মাস্ক। ওর পর পর নেমে পড়ল রানা। সাগরের পানি বেশ উষ্ণ। টর্পেডো আকৃতির ডিপিভি পরীক্ষা করল ওরা। যন্ত্রটার সামনের দিকে দু'পাশে খাটো ডানা, একটু পেছনে হ্যাণ্ডেলবার। চেপে বসে চালাতে হবে মোটর সাইকেলের ভঙ্গিতে।

ঝকঝকে নীলচে উপসাগরে তলিয়ে গেল ওরা। হেড-আপ ডিসপ্লে চালু করল রানা। চোখের সামনে দেখল উজ্জ্বল কিছু সবুজ সরল রেখা, যেন খেলতে বসেছে ভিডিয়ো গেম।

ডেপ্থ্: ৪, বেয়ারিং: এনএনওডাব্লিউ (৩২৪), টেম্প: ৮৮, টাইম ইল্যাপ্স: ১:১৩।

'কোন্ দিকে?' জানতে চাইল মিতা।

'বোটের তলা দিয়ে ওয়ান-ও-সিক্স বেয়ারিং-এ।' ঝাঁক থেকে সরে যাওয়া ডলফিনের মতই বামে বাঁক নিয়ে রওনা হলো রানা।

পিছু নিল মিতা। বোটের নিচ দিয়ে চলেছে আধমাইল দূরের বালির ঢিবি লক্ষ্য করে।

পানির তলা দিয়ে উড়ে যাওয়ার অনুভূতি নিয়ে রেডিয়োতে মিতার কথা শুনল রানা।

'সত্যিই কি সামনে মন্দির পাব?'

'চলো, গেলেই দেখব কী আছে।'

চল্লিশ ফুট গভীরতায় নেমে এল ওরা।

নিচের বালি সত্যিকারের রূপার মতই রুপোলি, কিন্তু অত গভীরে কমে গেছে সূর্যের আলো।

চোখের কোণে মিতাকে থামতে দেখল রানা।

ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা।

'কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল রানা।

দূরে আঙুল তাক করল মিতা। 'হাঙর!'

দেখা দিয়েছে বিশাল এক দানব!

'হাতুড়িমাথা হাঙর,' ফিসফিস করল মিতা।

'সাধারণত মানুষের ওপর হামলা করে না,' বলল রানা।

ভয় পেয়ে ঢোক গিলল মিতা। ওই হাঙরটা দৈর্ঘ্যে অন্তত বিশ ফুট, ওজন এক হাজার পাউণ্ড। 'কিন্তু সত্যি যদি...' শুরু করেও চুপ হয়ে গেল সুন্দরী। দূরের অন্ধকার থেকে এল আরও দুটো হাঙর। দু'সেকেণ্ড পর আরও একটা। ওটার লেজ ধরে এল আরও দুটো। 'আগে কখনও দেখিনি, ঝাঁক বেঁধে চলে!'

অলসভঙ্গিতে সাগরের ওপরের দিকে উঠছে হাঙরের পাল।

'এসো,' থ্রটল মুচড়ে রওনা হয়ে গেল রানা।

'কোথায় যাবে?' চাপা স্বরে বলল মিতা।

'ওদেরকে অনুসরণ করব,' বলল রানা।

'ওদেরকে বিরক্ত না করলে ভাল হতো না?' আপত্তি তুললেও রানার পিছু নিল মিতা।

ওদের দিকে খেয়াল নেই হাঙরের ঝাঁকের। ধীর গতি তুলে বামে বাঁক নিল।

মিতার মনে পড়ল, পানিতে সামান্য কম্পন হলেও সতর্ক হয় হাঙর। ভয় চেপে শুকনো গলায় বলল ও, 'আমরা বরং ওদের পিছু না-ই বা নিলাম?'

চমকে গিয়ে থামল রানা।

ধীর গতি তুলে ওদের দিকে আসছে কিছু হাঙর। এবার চার-পাঁচটা নয়, তৈরি করেছে সাগরতলে কয়েকটা হাইওয়ে। সংখ্যায় অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশটা! খুলে বসেছে এবড়োখেবড়ো, হলদেটে মুলোর দোকান!

নিঃশব্দে সাগরের মেঝের দিকে চলল রানা। চুপচাপ পিছু নিল মিতা। বালিতে নেমে যাওয়ার পর সূর্যের আলোয় ওপরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখল ওরা। আধমাইল বৃত্তাকার এক পথে ঘুরছে ঝাঁক ঝাঁক হাঙর।

'আমি কোনও সাবমেরিনে থাকলে এত ভয় পেতাম না,' বলল মিতা।

'আগেও দেখেছি দল তৈরি করে, কিন্তু একসঙ্গে আগে কখনও এতগুলো দেখিনি,' বলল রানা।

'সংখ্যায় কত হবে?'

'এক শ'র বেশি।'

কাছাকাছি থাকছে সাত-আট ফুটি হাঙর, দূরত্ব বজায় রাখছে বড়গুলো। হাঙরের তৈরি বৃত্তের মাঝে চোখ গেল রানার। ওখানে আছে প্রবালের টিলা, মাঝে পাথর ও কাদার উঁচু স্তূপ। ঘুরে ঘুরে পাক দিচ্ছে হাঙরের ঝাঁক। সাধারণ জ্ঞানের বইয়ের তথ্য মনে পড়ল রানার। হ্যামারহেড হাঙরের স্নাউটে থাকে সেনসিটিভ অর্গ্যান— অ্যামপিউলা অভ লরেনযিনি। ওই নার্ভের একগাদা তন্তুর কারণে ওরা টের পায় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ অথবা পাল্‌স্।

সাগরতলে অদ্ভুত ওই স্ফটিকের এনার্জি টের পেয়েই হাজির হচ্ছে হাঙরের দল। মিতার কাছে শুনেছে রানা, বেয়ারিং সাগরে কী হয়েছিল পাবলোকে বহনকারী বোটের।

জ্বলন্ত প্রদীপের শিখাকে ঘিরে যেভাবে ঘোরে উড়ন্ত পোকা, সেভাবেই মায়া মন্দির ঘিরে ঘুরছে ঝাঁক ঝাঁক হাঙর, বুকে কীসের এক হুতাশ।

ওপরে ঘুরন্ত হাঙরের ঝাঁক একবার দেখে নিয়ে, প্রবালে ভরা মায়া মন্দির দেখল রানা। ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'ওদিকের প্রবালের রিফে যাব। স্ফটিক থাকলে, ওটা আছে প্রাচীন কোনও মন্দিরের ভেতরে।'

হাঙরের ওপর চোখ রেখে প্রবাল প্রাচীরের দিকে চলল রানা। ওকে অনুসরণ করল মিতা। কাছে গিয়ে দেখল ওরা, পাথরের বিশাল সব চৌকো চাঁই দিয়ে তৈরি মন্দির। প্রতিটি পাথর নিখুঁতভাবে কাটা। ওজন রাখছে একটা আরেকটার ওপর।

পাথুরে দেয়ালের পাশ দিয়ে চলল রানা। 'বাইরের দিক অক্ষত, ভেতরে ঢুকতে হবে।'

'প্রফেসর বলেছেন: খুঁজে নেয়া কঠিন, তবে হারিয়ে ফেলা আরও কঠিন,' বলল মিতা।

'মন্দিরের নিরাপত্তার জন্যে ভাল ব্যবস্থা করেছে মায়ারা,' হাত তুলে সাগর সমতলে হাঙরের মিছিল দেখাল রানা। আগেও দেখেছে এমন পাথুরে মায়া ডিযাইনের স্থাপত্য। হায়ারোগ্লিফিক নেই, তবে পাথরের বুকে খোদাই করা আছে দুটো সরীসৃপ।

রানাকে বলল মিতা, 'চলো, দেখি ঢোকা যায় কি না।'

উঁচু দালানের ওপর দিয়ে ভেসে গেল ওরা। একটা চোখ রেখেছে হাঙরের দিকে। মন্দিরের ওদিকে পৌঁছে নামল বালির মেঝেতে।

সামনেই পাথুরে দেয়ালে সরু ফাটল। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ভেতরে আলো ফেলল রানা। 'মনে হচ্ছে সরু টানেল।'

সুড়ঙ্গের দু'পাশের দেয়াল প্রায় বুজে গেছে প্রবালে।

একবার কৌতূহলী চোখে রানাকে দেখল মিতা।

ওর বাহু ধরল রানা। 'ঢুকতে পারবে, কিন্তু ভেতরে হয়তো আঁটবে না তোমার ট্যাঙ্ক।'

উত্তেজিত মিতা ভুলে গিয়েছিল পিঠে রয়েছে জোড়া-ট্যাঙ্ক। ও দুটো ওর কোমরের চেয়ে চওড়া। পিঠ থেকে ট্যাঙ্ক নামাল ও।

'বাড়তি কোনও ঝুঁকি নেবে না,' নরম সুরে বলল রানা।

'আমার ভয় কীসের, কাছেই তো আছে ওস্তাদ,' মৃদু হাসল

মিতা। 'চট্ করে একবার ওদিকটা দেখেই ফিরব।' রেগুলেটর খুলে ট্যাঙ্কদুটো পাথুরে মেঝেতে রাখল। ফ্লিপার নেড়ে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে। তবে পনেরো ফুট যেতেই সংকীর্ণ হয়ে উঠল টানেল।

দম ফুরিয়ে আসতেই বেরিয়ে এল। ট্যাঙ্কের সঙ্গে আটকে নিল রেগুলেটর। 'পাশ করেছি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' মৃদু হাসল রানা।

বারকয়েক বড় করে শ্বাস নিল মিতা, চাইছে ফ্রি ডাইভারদের মত হাইপারঅক্সিজেনেট করতে। কপাল ভাল হলে তিন মিনিট টিকবে পানির নিচে। এতে ঝুঁকি আছে, কিন্তু প্রফেসর হ্যারিসনের অনুবাদ, হিসেব-নিকেশ, পাবলোর উত্তেজিত হওয়া আর হাঙরের উপস্থিতি ওকে জানিয়ে দিচ্ছে, ওরা পেয়ে গেছে স্ফটিকের দ্বিতীয় মন্দির।

রেগুলেটর খুলে আবারও টানেলে ঢুকল মিতা। অলিম্পিকের সাঁতারুদের মত চলছে দুই পা। পৌঁছুল টানেলের সংকীর্ণ অংশে।

টানেলের দু'দেয়ালে ছোটবড় সব মরা প্রবাল।

গা বাঁচিয়ে সাবধানে এগোল মিতা।

'অপেক্ষা করো, আমিও আসছি,' পেছন থেকে বলল রানা।

বাতাস অপচয় অনুচিত, তাই চুপ থাকল মিতা। আরেক ফুট যেতেই পাঁজরের হাড়ে কামড় বসাল দু'পাশের দেয়ালের প্রবাল। সামনের পথ আরও সরু।

এবার ফিরতে হবে। কিন্তু পাথুরে টানেলে ঘুরতেই পারল না মিতা, দু'দিক থেকে চেপে ধরেছে মৃত প্রবালের ধারালো, শক্ত সব ডাল। তলোয়ারের ডগার মত ঠেকে গেছে বুক ও পিঠে। এদিকে ফুসফুসে শুরু হয়েছে ব্যথা। ধড়াস্-ধড়াস্ লাফ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড। জোর খাটাতেই মুটমুট শব্দে ভাঙল কিছু মরা প্রবাল, কিন্তু তার ফলে খুলল না ফেরার পথ।

‘আসছি,’ পেছন থেকে জানাল রানা।

ঘাড় কাত করে মিতা দেখল, হঠাৎ ভুস্ ভুস্ শব্দ তুলল কিছু বুদ্বুদ। ট্যাঙ্ক বাইরে রেখে টানেলে ঢুকেছে রানা।

মিতা আবছাভাবে টের পেল, কোমর ধরে টানছে কেউ। কিন্তু ওকে ছাড়ছে না মরা প্রবাল। চিরে দিচ্ছে ত্বক।

ভয় পেয়ে বলল মিতা, ‘একমিনিট!’

রানাও বুঝতে পেরেছে বিপদটা, একবার রক্ত বেরোলেই তা মিশবে সাগরে। ওই লোভনীয় গন্ধ পেলেই হামলা করবে হাঙরের পাল, বাঁচার উপায় থাকবে না ওদের। এবার কী করবে ভাবতে গিয়ে মিতার কোমর থেকে হাত পিছিয়ে নিল রানা।

ফুসফুসের প্রচণ্ড চাপ অসহ্য হতেই, মেয়েটার নাক-মুখ দিয়ে বেরোল একরাশ বুদ্বুদ। রানা খেয়াল করল, ছাতে আটকে না গিয়ে নিঃশব্দে ফেটে গেছে বুদ্বুদ!

পেছন থেকে মিতাকে আটকে রাখা মরা সব প্রবাল মট-মট করে ভাঙতে লাগল রানা। এদিকে কয়েকবার খাবি খেল দিশেহারা মিতা, গলগল করে পেটে ঢুকল নোনা জল। হঠাৎ শিথিল হলো ওর বিবশ দেহ। চোখ জুড়ে নামল ঘুটঘুটে আঁধার।

চোখা আরও কিছু প্রবালের শাখা ভাঙতেই শিথিল মিতাকে ছুটিয়ে নিতে পারল রানা। সামনে বেড়ে দু'হাতে ওর সরু কোমর ধরল ও, তুলে নিয়ে যেতে লাগল ছাতের দিকে। চাপা স্বরে বলল, ‘একটু ধৈর্য ধরো! ওপরে বোধহয় বাতাস আছে!’

কোনও সাড়া দিল না অচেতন মিতা।

কয়েক সেকেণ্ড পর ছাতের কাছে ভেসে উঠল রানা। ভাবল, এই মন্দিরে বিষাক্ত গ্যাস থাকলে নির্ঘাৎ মরব। তবে দম নিতেই বুক ভরে উঠল তাজা অক্সিজেনে। ছাত থেকে কয়েক ফুট নিচে রানার কাঁধের পাশেই শেষ হয়েছে পুরু এক প্রাচীর, ওদিকে প্রশস্ত পাথুরে চাতাল। বেশ ওপরে ওটার ছাত। অচেতন

মিতাকে চাতালে তুলল রানা। পানি ছেড়ে উঠে এল নিজেও।
হ্যাঁ, ওরা পৌঁছে গেছে দুই নম্বর মায়া মন্দিরের অভ্যন্তরে!

তেইশ

দু'পা চেয়ারে তুলে মৌজ করে রেডিয়ো শুনছে ফলক্যান বোট রেন্টালের এজেন্ট। মাথায় কাত করে বসানো বেসবল হ্যাট। কিছুতেই চোখে রোদ পড়তে দেবে না। গান শুনতে শুনতে কান আরও খাড়া হলো তার।

কাঠের জেটিতে পায়ের আওয়াজ, এই বুঝি এল কাস্টোমার!

মুখ তুলে তাকাল এজেন্ট। অবাক হতে হলো তাকে। এগিয়ে আসছে বেশ কয়েকজন চাইনিজ। পরনে কালো স্ল্যাক্স আর গাঢ় নীল শার্ট। মনে হলো না কেউ মাছ ধরতে এসেছে।

'হোলা,' নরম সুরে বলল এজেন্ট।

তিন চাইনিজের মধ্যে সবচেয়ে বড়জন ঢুকে পড়ল বুথে। অন্যরা দাঁড়িয়ে পড়েছে বাইরে।

'সকালে ভাড়া দিয়েছ একটা বোট,' এজেন্টকে জানাল প্রকাণ্ডদেহী চাইনিজ। 'এক বাদামি লোক, এক কালো লোক, এক সুন্দরী আমেরিকান মেয়ে আর এক বাচ্চা ছেলে।'

'কত মানুষকেই তো বোট ভাড়া দিই,' বলল এজেন্ট।

'ওদেরকে তোমার মনে থাকার কথা। ওই ছেলে ওদের কেউ নয়।'

'মনে পড়েছে,' মাথা দোলাল এজেন্ট। 'ছেলেটা কারও

সঙ্গে কথা বলে না।'

খুশি হয়েছে চাইনিজ। পকেট থেকে বের করল এক বাণ্ডিল এক শ' ডলারের নোট। ওখান থেকে দু'শ ডলার নিয়ে এজেন্টের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'তোমার কি মনে হয়, ওদের সঙ্গে অস্ত্র আছে?'

'দু'একটা স্পিয়ার গান থাকতেও পারে,' বলল এজেন্ট।

'গেছে কোথায় ওরা?'

'ওয়্যাহু মাছ ধরতে।' সুন্দরীর বাদামি সঙ্গীর কথা মনে পড়তেই বলল এজেন্ট, 'সঙ্গে নিয়েছে ডাইভিং ইকুইপমেন্ট।'

এবার তার হাতে দেয়া হলো আরেকটা এক শ' ডলারের নোট। এজেন্ট বুঝে গেল, আজ ওর দারুণ দিন!

'কোনওভাবে ট্র্যাক করতে পারবে?'

মাথা নাড়ল এজেন্ট। 'না। আমরা বোটের জন্যে ওদের কাছ থেকে টাকা জমা রেখেছি। ওটা নষ্ট হলেও ক্ষতি হবে না কোম্পানির। তবে একটা কথা, ওদের সঙ্গে যে ফিউয়েল আছে, যেতে পারবে বড়জোর পঞ্চাশ মাইল। তা ছাড়া, অন্য ডকগুলোয় খবর নিলেই জানব কোন্ দিকে গেছে।'

একবার কেশে নিল ধেড়ে চাইনিজ। 'তা হলে কোন্ দিকে গেছে ওরা?'

'বন্দর থেকে বেরিয়ে সোজা উত্তরদিকে।'

এজেন্টের হাতে আরেকটা এক শ' ডলারের নোট দিল চাইনিজ। 'আরও কিছু জানলে বলো। তারপর দেবে তোমাদের কোম্পানির সেরা বোট।'

'না, আর কিছু জানি না,' কাউন্টারের তাক থেকে চাবি নিল এজেন্ট। যেটা দিচ্ছে, ওটার আছে পাইলট হাউস ও ইনবোর্ড মোটর। ব্যবহার করা হয় সোর্ডফিশ শিকারে। বাদামি লোকটার বোটের মত একই গতি তুলতে পারবে বিশেষ এই বোট।

চব্বিশ

পায়ের সামান্য আওয়াজও প্রতিধ্বনি তুলছে মায়া মন্দিরের ভেতর। ঘুটঘুটে আঁধার। লেড ফ্ল্যাশলাইটের বাতি জ্বালল রানা।

একটু দূরে উঁচু গম্বুজ। এই ঘর বেশ বড়, চারদিকে পাথরের দেয়াল। সামনেই পাঁচ ধাপ সিঁড়ি নেমেছে শুকনো কোনও সুইমিং পুলের মত জায়গায়। মাঝে কাঠের বড় এক কফিন।

ফ্ল্যাশলাইট মেঝেতে রেখে মিতাকে কাত করে শোয়াল রানা, চাপড় দিতে লাগল পিঠে।

একটু পর খুকখুক করে কেশে উঠল মিতা। মুখ থেকে বেরোল দুই ঢোক পানি। তারপর বমি করল। খুলে গেছে চোখ। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে উঠে বসল। তিক্ত চেহারা।

'খুব অসুস্থ লাগছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'নাইট্রোজেন নারকোসিস। বলা উচিত অক্সিজেন নারকোসিস। এই মিক্স ব্যবহার করেছি এর আগে মাত্র একবার। তাই বুঝিনি কী করা উচিত, আর কী নয়। ভেবেছি বেরোতে পারব টানেল ছেড়ে।'

'সত্যিই বেরোতে পেরেছ, তা হলে আর চিন্তা কী,' হালকা সুরে বলল রানা।

লজ্জা পেয়ে ওর বাহুতে হাত রাখল মিতা। 'অনেক ধন্যবাদ। আজ তুমি না বাঁচালে পৌঁছে যেতাম ওপারে।'

'তাতে কমে যেত পৃথিবীর অনেক সৌন্দর্য,' মৃদু হাসল রানা।

'বেশ কিছু দিন ধরেই ঘুমাতে পারি না,' বলল মিতা। 'চিনে অনেক ধরনের ড্রাগ দিয়েছে। ওদের হাতে বন্দি ছিলাম সব মিলে দশ দিন। তবে মনে রাখতে পেরেছি মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা।'

'শরীর থেকে ড্রাগ যেতে সময় লাগবে,' বলল রানা। টর্চ তুলে চারপাশে আলো ফেলল ও।

নিমজ্জিত মন্দিরের স্থাপত্য দেখার মত। ছাত নিখুঁত পাথরে তৈরি, কারুকাজ করা। হাজারো বছর ধরে আটকে রেখেছে খাঁটি বাতাস। এখানে পৌঁছুতে হলে ব্যবহার করতে হবে সরু টানেল। আপাতত হামলা করতে পারবে না হাঙর।

একপাশে আলো পড়তেই ওরা দেখল হায়ারোগ্লিফ্স্।

'এখানে এলে খুবই খুশি হতেন প্রফেসর,' বলল মিতা।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে মস্তবড় কফিনের পাশে থামল রানা। পিছু নিয়েছে মিতা।

'ঢাকনি খুলে দেখব,' বলল রানা। 'তোমার আপত্তি নেই তো?'

জবাব না দিয়ে ওর সঙ্গে হাত লাগাল মিতা। খুব সাবধানে ভারী কাঠের ঢাকনি তুলে মেঝেতে নামিয়ে রাখল ওরা।

শান্ত সাগরে বোটে চুপচাপ বসে আছেন প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন। মন খারাপ। অবাক কাণ্ড, রানা বিদায় নিতেই ভীষণ ভয় লাগছে তাঁর। বাচ্চা ছেলেটা একটু দূরে বসেছে। কিছু জানতে চাইলে জবাব দেয় না। সত্যিই, তিনি বড় একা।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর পর দেখছেন জিপিএস স্ক্রিন। নিশ্চিত হতে চাইছেন হালকা বাতাস বা স্রোত দূর থেকে দূরে সরিয়ে নেবে না তাঁকে। আবছা দেখছেন সবজেটে তীর। বারকয়েক

মনে হয়েছে, বিনকিউলার চোখে তুলে দেখবেন ওদিকটা। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছেন। মন বলেছে, বিনকিউলার ব্যবহার করলেই হাজির হবে মস্ত কোনও বিপদ।

আরও কিছুক্ষণ পর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে দেখলেন তীর।

না, ওদিকে কেউ নেই।

আবার মন দিলেন পাবলোর ওপর। বোটের মাঝখানে বসে আছে ছেলেটা, পরনে লাইফ জ্যাকেট।

'বুঝলে,' বললেন প্রফেসর, 'আমি বোধহয় পাগলই হয়ে যাচ্ছি। চোখের সামনে কীসব দেখি। আবার শুনতেও পাই।' ছেলেটা দেখছে সানগ্লাসের ডাঁটি। খুট-খুট আওয়াজ তুলল। 'না, ছেলে, আমি এত কিছু জেনেও হেরে গেলাম তোমার ওই প্লাস্টিকের সানগ্লাসের ডাঁটির কাছে!'

উপসাগরের দূরে বিনকিউলার তাক করলেন হ্যারিসন।

মাঝদুপুর। রুপালি-নীল আকাশ ঝরাচ্ছে গনগনে রোদ। তবে পুবে বিশাল এক মেঘ। অনেক দূরে। ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলছে চারপাশ। এখন ঝড় না এলেই বাঁচা যায়!

'কী হলো, বাপু?' আনমনে বললেন প্রফেসর। 'তোমরা কি সারাদিন সাগরের নিচে পার করে দেবে?'

নতুন করে শুরু হলো ঝিরঝিরে হাওয়া।

আজ কথা বলছ না কেন, হান্না? আনমনে ভাবলেন প্রফেসর। জবাব দিল না কেউ। উদাস হয়ে পাবলোকে দেখলেন তিনি। ওর দিকেই ঘুরে তাকাল ছেলেটা। বোধহয় কিছুই শোনেনি।

'কথা বলো না কেন?' জানতে চাইলেন হ্যারিসন।

এবার শুনলেন গম্ভীর আওয়াজ। ওটা এসেছে পুবের মেঘ থেকে। দূরে ওই মেঘ। ছড়িয়ে পড়ছে দক্ষিণ আকাশে। বিনকিউলার দিয়ে আবার উপকূল দেখলেন প্রফেসর। ঝড়

আরম্ভ হলে তীরে পৌঁছানো কঠিন হবে।

নতুন কিছু চোখে পড়ল তাঁর।

দুটো বোট। দ্রুতগামী। আসছে তাঁদের দিকেই। সময় লাগবে পৌঁছুতে। এখনও আছে অন্তত পাঁচ বা ছয় মাইল দূরে।

'সর্বনাশ!' বিনকিউলার নামিয়ে ফিসফিস করলেন প্রফেসর। 'এবার কী করব?' পাবলোকে দেখলেন।

পাত্তা দিল না পিচ্চি।

অগ্রসরমাণ দুই বোটের ওপর আবারও চোখ রাখলেন হ্যারিসন। ওগুলোর পেছনে মোরগের লেজের মত উঠছে পানি। হয়তো এসব বোট টুরিস্টদের, কিন্তু প্রফেসরের মনে হলো, এরা আসছে তাঁদের বারোটা বাজাতেই!

চেয়ার ছেড়ে পাবলোকে তুলে নিলেন হ্যারিসন, প্যাসেঞ্জার সিটে বসিয়ে ভালভাবে বেঁধে দিলেন সিটবেল্ট। পরক্ষণে গিয়ে চালু করলেন ইঞ্জিন।

গভীর মনোযোগ দিয়ে লাশটা দেখছে রানা ও মিতা। ওটা সাধারণ সাদা গজ কাপড় দিয়ে মোড়ানো। কফিনও আহামরি কিছু নয়। দু'পাশে দুটো করে দণ্ড, বয়ে নেয়ার জন্যে।

লাশের করোটির ওপরের সাদা কাপড় খুলে ফেলল মিতা।

লোকটার চোয়াল ছিল জাগুয়ারের চোয়ালের মতই।

মায়ান রাজা। কিংবা ভিনগ্রহের কেউও হতে পারে।

কফিনের একদিকের তাকে রাজকীয় পোশাক। সূক্ষ্ম সোনার তার দিয়ে কারুকাজ করা। রাজার একহাত বুকের ওপর। মুঠোর ভেতর পানপাত্র। নাভির ওপর কাঁচের মত কিছু। ওটা চিনে ফেলল রানা ও মিতা। ব্রাযিলে পাওয়া স্ফটিকের মতই একই জিনিস। আকারে হবে আপেল বরইয়ের সমান।

রানার ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ঝিকমিক করছে স্ফটিক। সতর্ক চোখে লাশের আশপাশ ভাল করে দেখে নিল ও।

না, কোথাও বুবি ট্র্যাপ নেই।

একবার রানার চোখে চোখ রাখল মিতা, তারপর লাশের নাভির ওপর থেকে তুলে নিল স্ফটিক। ওর মনে হলো, জিনিসটা অস্বাভাবিক ভারী। বেশ উষ্ণ। বিচ্ছুরণ করছে কোনও শক্তি। অন্তরটা বলল, কীভাবে যেন অনেক ক্ষমতা পেয়ে গেছে ও।

'তুমি ঠিক আছ তো?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' মৃদু স্বরে বলল মিতা। 'ভাবতেই পারছি না, যেজন্যে এত দূরে এসেছি, পেয়ে গেছি সেটা।' সাবধানে বেল্ট থেকে পাউচ নিয়ে ওটার ভেতর স্ফটিক রাখল ও। পাউচ ঝুলিয়ে নিল বেল্টে। এবার ব্যবহার করল প্রাচীন আমলের ফিল্ম ক্যামেরার মত দেখতে একটা ক্যামেরা। ওটা দিয়ে তুলছে ছবি।

ব্রাযিলের জঙ্গলে এক পর্যায়ে নষ্ট হয়েছিল রানাদের প্রায় সব বৈদ্যুতিক ইকুইপমেন্ট। তবে এই সেকেলে যন্ত্রে বৈদ্যুতিক কিছুই নেই।

মিতার ছবি তোলার জন্যে ঠিক দিকে আলো ফেলল রানা। কফিন, ঢাকনি, লাশ ও পোশাকের ছবি নিল মিতা। বাদ পড়ল না হায়ারোগ্লিফ্স্। এরপর মন দিল মন্দিরের অন্যদিকে।

সবকিছুরই ফিল্ম নেয়ার পর রানার দিকে তাকাল মেয়েটা।

মাথা দোলাল রানা। এবার যেতে হবে।

সাগর সমতলে নিরাপদে উঠতে হলে চাই অন্তত বিশ মিনিট ডিকমপ্রেশন। অথচ বাইরে একপাল হাঙর।

ক্যামেরা গুছিয়ে রাখছে মিতা।

টানেলে চলে গেল রানা। একটু পর ফিরল চাতালের পাশে। দু'হাতে ওদের দু'জনের এয়ার ট্যাঙ্ক।

ডাইভিঙের জন্যে তৈরি হয়ে নিল ওরা।

আরেকবার প্রেশার গেজ দেখল রানা। 'বিশ মিনিটের বেশি বাতাস পাব। চলো, এবার বেরিয়ে যাই।'

ঝুপ্ করে পানিতে নামল মিতা। বিশ সেকেণ্ড পর ওর পিছু নিয়ে মন্দির থেকে বেরোল রানা। ভাল লাগল আবারও স্বাভাবিক আলোয় ফিরতে পেরে। তখনই খড়-মড় করে উঠল ইয়ারপিস। যোগাযোগ করতে চাইছেন প্রফেসর হ্যারিসন।

'...আসছে... দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে... শুনছ তোমরা? দুটো বোট! হাই স্পিড! সোজা আমাদের...'

পঁচিশ

মায়া মন্দিরের টানেল থেকে বেরিয়েই ডিপিভিতে চেপে বসেছে রানা ও মিতা। স্টার্টার টিপে দিতেই চালু হলো প্রপেলার। দেরি না করে রওনা হয়ে গেল ওরা। উঠছে ওপরে। কপাল ভাল, সাগরতলে এতক্ষণ নেই যে, সত্যিকারের ডিকমপ্রেশন করতে হবে। তবে, রকেটের গতি তুলে উঠলে পরে বিপদে পড়বে।

কোনাকুনিভাবে সাগর সমতলের দিকে চলেছে ওরা। সময় দিচ্ছে শরীর থেকে নাইট্রোজেন দূর হবার।

আর বড়জোর এক বা দু'মিনিট, তারপর দেখবে প্রফেসর হ্যারিসনের বোট। তখন কাজ শেষ হবে ডিপিভির।

'সাবধান!' হঠাৎ বলে উঠল রানা।

ওর কথা শুনে ঘাড় কাত করে তাকাল মিতা। কী যেন সাঁই করে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

হ্যামারহেড!

পিছু নিল দ্বিতীয়টা। ঘেঁষে গেল মিতাকে। ডানদিকে ছিটকে যেতে গিয়েও সামলে নিল মেয়েটা।

দূর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে হাঙরটা।
ওটার মতই লাইন ধরে আসছে একদল হ্যামারহেড!
একেকটা যেন মিসাইল!

সাগরসমতলে দুই বোটের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছেন না প্রফেসর হ্যারিসন। তুমুল গতি তাদের।

ট্র্যান্সমিটারের মাউথপিস খপ্ করে ধরে চিৎকার করে উঠলেন হ্যারিসন, 'শুনছ? জলদি! উঠে এসো! ওরা বড়জোর দু'মাইল দূরে!'

বিপদ কমাতে চাইলে ফুল স্পিডে পালাতে হবে পশ্চিমে। ওদিকেই আছে মেক্সিকোর কোস্ট গার্ডদের বোট। থাকতে পারে হেলিকপ্টার। ওগুলো ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পারবে শত্রুদেরকে।

এখনই উচিত রওনা হওয়া, কিন্তু বন্ধুদের ফেলে যেতে আপত্তি আছে প্রফেসরের। থ্রটল পিছিয়ে নিয়ে বোট ঘোরালেন তিনি। আবারও ফিরছেন ডাইভ যোন লক্ষ্য করে। ট্র্যান্সমিটারের মাউথপিস মুখে তুলে বললেন, 'তোমাদেরকে যেখানে ফেলে এসেছি, ওখান থেকে আধমাইল দূরে আমি। যতক্ষণ পারি অপেক্ষা করব তোমাদের জন্যে।'

হঠাৎ হাত থেকে সানগ্লাস ফেলে দিল পাবলো। সিটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল। চোখ সোজা সামনের সাগরে।

হাঙরের পালের হামলা থেকে বাঁচতে বামে বাঁক নিল মিতা, চলেছে নিচে। কিন্তু ডিপিভির প্রপালশন যথেষ্ট নয়। অন্তত তিন থেকে চার গুণ গতি তুলে আসছে হাঙরগুলো।

মিতাকে পাশ কাটিয়ে রকেটের মত গেল ছোট কয়েকটা হ্যামারহেড। পরক্ষণে ওপর থেকে ডাইভ বমারের মত নামল বড় একটা। গুঁতো লাগাল মিতার মেরুদণ্ডে।

ভীষণ ভয় পেয়ে রানাকে খুঁজল মেয়েটার চোখ।

একটু পিছিয়ে পড়েছে বলে ডিপিভির পূর্ণ গতি ব্যবহার করছে রানা। তবে ওকে মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না হাঙরের পাল। কারণটাও বুঝতে পারছে রানা। স্ফটিক মিতার কাছে।

ওই একই কথা ভেবেছে মিতা। ওটা ফেলে দিলেই কাটবে বিপদ, কিন্তু মরে গেলেও হাতছাড়া করবে না স্ফটিক। বহু কষ্টে পাওয়া জিনিস।

এখন পর্যন্ত কোনও হাঙর চায়নি কামড়ে দিতে। আসলে সেনসরি ওভারলোড হওয়ায় হতভম্ব ওরা। একের পর এক ওয়েভ আছড়ে পড়ছে ওদের মগজে।

আরেকটা বড় হাঙরের গুঁতো এড়াতে গিয়ে নতুন করে বাঁক নিল মিতা। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ টিকবে না। চারপাশে হাঙর! কাছেই ঝলসে উঠছে সাদা পেট, মস্ত হাঁ করতেই দেখা যাচ্ছে এবড়োখেবড়ো দাঁত!

মিতার ডান পায়ে গুঁতো দিয়ে গেল আরেকটা। পরেরটা প্রায় একইসময়ে ঘষা দিল পাঁজরে। ছিটকে গেল মিতা। চোট লেগেছে ঘাড়ে।

'অপেক্ষা করো, আসছি!' ব্যস্ত সুরে বলল রানা।

'ওরা স্ফটিক চায়,' দুর্বল কণ্ঠে বলল মিতা।

পরক্ষণে ওর ওপর হামলে পড়ল তরুণ একদল হাঙর। ওকে মাঝখানে রেখে ঘুরছে সিলিং ফ্যানের পাখার মত। ভীষণ ভয় পেয়েছে মিতা। টর্পেডোর মত দূর থেকে এল বড় এক হ্যামারহেড। সোজা গুঁতো দিল ডিপিভির বুকে। হাত থেকে হ্যাণ্ডেলবার ছুটে গেল মিতার। নিচের দিকে রওনা হলো হলদে যন্ত্রটা।

যান্ত্রিক সাহায্য হারিয়ে গেছে, নিজেকে সামলে নিয়ে ওপরে তাকাল মিতা। ওই যে একটু দূরে সাগর সমতল! কিন্তু পা-দুটো ছোঁড়ার আগেই খপ্ করে ওর কোমর কামড়ে ধরল কী যেন!

ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মিতা।

একহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে ডিপিভির গতি বাড়াল রানা। কিন্তু ওদের দিকে এল আরেক দল হাঙর। ব্যথা এবং মৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়ে গেল মিতা। তেড়ে এল পাশাপাশি দুটো হাঙর, পেছনেই আরেকটা।

কিন্তু তখনই সাগর সমতলে উঠে এল রানার ডিপিভি, সরাসরি ছুটল প্রফেসরের বোট লক্ষ্য করে।

বিড়বিড় করে বলল মিতা: 'অনেক ধন্যবাদ!'

গতি কমছে হ্যারিসনের বোটের। কিছুক্ষণ পর থামল রানা ও মিতার পাশে।

বোটের মই বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ হুমড়ি খেল মিতা। সাগর চিরে উঠে এসেছে সবুজ-ধূসর কী যেন! টর্পেডোর মত লাগল ওর কোমরে!

মিতাকে ওপরে ঠেলছিল রানা, ছুটে গেল ওর দু'হাত। হতবাক হয়ে দেখল, দাঁতের সারির মাঝে মেয়েটাকে রেখে সরসর করে পিছিয়ে সাগরে নেমে পড়ল মস্তবড় হাঙর!

মই বেয়ে দৌড়ে ডেকে উঠল রানা। 'পিছু নিন, প্রফেসর!'

থ্রটল খুলে বোট ঘুরিয়ে নিলেন হ্যারিসন।

এদিকে খপ্ করে ডেক থেকে স্পিয়ারগান নিল রানা।

খসে পড়ে গেছে মাস্ক, বিশাল হাঙরের করাল মুখে ছেঁড়া পুতুলের মত ঝুলছে মিতা, সাঁই-সাঁই করে পেছনে পড়ছে নীল সাগর। ওর মনে হয়েছে, কোমরে বেদম ধাক্কা দিয়েছে দ্রুতগামী ট্রেন। এবার বাঁচবে না কোনওভাবেই। গা মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল। কিন্তু কাজটা অসম্ভব। হাঙরের ত্রিকোণ মসৃণ মাথা ধরে নিজেকে ছোটাতে পারল না। এয়ার ট্যাঙ্ক কামড়ে ধরে রেখেছে দানবটা।

হঠাৎ কাত হয়ে গতি কমাল ওটা। এরই ভেতর মিতাকে সরিয়ে নিয়েছে বোট থেকে কমপক্ষে দু'শ' ফুট। এয়ার ট্যাঙ্কে

কামড় ছেড়ে নতুন আগ্রহে মেলল আরও বড় হাঁ। এই সুযোগে দ্রুত পা নেড়ে সরে যেতে চাইল মিতা। হাঁফ লেগে গেছে ওর। পাগলের মত চারপাশে তাকাল বোটের জন্যে।

ওই যে! ঘুরে আসছে বোট ওর দিকে!

মিতার দু'পায়ের মাঝে মাথা গুঁজে দিল মস্ত হাঙর, পরক্ষণে ছিটকে ফেলল দূরে! নতুন করে ঝপাস্ করে সাগরে পড়ল মিতা। ব্যথা পেয়েছে। ভেসে উঠেই দেখল হাঙরের গুঁতো খেয়ে কেটে গেছে কপাল। জলে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত!

ভীষণ ভয় পেল মিতা। ঝট্ করে পিঠ থেকে খুলে ফেলল এয়ার ট্যাঙ্ক, পরক্ষণে প্রাণপণে সাঁতরাতে লাগল বোটের দিকে। পানি থেকে তুলে রাখতে চাইছে মুখ।

বোট থেকে মিতাকে দেখছে রানা, হাতে স্পিয়ারগান। কেটে গেছে মেয়েটার কপাল। রক্তের গন্ধে পিছু নিয়েছে বেশ কয়েকটা হাঙর। সাগর চিরে আসছে ত্রিকোণ ডর্সাল ফিন!

ঝপাস্ করে বোট থেকে কার্গো নেট ফেলল রানা। 'জলদি, প্রফেসর!'

সর্বোচ্চ গতি তুলে মিতার দিকে চলেছে বোট।

পাশ কাটিয়ে যাওয়ার আগেই নেট খামচে ধরল মিতা।

এদিকে গায়ের সমস্ত জোর ব্যবহার করে নেটসহ ওকে বোটে তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রানা।

তিন সেকেণ্ড পর জালে জড়িয়ে মৎস্যকুমারীর মত বোটে উঠে এল মিতা। একইসময়ে চিত হয়ে সাগর ছেড়ে বোটে উঠল এক হাঙর। এপাশ-ওপাশ করছে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য। ওটার ভারী ওজনের কারণে কাত হলো বোট। হুড়মুড় করে উঠে এল অনেকটা পানি। নানান দিকে মাথা ঘোরাচ্ছে হাঙর, কিছু কামড়ে দিতে বেরিয়ে এসেছে দুই সারি দাঁত। কষে হাঙরের মাথায় লাথি মারল রানা, পরক্ষণে তুলে নিল স্পিয়ারগান।

কিন্তু আরেক ঝাঁকি মেরে বোট ছেড়ে সাগরে নেমে গেল হাঙর, বিশাল এক ঝপ্পাস্ আওয়াজ তুলে।

'প্রফেসর, সরে যান এখান থেকে!' নির্দেশ দিল রানা।

প্রফেসর থ্রটল খুলে দিতেই লাফিয়ে সামনে বাড়ল বোট।

রানা খেয়াল করল, পিছু নিয়েছে পাল পাল হাঙর!

এদিকে জাল খুলে সত্যিকারের মৎস্যকুমারীর মতই উঠে বসল মিতা। কাঁপা গলায় বলল, 'ক্যাপ্টেন দিমিতভ মিথ্যা বলেননি: হাঙর আর কিলার ওয়েইল পাগল হয়ে যায় স্ফটিকের কাছাকাছি হলে! আমাদের কপাল ভাল যে বেঁচে গেছি!'

মিতার পাশে বসে পড়েছে পাবলো। পাউচে হাত রাখল। 'এই তো সাইরেন। সাইরেন!'

ছেলেটা উত্তেজিত। কাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত করতে চাইল মিতা। তাতে কাজ হচ্ছে না দেখে উঠে গিয়ে লকার খুলল, ভেতর থেকে নিল সীসা দিয়ে বাঁধানো বাক্স। ওটা এ ধরনের স্ফটিক রাখতেই তৈরি। বাক্সে রেখে ওটা ব্যাকপ্যাকে গুঁজল মিতা।

পাশে থেমে ফিসফিস করল ছেলেটা, 'সাইরেন। সাইরেন।'

লকার আটকে দিল মিতা। হাত বুলিয়ে দিল ছেলেটার চুলে।

ওদিকে দূরে চেয়ে আছে রানা।

ওর চোখ অনুসরণ করল মিতা। দেখল, তুমুল বেগে ছুটে আসছে দুটো বোট। আর এক মাইল দূরেও নেই এখন। সোজা এগোচ্ছে এই বোটের দিকে।

রানার দিকে তাকাল মিতা।

নিচু স্বরে বলল রানা, 'সবচেয়ে কঠিন কাজটা বাকি এখন। এদেরকে এড়িয়ে উঠতে হবে তীরে।'

ছাব্বিশ

জায়গাটা নেভাডার পশ্চিম মরুভূমি। গুড়গুড় আওয়াজ তুলে পুরনো রাস্তা ধরে চলেছে ভেহিকেলের কনভয়। মাঝে রাখা হয়েছে কেমোফ্লেজ রঙ করা আঠারো হুইলের এক ট্রাক। সামনে ও পেছনে মেশিনগানবাহী হামভি। আকাশে এক শ' ফুট ওপরে উড়ছে দুটো মিসাইল সজ্জিত ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার।

আরও পঞ্চাশ মাইল এগোবার পর কনভয় পৌঁছল ইয়াকা পর্বতে।

ঠিক হয়েছিল এ এলাকায় ফেলা হবে দেশের সব নিউক্লিয়ার বর্জ্য, কিন্তু হামলে পড়ল হাজারে হাজারে পরিবেশবাদীরা। কেস হলো আদালতে। বেশ কয়েক বছর চলল সেই মামলা। এদিকে পাল্টে গেল রাজনৈতিক পট। ফলে নির্জন পড়ে রইল ইয়াকা মাউণ্টেন। পলিটিশিয়ানরা ভুলে যেতে চাইলেন, দেশের বেশিরভাগ রেডিও অ্যাকটিভ মেটারিয়াল রয়ে গেছে পরিত্যক্ত অবস্থায়। হালকাভাবে পাহারা দেয়া হচ্ছে এক শ' সাতটি রিঅ্যাক্টর সাইটের বিপুল বর্জ্য। কারও খেয়াল নেই দেশের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা থেকে বড়জোর কয়েক মাইল দূরে ওসব সাইট। যারা আপত্তি তুলেছিল ইয়াকা প্রজেক্ট বাস্তবায়নে, তারা খেয়ালও করল না অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল নির্জন পাহাড়ে বর্জ্য জমিয়ে রাখা।

সেই থেকে ফাঁকা পড়ে আছে ইয়াকা মাউন্টেন। কাজেই সিআইএ থেকে বলে দেয়া হয়েছে, ইচ্ছে করলে এই এলাকা ব্যবহার করতে পারবে এনআরআই। এ কারণেই এনআরআই ভল্ট থেকে বের করে ব্রাযিল স্টোন তুলে দেয়া হয়েছে এক মিলিটারি সি-১৭-এ। চারঘণ্টা আকাশপথে চলার পর এনআরআই চিফ নেমেছেন নেভাডার এয়ারফিল্ডে। ওখান থেকে রওনা হয়ে মায়ান স্ফটিক পৌঁছে গেছে ইয়াকা মাউন্টেনে।

যাত্রার প্রতিটি পদে সতর্ক ছিল সবাই। কখন কম বৈদ্যুতিক ফেয চলবে, সেটা হিসাব কষে সরানো হয়েছে স্ফটিক। আবার ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাড়লে ওটাকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে নিরাপদ জায়গায়। বিপদের সম্ভাবনা সবসময়ই ছিল, তবে পরেরবার বার্স্ট হওয়ার সাত ঘণ্টা আগেই চলে এসেছে স্ফটিক পাহাড়ি বাঙ্কারের কাছে।

সেমিট্রাকের ক্যাবে বসে মাথার ওপর দিয়ে ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার যেতে দেখলেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান। তীরের মত চলেছে মিলিটারি কপ্টার। মৃদু হাসলেন ব্রায়ান। তাঁর মনে হয়নি এত সতর্কতার দরকার ছিল।

কনভয় চলেছে মিলিটারি নিয়ন্ত্রিত এলাকার মাঝ দিয়ে অচেনা সড়কে। তাঁদের ওপর হামলা করতে চাইলে পাড়ি দিতে হবে কমপক্ষে এক শ' মাইল মরুভূমি। এ দেশের সবচেয়ে নিরাপদ বেস এটা। চারপাশে নেলিস বমিং রেঞ্জ। আকাশ পাহারা দিচ্ছে মিসাইল সজ্জিত হেলিকপ্টার ও এফ-টোয়েন্টি-টু র‍্যাপ্টর যুদ্ধবিমান। ব্রায়ানরা এখানে আসার আগেই ক্যামেরা ও ইনফ্রারেড সেন্সর ব্যবহার করে প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করেছে আর্মি। এমপিদের জানানো হয়েছে, অনুপ্রবেশকারী দেখলেই দেরি না করে গুলি করতে হবে। এত সতর্কতার মূল কারণ, মরুভূমির এদিকটায় রয়েছে গ্রুম লেক। এখানেই পরীক্ষা হয় স্টেল্‌থ্‌ বমারের টপ সিক্রেট ফ্লাইট। এই এলাকার নিরাপত্তায়

কোনও খুঁত রাখা হয়নি, তার আরেকটা কারণ এদিকেই রয়েছে কুখ্যাত এরিয়া ফিফটি-ওয়ান।

ব্রায়ানরা পৌঁছে গেছেন গন্তব্যের খুব কাছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। রুক্ষ, পরিত্যক্ত বালুমাটিতে হাজার হাজার বোমার গর্ত। পাথুরে পাহাড়ও খুব কুৎসিত। হাজার ধরনের বোমার পরীক্ষা করতে গিয়ে এই দশা হয়েছে এই এলাকার। বোমাগুলোর ভেতর রয়েছে ডেইযি কাটার থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড।

শুকনো মরুভূমির বুকে কোথাও নেই প্রাণের কোনও চিহ্ন। জন্মায়নি একটা ঘাসও। এলাকা ছেড়ে উধাও হয়েছে ক্যাকটাস। এই এলাকা যেন ভিন্ কোনও গ্রহ, অথবা চাঁদের বুক। এ কারণেই ইউএফও জাঙ্কিরা ভাবে, এখানে রাখা হয়েছে এলিয়েনদেরকে, যাতে সহজেই জীবন কাটাতে পারে তারা।

ট্রেইলারের দরজা খুলে মাথা বের করলেন এক সায়েণ্টিস্ট। 'স্যর, একটা সমস্যার ভেতর পড়েছি।'

বুক ধক্ করে উঠল ব্রায়ানের। 'কী হয়েছে?'

'অপ্রত্যাশিত এনার্জি ওয়েভ,' বললেন বিজ্ঞানী, 'বাড়ছে খুব দ্রুত!'

মেক্সিকো উপসাগর। সামনে থেকে দুটো বোট ছুটে আসতে দেখছে মাসুদ রানা।

'আমাদেরকে বন্দি করবে,' বেসুরো কণ্ঠে বললেন হ্যারিসন।

রানার হাতের ইশারায় ড্রাইভিং সিট ছেড়ে সরে গেলেন আর্কিওলজিস্ট। সিটে বসে ইঞ্জিনের শক্তি একটু কমিয়ে দিল রানা, যেন থামবে। পরমুহূর্তে প্রফেসরকে চমকে দিয়ে সোজা ছুটল বোটদুটোর দিকে। খুলে দিয়েছে পুরো থ্রটল।

ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়ছে ইঞ্জিন। দমকা হাওয়া ও পানির কণা এড়াতে নিচু হয়ে বসেছে রানা, তুমুল বেগে চলেছে দুই বোটের

দিকে যেন চাইছে মুখোমুখি সংঘর্ষ হোক। অপেক্ষাকৃত বড় ওয়্যাহু বোটের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে দু'পাশে সরে গেল সোর্ডফিশ শিকারি বোট দুটো।

গোঁয়ার গোবিন্দ ভঙ্গি নিয়ে রানাকে এগোতে দেখে মিতাকে বললেন প্রফেসর হ্যারিসন, 'মেঝেতে শুয়ে পড়ো, মিতা। আমিও তাই করছি।'

পাবলোকে পাশে নিয়ে ডেকে শুয়ে পড়ল মিতা।

একটু দূরে হ্যারিসন।

এদিকে ড্রাইভিং সিটে আরও ঝুঁকে বসল রানা।

সামনের সোর্ডফিশ শিকারিরা সরে জায়গা দেয়ার পরও নাক ঘুরিয়ে ডানদিকেরটাকে ধাওয়া করল ওয়্যাহুশিকারি রানা। গতি কমপক্ষে সত্তর থেকে আশি নট। শক্ত হাতে হুইল ধরে রেখেছে ও।

ওকে উন্মাদ ধরে নিয়ে আরও সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে ডানের বোটটা। সামান্য একটু বাঁয়ে কেটে সোর্ডফিশ শিকারির একেবারে গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল রানা। পেছনে পড়ল দুই বোট। অন্তত দশটা গুলি গেল রানার মাথার ওপর দিয়ে। যদিও ওগুলোর লক্ষ্য ছিল আউটবোর্ড ইঞ্জিন।

কিন্তু চলন্ত ও দুলন্ত ডেক থেকে লক্ষ্যস্থির প্রায় অসম্ভব।

ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল কি না তা বুঝতে কান পাতল রানা।

না, সবই ঠিক আছে।

অনেক পেছনে পড়েছে দুই শত্রুবোট।

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। পথ ছাড়তে গিয়ে বাধ্য হয়ে উত্তরদিকে গেছে একটা বোট। অন্যটা কোর্স ঠিক করে নতুন উদ্যমে আবার শুরু করেছে ধাওয়া।

আর কিছু করার নেই রানার।

শুরু হয়েছে তীরে পৌঁছুবার রেস।

নেভাডার রুক্ষ মরুভূমি চিরে চলেছে কনভয়। বিজ্ঞানীর আতঙ্ক ভরা চোখে তাকালেন ব্রায়ান। 'এসব কী বলছেন আপনি? এনার্জি বাড়ছে কী করে?'

'জানি না,' বললেন বিজ্ঞানী।

সিট ছেড়ে উঠতে চাইলেন ব্রায়ান, কিন্তু বাধা দিল সিটবেল্ট। 'কিন্তু এ তো অসম্ভব!' বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কী করবেন বুঝছেন না। প্রায় কিছুই জানতে পারেননি তাঁরা ব্রাযিল স্টোনের ব্যাপারে!

ট্রাকের পেছনে গিয়ে ঢুকলেন ব্রায়ান। ভার্জিনিয়া ল্যাবের ক্ষুদ্র সংস্করণ তৈরি করা হয়েছে ট্রাকের ভেতর। তাঁর স্টাফরা মনিটর করছে জ্বলজ্বলে স্ফটিক। কমপিউটারের স্ক্রিনে রিডআউট দেখলেন তিনি। অন্তত চারগুণ বেড়ে গেছে এনার্জি।

'কখন থেকে শুরু হয়েছে?' জানতে চাইলেন।

'পাঁচ মিনিট আগে থেকে,' বললেন বিজ্ঞানী, 'প্রথমে খেয়াল করলাম, নতুন এনার্জি ডিসট্রিবিউশন প্যাটার্ন। বাড়তে লাগল এনার্জি। অনেক কমল ব্যাকগ্রাউণ্ড রিডিং। বদলে গেল কাউণ্টডাউন সিগনাল। অনেক জটিল আর অনিশ্চিত হয়ে উঠল।'

'কী হয়েছে জানি না, তবে কিছু পাল্টে দিয়েছে একটু আগের সিগনাল,' বলল ব্রায়ানের স্টাফ। 'হয়তো আপনাআপনি আগের মতই শান্ত হবে।'

ধূসর চুলে হাত বোলালেন ব্রায়ান। লক্ষ করলেন স্ক্রিনে পাওয়ার কার্ভ। আরও বাড়ছে এনার্জি। ডিসচার্জের সময় এমনই করে স্ফটিক। কিন্তু এ মুহূর্তে চার্টের বেঞ্চমার্ক লেভেল খুব কম।

স্ফটিকের সঙ্গে সংযুক্ত কমপিউটার ফ্ল্যাশ করছে লাল বাতি, সেইসঙ্গে আছে জোরালো বিপবিপ সতর্কসঙ্কেত। বাড়ছে

স্ফটিকের এনার্জি লেভেল। ধূসর হলো স্ক্রিন। রেডিওজুড়ে শুরু হয়েছে স্ট্যাটিক।

ড্রাইভারের উদ্দেশে চিৎকার করে বললেন ব্রায়ান, 'আশপাশে কোনও বাঙ্কার আছে?'

কথা শুনে হতভম্ব হয়েছে এয়ারফোর্সের সার্জেন্ট। 'মিস্টার ব্রায়ান? কী বললেন?'

'এই জিনিস লুকাবার মত কোনও জায়গা আছে?'

'না, স্যর,' বলল ড্রাইভার। 'এটা খোলা রাস্তা।'

শক্ত করে পাবলোকে জড়িয়ে ধরে ডেকে শুয়ে আছে মিতা। ঝড়ের গতি তুলে তীর লক্ষ্য করে বোট ছুটিয়েছে মাসুদ রানা। প্রথমে সরে গেল ডানে, তারপর বামে। সহজ টার্গেট দেবে না। পিছন থেকে ধাওয়া করছে দুই শত্রুবোট।

তুমুল বেগ তিন বোটের, কিন্তু বারবার বাঁক নিতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ছে রানারা।

এখন মাত্র পঞ্চাশ গজ পেছনে দুই বোট। দু'পাশে সরে গিয়ে গুলি করছে ইঞ্জিন লক্ষ্য করে।

পাঁচ মিনিটের ভেতর বন্দরে পৌঁছবে ওরা। রানা আশা করছে, ব্যস্ত জায়গায় যা খুশি করতে পারবে না পেছনের লোকগুলো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ওরা ওই পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে কি না, তার ঠিক নেই। মাত্র একটা বুলেট খতম করে দিতে পারে আউটবোর্ড মোটর।

রানার দু'ফুট পেছনের ডেকে বিঁধল রাইফেলের গুলি। কানের পাশ দিয়ে গেল আরেকটা। আরও ঝুঁকে বসল রানা। পেছনে শুনল পাবলোর চিৎকার। মিতার হাত থেকে ছুটে গেছে বাচ্চা ছেলেটা। আঙুল তাক করল লকারের দিকে। বিস্ফারিত দুই চোখ, যেন আবিষ্কার করেছে নতুন কিছু। হঠাৎ চিকন কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল: 'টু!' আবার দেখল মিতাকে। 'টু!'

প্রফেসরের দিকে তাকাল মিতা।

ভদ্রলোক হামাগুড়ি দিয়ে পাশে চলে এসেছেন। 'ছেলেটা পাগল হয়ে গেল না তো?'

'জানি না,' বিড়বিড় করল মিতা। 'ওকে শক্ত করে ধরে বসুন।'

'মিতা, হুইল ধরো,' নির্দেশ দিল রানা।

মেয়েটা ড্রাইভিং সিটে বসতেই বোটের পেছনে এল রানা। সিটের পেছন থেকে নিল নোঙর। তীরের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। আর বড়জোর কয়েক মিনিট। 'সোজা এগিয়ে যাও, মিতা!' ছোরা বের করে নোঙরের দড়ি কেটে দিল রানা।

সোজা ছুটছে বোট।

দড়ি ঘুরিয়ে হ্যামার থ্রোর মত করে নোঙর ছুঁড়ল রানা। ধাওয়াকারীদের দিকে উড়ে গেল ওটা। কিন্তু টার্গেট থেকে একটু আগেই ঝপাস করে পড়ল সাগরে।

'আরও দূরে ফেলতে হলে গায়ে হাতির জোর লাগবে,' চেঁচিয়ে বলল মিতা।

মাথা দোলাল রানা। এবার নিল বৈঠা, ওটা ঠিকই পড়ল শত্রুবোটের সামনে। কিলের নিচে চাপা পড়ে দু'টুকরো হলো জিনিসটা।

জবাবে দুই বোট থেকে এল একরাশ গুলি। বাঁক নিয়ে ডানে চলেছে মিতা। সাগরে নাক গুঁজল কয়েকটা বুলেট। বসে পড়েছে রানা। ওর চোখ পড়ল ফ্লেয়ার গানের ওপর। কয়েক সেকেণ্ড কী যেন ভাবল, তারপর একটা বয়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিল স্পেয়ার ডাইভিং ট্যাঙ্ক।

'এবারের মিসাইল লক্ষ্যভেদ করবে?' জানতে চাইল মিতা।

'দেখা যাক!' সরল রেখার মত সাদা ঢেউ তৈরি হয়েছে পেছনে। ভাল্‌ভ্‌ খুলে ট্যাঙ্ক সাগরে ফেলল রানা। তলিয়ে গেছে ভারী জিনিসটা। কিন্তু পরিষ্কার চোখে পড়ল বুদ্বুদ ও বয়া।

অপেক্ষা করল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ফায়ার করল ফ্লেয়ার।

বুদ্বুদের দিকে গেল আগুনের কমলা হলকা। ট্যাঙ্কের বাতাসে আছে চল্লিশ পার্সেন্ট অক্সিজেন। এক সেকেণ্ড পর বোমার মত বিস্ফোরিত হলো স্পেয়ার দুই এয়ার ট্যাঙ্ক।

সরে যেতে অনেক দেরি করে ফেলেছে সামনের বোট, পেটের নিচে ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হতেই সাগর থেকে পুরো দেড় ফুট ওপরে উঠল গোটা জলযান। বেকায়দাভাবে কাত হয়ে সাগরে পড়ল বোট। চাকা-ফাটা দ্রুতগামী গাড়ির মত কয়েক ডিগবাজি খেল ওটা। চারপাশে ছিটিয়ে গেল হাজারো ভাঙা টুকরো। শেষ গড়ান দিয়ে আবারও ভেসে উঠল। পেট ভরা পানি। দেখা গেল না কাউকে।

'গুড শট্!' হৈ-হৈ করে উঠলেন হ্যারিসন।

ইচ্ছেপূরণ হলো না রানার। সঙ্গীদের তুলে নিতে থামল না দ্বিতীয় বোট। বিধ্বস্ত বোটকে পাশ কাটিয়ে ছুটে আসছে ফুল স্পিডে।

মাথার ওপর দিয়ে গুলি যাচ্ছে দেখে এঁকেবেঁকে চলেছে মিতা। এ সুযোগে আবারও কাছে এল দ্বিতীয় বোট। গুলি করছে লোকগুলো। বুলেট ও ট্রেসার বিঁধছে রানাদের বোটে।

মিতা ব্রেকওআটার পেরিয়ে বন্দরে ঢুকতেই ডেকে শুয়ে পড়ল রানা। নোঙর করা একগাদা সেইল বোটের মাঝ দিয়ে চলল ওদের বোট। পেছনে চিকন গলায় চিৎকার করে উঠল পাবলো। গা মুচড়ে নিজেকে ছুটিয়ে নিল প্রফেসরের হাত থেকে। লাফিয়ে পড়ল লকারের ওপর। চিৎকার ছাড়ল: 'টু! টু! টু! টু! টু!' লকারের ডালায় কিল বসাল ছোট্ট দুই হাতে।

রেডিয়ো থেকে কর্কশ আওয়াজ বেরোতেই গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিলেন জেমস ব্রায়ান: 'নামতে বলো হেলিকপ্টার দুটোকে!'

‘কেন?’ জানতে চাইল ড্রাইভার।

‘নামতে বলো! জলদি!’

রেডিয়োর রিসিভার তুলে ব্রায়ানের নির্দেশ রিলে করতে চাইল মাস্টার সার্জেন্ট, কিন্তু সেট থেকে এল শুধু ফিডব্যাক ও স্ট্যাটিক।

ওভারলোড হলো ট্রাকের পেছনের কমপিউটার। নানান ভেন্ট দিয়ে ছিটকে বেরোল কমলা ফুলকি। বিস্ফোরিত হলো সেটআপ-এর সঙ্গের একটা অসিলোস্কোপ।

‘বন্ধ করো সব!’ দলের লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করলেন ব্রায়ান। স্ফটিক রাখা ভারী সীসার বাক্সের দিকে বাড়িয়ে দিলেন হাত। ‘বন্ধ করো ওটা! বন্ধ করো!’

করুণ আর্তনাদ ছাড়ল রেডিয়ো। একের পর এক বিস্ফোরিত হচ্ছে! শর্ট হয়ে গেল কমপিউটার। ব্রায়ান আর বিজ্ঞানী মিলে বন্ধ করতে চাইলেন ভারী সীসার বাক্স, কিন্তু তখনই স্ফটিক থেকে বেরোল অত্যুজ্জ্বল সাদা আলো। শক ওয়েভ ছড়িয়ে গেল ট্রাক থেকে চারপাশের মরুভূমিতে।

‘টু! টু! টু!’ পাগলের মত চিৎকার করছে পাবলো। বড় বড় হয়ে উঠেছে দুই চোখ। ‘ওয়ান!’

বোটের ভেতর বিস্ফোরিত হলো কী যেন!

আরেকটু হলে বোট থেকে পানিতে গিয়ে পড়ত রানা। ড্রাইভার্স প্যানেলে আছড়ে পড়েছে মিতা। কাত হয়ে পড়ে গেল ডেকে। বিস্ফোরিত হলো ইঞ্জিন। আগুনের হলকা বেরোল ডেপ্থ্ ফাইণ্ডার আর রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার থেকে।

রানার মনে হলো, পুরু কাঁচের কোনও কিছু দিয়ে বাড়ি মেরে নাক-মুখ সমান করে দেয়া হয়েছে ওর। বুক থেকে বেরিয়ে গেছে বাতাস। ঝনঝন করছে কান। আবছা দেখল, পাবলোর ওপর ঝুঁকে পড়েছেন প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন। একটু

সামলে নিয়ে হুইলের পেছনে বসতে চাইছে মিতা।

ঘুরে তাকাল রানা। ওদের আউটবোর্ড মোটর থেকে ভলকে ভলকে উঠছে কালো ধোঁয়া। কোর্স পাল্টে আরেক দিকে চলেছে পেছনের শত্রুবোট। ওটার ইঞ্জিন কমপার্টমেন্ট চাটছে আগুন। একই সমস্যায় পড়েছে বন্দরে বাঁধা কয়েকটা ভেসেল।

হুইল ধরে ঠিক দিকে বোট নিতে চাইল মিতা। এখনও যে গতি আছে, উঠে পড়তে পারবে সৈকতে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ঘ্যাস্ শব্দে বালির বুকে উঠল বোট।

রানার দিকে তাকাল বিস্মিত মিতা। 'কী হলো বলো তো?'

'জানি না,' বলল রানা। ঘুরে দেখল, পাবলোকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন প্রফেসর। রক্তে ভিজে গেছে ছেলেটার কান।

'হায়, ভগবান!' বিড়বিড় করল মিতা।

'চলো, সরে যেতে হবে,' বলল রানা, 'আমি নিচ্ছি ওকে।' হাত বাড়িয়ে প্রফেসরের কাছ থেকে অচেতন পাবলোকে নিল ও। লকার থেকে ইকুইপমেন্ট ব্যাগ নিয়ে নেমে পড়ল সৈকতে। ব্যাগের ভেতর রয়ে গেছে ওই স্ফটিক।

সৈকতে নামতে প্রফেসরকে সাহায্য করল মিতা, তারপর নেমে পড়ল নিজেও।

পাবলোকে কাঁধে রেখে পা বাড়িয়ে রানা ভাবল, ওরা পেয়ে গেছে দ্বিতীয় স্ফটিক। কিন্তু কে জানে, সেজন্যে দিতে হবে কত বড় মূল্য!

সাতাশ

একহাতে দরজা ঠেলে ইমার্জেন্সি রুমে ঢুকল রানা, কাঁধে

পাবলো। পেছনেই মিতা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমাদের ডাক্তার দরকার!' একই কথা স্প্যানিশ ভাষায় জানাল: 'নেসেসিতামোস উন মেদিকো!'

চারপাশে চোখ বোলাল রানা। এই ঘর প্রায় অন্ধকার। টিন্টেড জানালা দিয়ে আসছে রোদের আবছা আলো। এ ছাড়া, দু'প্রান্তে জ্বলছে দুটো করে ইমার্জেন্সি বাতি।

'বিদ্যুৎ নেই,' নিচু স্বরে বলল মিতা।

ঝোড়ো গতি তুলে ড্রাইভ করে এই হাসপাতালে পৌঁছেছে ওরা। কয়েকবার বেঁচে গেছে মারাত্মক দুর্ঘটনার কবল থেকে। রাস্তায় কাজ করছে না কোনও ট্রাফিক বাতি। জটলা পাকিয়ে গেছে অনেকগুলো গাড়ি। বাধ্য হয়ে ফুটপাথে জিপ তুলে অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছে রানা।

এখানে এসেও বিদ্যুৎ নেই। হৈ-চৈ করছে রোগীরা। রেগে ওঠারই কথা। ইমার্জেন্সি রুম, কিন্তু নেই যথেষ্ট নার্স বা ডাক্তার। ওয়েটিং রুমে গাদাগাদি করে অপেক্ষা করছে নতুন রোগীরা। আগে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে চরম অসুস্থদেরকে। মৃদু ট্রমা হয়েছে এমন রোগীদের অপেক্ষা করতে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

মিতার ধারণা, এত সময় পাবে না পাবলো। কাজেই এক নার্স চাইতেই ইশারা করে শিথিল, অচেতন ছেলেটাকে দেখাল ও। প্রায় দৌড়ে এল নার্স, হাতে স্টেথোস্কোপ।

'আপনি ইংরেজি বলতে পারেন?' জানতে চাইল মিতা।

মাথা দোলাল নার্স। স্টেথোস্কোপ রাখল পাবলোর বুকে। 'কী হয়েছে ওর?'

'জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছে,' বলল মিতা।

পাবলোর রক্তাক্ত কান পরীক্ষা করল নার্স, তারপর চোখের পাতা তুলে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল। গম্ভীর হয়ে গেল মহিলা। 'সাড়া নেই। শ্বাস ফেলছে না বললেই চলে।' রানাকে

ইশারা করল সে। 'আমার সঙ্গে আসুন।'

প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন এক করিডোরে ওদেরকে নিয়ে এল সে, সামনেই পর্দা ঢাকা দরজা। ওদিকে জ্বলছে ইমার্জেন্সি বাতি। ঘরের ভেতরে পুরনো কিন্তু পরিষ্কার সব ইকুইপমেন্ট। দরকারি সব কিছু পাবলো এখানে পাবে কি না, জানা নেই। অসহায় চোখে রানার দিকে তাকাল মিতা। 'স্টেট্স্-এ নিতে পারলে হতো।'

'আমাদের ভাল ডাক্তার আছে, চিন্তা করবেন না,' বলল নার্স।

চুপ করে থাকল মিতা।

এগযামিনেশন টেবিলে পাবলোকে শুইয়ে দিল রানা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল নার্স। ফিরল কয়েক মিনিট পর। এখন সঙ্গে এক মহিলা ডাক্তার। উনি বললেন, 'আমি ডাক্তার ফার্নেন্দেজ।' রানা বা মিতার দিকে না চেয়েই টেবিলের পাশে থামলেন। 'জ্ঞান হারিয়ে গেছে এই ছেলের?'

'জী,' বলল মিতা।

টেবিলের আরেক পাশে সরে পাল্স্ ও ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করছেন ডাক্তার। 'কখন এটা ঘটে?'

'বিশ মিনিট আগে।'

মুখ তুলে তাকালেন মহিলা ডাক্তার। 'যখন বিদ্যুৎ চলে গেল? ওই সময়ে কী করছিল ও?'

চুপ করে কী বলবে, ভাবছে মিতা।

'টিভি দেখছিল? তখন কি অস্বাভাবিক আলো ছিল ঘরে?'

টিপ-টিপ করা আলোয় অনেক সময় অচেতন হয়ে পড়ে রোগী। বেশি হয় টিভি বা কমপিউটার স্ক্রিনের সামনে থাকলে। মাথা নাড়ল মিতা। 'না। আমরা ছিলাম সাগরে খোলা জায়গায়।'

অবাক চোখে ওকে দেখলেন ডাক্তার। 'আপনারা ছিলেন

পুয়ের্তো আয়ুলের দিকে?'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। বুঝে গেছে, এই ছোট শহরে পৌঁছে গেছে অদ্ভুত ওই দুর্ঘটনার খবর। ঘুমন্ত গ্রামের কাছে বিস্ফোরিত হয়েছে বোট, আর তখনই গেছে বিদ্যুৎ। সৈকতে উঠে এসেছে একটা বোট। ওটা থেকে নেমে গেছে কয়েকজন। তাদের সঙ্গে ছিল ছোট এক আহত ছেলে। চোখ এড়াবার কথা নয় কারও।

'এ ছেলের জ্ঞান নেই,' বলল রানা। 'কান থেকে রক্ত পড়ছে। তাই দেরি না করে নিয়ে এসেছি হাসপাতালে।'

'হয়তো মগজে রক্তক্ষরণ হচ্ছে,' বলল মিতা, 'দেখুন এমআরআই বা সিটি স্ক্যান করতে পারেন কি না।'

অস্বস্তির ভেতর পড়ে গেলেন ডাক্তার ফার্নেন্দেজ। চাপা স্বরে বললেন, 'আপনারা ছেলেটার বাবা-মা নন।'

ঘরে ঢুকল লম্বু এক চওড়া কাঁধের আর্দালি। টের পেয়েছে ঘরের উত্তেজনা। ডাক্তার ফার্নেন্দেজের দিকে তাকাল।

'রিকো...' বলতে শুরু করে অ্যালার্ম বাটনের দিকে হাত বাড়ালেন ডাক্তার।

কী করবে ভাবতে শুরু করেছে মিতা, কিন্তু ওর দিকে এগোল আর্দালি। তার চেয়ে ঢের দ্রুত রানা, কাঁধের গুঁতো মেরে তাকে দেয়ালে ফেলল ও। হাতে উঠে এসেছে ওয়ালথার। নল তাক করল লোকটার কপালে।

ভীষণ ভয় নিয়ে রানার দিকে তাকালেন ডাক্তার।

'মন দিয়ে শুনুন,' নরম সুরে বলল রানা, চোখ ডাক্তারের চোখে। 'দয়া করে ভয় পাবেন না। আমরা আপনাদের ক্ষতি করতে আসিনি। কোনও ক্ষতিও করিনি ছেলেটার।'

ওর চোখে চোখ রেখে বড় করে দম নিলেন ডাক্তার ফার্নেন্দেজ। পিস্তলের নল সরিয়ে নিল রানা। তবে দরকার পড়লে ওটা ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না।

মিতার দিকে তাকালেন মহিলা ডাক্তার।

'না, আমি ওর মা নই,' বলল মিতা, 'এমন কেউ নই যে ওকে কিডন্যাপ করেছি। ওকে সরিয়ে নিয়েছি একদল ভয়ঙ্কর লোকের কাছ থেকে। তারা কিডন্যাপ করেছিল ওকে। ড্রাগ দিয়েছিল। আমরা চাই না আবারও ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাক তারা।'

রানা খেয়াল করল, নরম হলো ডাক্তারের চোখের ভাষা। পাবলোর দিকে তাকালেন তিনি। যদি চিৎকার করে, তাই মুখে হাত চাপা দিতে তৈরি থাকল রানা।

'আপনারা কারা?' জানতে চাইলেন মহিলা ডাক্তার।

'সিকিউরিটি সার্ভিসের সঙ্গে আছি,' বলল রানা।

'আপনারা বেআইনিভাবে এ দেশে যা খুশি করতে পারেন না,' বললেন মহিলা।

'অবশ্যই পারি না,' মাথা দোলাল রানা। ডাহা মিথ্যা বলল এবার, 'আমেরিকান কর্তৃপক্ষকে সব জানানো হয়েছে। তারা কথা বলছে এখন এ দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। আধঘণ্টার ভেতর সব ধরনের অনুমতি পাব। কাজেই, প্লিয, দয়া করে ছেলেটাকে সাহায্য করুন। চিকিৎসা শেষ হলে কোনও ঝামেলা না করেই বিদায় নেব আমরা।'

দ্বিধায় পড়ে পাবলোকে দেখলেন ডাক্তার।

সাহায্য না করে উপায় কী তাঁর? ডাক্তার তো!

নরম সুরে বললেন ফার্নেন্দেজ, 'আমরা এমআরআই করব। তারপর বিদায় নেবেন আপনারা।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। চাইছে, অন্তত মেডিকেল পরীক্ষা করে দেখা হোক পাবলোকে।

একদল মানুষের ভেতর পাবলিক প্লাযায় ঘুরঘুর করছেন প্রফেসর হ্যারিসন। দুপুরের দিকে কারেন্ট যেতেই বেরিয়ে

এসেছে টুরিস্ট ও শহরবাসীরা। গাড়ির জ্যাম বেধে গেছে রাস্তায়।

চারদিকে চোখ রেখেছেন হ্যারিসন, গোলমাল দেখলেই পালাবেন। ভয় লাগছে তাঁর। পিঠে ঝুলছে ব্যাকপ্যাক। ওটার ভেতরের মায়ান স্ফটিক থেকেই বিচ্ছুরিত হয়েছিল বিপুল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি। ওই জিনিসের জন্যেই তাঁদেরকে খুঁজছে দুই দল সশস্ত্র খুনি। যখন-তখন খুন হবেন। রানা বা মিতা চায়নি স্ফটিকটা হাসপাতালে নিতে, বাচ্চা ছেলেটার ওপর নানান পরীক্ষা হবে, তখন ওই জিনিস থেকে বিচ্ছুরণ হলে বাতিল হবে সব যন্ত্রপাতি, তাই বাধ্য হয়ে ওটা রাখতে হয়েছে তাঁকে।

হ্যারিসনের কাছ থেকে একটু দূরেই কংক্রিট দিয়ে তৈরি এক ফোয়ারা। ওখানে ঘুরছে শত শত মানুষ। বিদ্যুৎ নেই বলে ঘরের গরম থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা। এক পাশে ফুটবল খেলছে একদল তরুণ। তাদের তৈরি মাঠের সীমানার বাইরে থেকে খেলা দেখছে ইউনিফর্ম পরা একদল ফেডারাল। তাদের কয়েকজন ঘুরছে টুরিস্টদের মাঝে। তাদেরকে হরিণের পালে নেকড়ে বলে মনে হলো হ্যারিসনের। তাঁর যৌক্তিক মন বলল, ভিড় সামলাতে এসেছে এরা। কিন্তু কু ডাকল মন। পুলিশগুলো আসলে খুঁজছে তাঁদেরকে! একবার ধরতে পারলেই পুরে দেবে কারাগারে। বাকি জীবনে আর বেরোতে পারবেন না ওই নরক থেকে!

ডক্টর ফার্নেন্দেজের পাশে দাঁড়িয়ে এমআরআই রিপোর্ট দেখছে রানা ও মিতা। হাইলাইট করা হয়েছে পাবলোর মগজের একটা অংশ। ওদিকে লাল-কমলা, কিন্তু আরেকটা দিক নীল ও ঝাপসা।

'এটা কী?' জানতে চাইল মিতা।

মেশিনের কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করলেন ডাক্তার। নতুন করে স্ক্যান করছেন। বিশাল টিউবের মধ্যে নিথর পড়ে আছে পাবলো। জোরালো ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ তুলল এমআরআই স্ক্যান। নতুন করে তুলল পাবলোর মগজের ছবি।

এবারের ছবি আগের চেয়ে স্পষ্ট। তবুও আবছাই রয়ে গেল নীল অংশের ছবি।

'ইমেজের কোনও ভুল?' জানতে চাইল মিতা।

মাথা নাড়লেন ডাক্তার ফার্নেন্দেজ। 'নিশ্চিত হতে আরেকটা অ্যাংগেল থেকে ছবি নিয়েছি।' নীল অংশে আঙুল তাক করলেন তিনি। 'মেশিনের ত্রুটি থাকলে আবছা অংশ নড়ত। তা হয়নি। কয়েকবার দেখেছি, নীল অংশের ইমেজ রয়ে গেছে শুধু বাচ্চার মগজের নির্দিষ্ট জায়গায়।'

'জিনিসটা কী?' জানতে চাইল মিতা।

'আপনি না বলেছিলেন কারা যেন এক্সপেরিমেণ্ট করেছে ওর ওপর?'

'তাই শুনেছি।'

দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়লেন মহিলা ডাক্তার। 'তা হলে আপনারা বোধহয় দেখছেন তাদের এক্সপেরিমেণ্টের পরিণাম। ওটা বৈদ্যুতিক কিছু, গেঁথে দেয়া হয়েছে সেরেব্রাল কর্টেক্স-এ।'

'বৈদ্যুতিক?'

'ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তৈরি করছে,' বললেন ডাক্তার, 'খুব সামান্য। কিন্তু সেজন্যেই নীল দেখাচ্ছে ছবি।'

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে রানাকে দেখল মিতা। পরক্ষণে চমকে উঠল। টিউবের ভেতর জেগে উঠে চিৎকার শুরু করেছে পাবলো!

পার্কের বাইরে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর হ্যারিসন। পাশেই এক হকার। ছোট ছোট অসংখ্য জিনিস তার ডালায়।

আবার পুলিশদের দেখলেন আর্কিওলজিস্ট।

তাদের কয়েকজন রওনা হয়েছে তাঁর দিকেই!

ওরা আসছে স্ফটিক কেড়ে নিতে!

তা হলে কি তাঁর মনের কথা বুঝে ফেলেছে তারা?

পালাও, হ্যারিসন! বুকের ভেতর তাড়া দিল কেউ।

পালাও!

ঘুরেই রাস্তার দিকে ছুটলেন প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন।

জ্ঞান ফিরতেই গলা ফাটিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে পাবলো। তবে এমআরআই মেশিনের বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করতেই শান্ত হয়ে গেল ও। টিউব থেকে বেরোবার পর আর ছাড়ল না মিতার বাহু। কয়েক ধরনের পরীক্ষা করলেন ডাক্তার ফার্নেন্দেজ।

'ব্রেন ফুলে ওঠেনি,' বললেন তিনি, 'নিউরোলজিকাল রেসপন্স যথেষ্ট ভাল।'

চুপ করে আছে রানা।

মিতা জানতে চাইল, 'আর ওর কানের রক্ত?'

'কানের গর্তে ফুসকুড়ি হয়েছিল, অচেতন হয়ে যাওয়ার সময় ফেটে গেছে,' বললেন ডাক্তার। 'কানে ঠিকই শুনছে। কোনও ক্ষতি হয়নি।' মৃদু হাসলেন তিনি। 'ওর কপাল ভাল।'

স্বস্তি নিয়ে পাবলোকে দেখল মিতা।

'এবার ওকে কোথায় রাখবেন?' জানতে চাইলেন ডাক্তার।

'নিরাপদ কোথাও, যেখানে হামলা হবে না,' বলল রানা।

'আমাদের কাছে রেখে যেতে পারেন,' বললেন মহিলা। 'ওর অযত্ন হবে না, সেটা দেখব।'

দ্বিধা নিয়ে রানার দিকে তাকাল মিতা। কী যেন ভাবছে রানা।

ভাল হতো পাবলো হারিয়ে গেলে।

ল্যাং বা রাশানরা খুঁজে পেত না!

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'ওকে খুঁজে বের করবে।

প্রয়োজনে খুন করবে আশ্রয়দাতাদেরকে।'

'কেন খুন করবে?' জানতে চাইলেন ফার্নেন্দেজ।

'দীর্ঘ কাহিনি,' বলল রানা, 'আপনার বা আমাদের হাতে এত সময় নেই যে বিস্তারিত বলব। এখান থেকে আমরা বেরিয়ে গেলেই যোগাযোগ করবেন পুলিশে। পাবলোর কিডন্যাপাররা এখানে চলে আসতে পারে। তার ফলাফল ভাল হবে না।'

মৃদু মাথা দোলালেন ফার্নেন্দেজ, নার্ভাস। একবার দেখলেন, এখনও রানার হাতে পিস্তল। 'ঠিক আছে, তা হলে আপনারা বেরিয়ে যাওয়ার পাঁচ মিনিট পর পুলিশে কল দেব। ভুলেও ফিরবেন না।'

পাবলোর কাঁধে হাত রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মিতা। পিছু নিল রানা।

'আমি কি সিকিউরিটির লোক ডাকব?' জানতে চাইল রিকো।

'না,' মানা করে দিলেন মহিলা ডাক্তার।

'চলে যেতে দেবেন ওদেরকে?'

'সেটাই ভাল,' বললেন ফার্নেন্দেজ। 'এদেরকে স্পাই মনে হয়েছে, এসবের ভেতর না জড়ানোই ভাল আমাদের।'

'আর সত্যি যদি মিথ্যে বলে থাকে?'

'তা হলে এখান থেকে অনেক দূরে কোথাও গ্রেফতার হবে পুলিশের হাতে।'

সামান্য আপত্তি নিয়ে মাথা দোলাল রিকো। দরজার পাশের ছোট এক ডিভাইসের ওপর চোখে পড়ল ওর। বারবার ঝলসে উঠছে সবুজ লেড বাতি।

'বাচ্চাটার মগজে ওটা কি রেডিয়োঅ্যাকটিভ?' জানতে চাইল রিকো।

'না,' বললেন ডাক্তার ফার্নেন্দেজ, 'হঠাৎ জিজ্ঞেস করছ

কেন?'

লেড বাতি দেখাল রিকো। 'ওই যে ওয়েস্ট অ্যালার্ম। ওই তিনজনের মধ্যে অন্তত একজন রেডিয়োঅ্যাকটিভ মেটারিয়ালের সংস্পর্শে এসেছে।'

হনহন করে হেঁটে পালাচ্ছেন প্রফেসর হ্যারিসন। নিজেই বুঝতে পারছেন, আরও জোরে হাঁটলে বা দৌড় দিলে অস্বাভাবিক লাগবে লোকের চোখে। আহত পায়ে শুরু হয়েছে ব্যথা। প্রাণের ভয়ে অস্থির লাগছে বুকের ভেতরটা।

প্রাণপণে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলেন, যেভাবে হোক সরে যেতে হবে পুলিশের লোক, রানা, মিতা আর শত্রুদের কাছ থেকে। প্রথম সুযোগে...

কয়েক সেকেণ্ড পর অন্য চিন্তা ঘাই দিল তাঁর মনে। আরে, আগে এ কথা ভাবেননি কেন? রানা আর মিতা তো তাঁর দলের! ওরা নিরাপদে রাখতে চাইছে তাঁকে! তা হলে অবচেতন মন কী বোঝাতে চাইছে?

হাসপাতালের সামনের ব্যস্ত রাস্তায় একটা সিটি বাস থামতে দেখলেন প্রফেসর। প্রায় দৌড়ে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। গতি কমতেই বিকট চুঁই আওয়াজ তুলল বাসের ব্রেক।

'প্রফেসর?' ডাকল কে যেন!

ঘুরে হ্যারিসন দেখলেন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা ও মিতা। পাশেই হাঁটছে পাবলো। ছেলেটা সুস্থ দেখে খুশি হলেন তিনি।

'কী করছিলেন?' কাছে এসে সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল মিতা।

বেসুরো কণ্ঠে বললেন হ্যারিসন, 'আমি পালাচ্ছিলাম। যাতে কেউ দেখতে না পায়।' হাতের ইশারা করে পার্ক ও রাস্তার

কোণে পুলিশ দেখালেন তিনি।

'পুলিশ আমাদেরকে খুঁজছে না,' বলল মিতা।

'বুঝবে কী করে?' আপত্তির সুরে বললেন হ্যারিসন।

'কী করা উচিত ভাবছ, রানা?' গম্ভীর সঙ্গীর দিকে তাকাল মিতা।

'ভুলে যেতে হবে পুরনো ওই জিপের কথা,' বলল রানা।

অবাক হলেন প্রফেসর। 'তা হলে কি আমরা বাসে চাপব?'

'ঠিকই ধরেছেন,' বলল রানা, 'চলুন, উঠে পড়ি বাসে।'

আটাশ

ইয়াকা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের চিরকালীন প্রায়ান্ধকারে বসে আছেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান, কপালে ধরে রেখেছেন বরফঠাণ্ডা পট্টি। চারপাশে ব্যস্ত একদল টেকনিশিয়ান। নানান ইকুইপমেন্টের সঙ্গে যুক্ত করছে অজস্র কেবল। দ্বিগুণ চওড়া এক ট্রেইলারে নতুন করে সাজিয়ে নেয়া হচ্ছে গবেষণাগার।

উদাস হয়ে সবার কাজ দেখছেন ব্রায়ান। দুর্ঘটনার পর থেকেই প্রতি দশ বা পনেরো মিনিট পর পর ভীষণ বমি পাচ্ছে তাঁর। এবার সুযোগ পেয়ে তাঁকে একহাত নিয়েছে সিআইএ চিফ ক্যালাগু। লোকটার মুখে বমি করতে পারলে তিনি খুশি হতেন।

নতুন ল্যাবোরেটরির ফ্ল্যাট-স্ক্রিন মনিটরে দেখা যাচ্ছে নতুন রিভিউ। স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এনার্জি বিচ্ছুরণ। তবে ওটা দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব নন তিনি। বারবার পয্‌ করে দেখছেন

দৃশ্যটা। আবারও চালু করছেন।

মরুভূমির মেঝে ভরা বোমার গর্ত। পাশেই পড়ে আছে আঠারো চাকার ট্রাক। ধোঁয়া উঠছে ওটা থেকে। একই অবস্থা হামভিগুলোর। একটু দূরে প্রায় বিধ্বস্ত হয়েছে দুই ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার। প্রথমটা মোটামুটিভাবে নেমে এলেও অন্যটা কাত হয়ে পড়েছে বালির স্তূপে। পুরনো এলপি রেকর্ডের মত খান খান হয়েছে রোটর।

আবারও দৃশ্য পয্ করলেন ব্রায়ান। ওই জ্বলন্ত হেলিকপ্টার থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ছে এক লোক!

ব্রায়ান রওনা হওয়ার আগেই ইয়াকা মাউন্টেনে হাজির হয়েছেন সিআইএ চিফ ক্যালাগু। পুরনো কথা আবারও বললেন, 'ভাল কোনও ভিডিয়ো নেই আমাদের হাতে। পুরো বেস ভরা হাজারো ক্যামেরা, সেগুলোর ভেতর রয়েছে নিউক্লিয়ার ব্লাস্টের দৃশ্য ধারণের বিশেষ ক্যামেরা, অথচ বিস্ফোরণের চার মিনিট উনিশ সেকেণ্ড আগে থেমে গেছে সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। আবার চালু হয়েছে বিস্ফোরণের এক মিনিট ত্রিশ সেকেণ্ড পর।

'কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে, মরুভূমির ওপর দিয়ে গেছে শক ওয়েভ। ওটা ছিল নিউক্লিয়ার ব্লাস্টের মত। যদিও ব্যাঙের ছাতার মত মেঘ ছিল না।'

আবারও ডিসপ্লে দেখলেন ব্রায়ান। বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট পর জ্ঞান ফিরেছে তাঁর।

'ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত পনেরোটা কমার্শিয়াল এয়ারলাইন্স,' বললেন ক্যালাগু। 'সেগুলোর নয়টা পুরোপুরি বৈদ্যুতিক পাওয়ার হারিয়ে বাধ্য হয়েছে ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ড করতে। নেলিস রেইডার ও কমিউনিকেশন বন্ধ হয়েছে। সবচেয়ে বড় গ্রিড বিপর্যয় হয়েছে পশ্চিম উপকূলে। ভেগাস, হেণ্ডারসন এবং টাহোও হয়ে গেছে বিদ্যুৎহীন।'

কথাগুলো পাত্তা দিতে চাইলেন না ব্রায়ান।

'আরও খারাপ দিক,' যোগ করলেন ক্যালাগু, 'রাশা এবং চিন মিলে একইসঙ্গে অভিযোগ করেছে, আমরা নাকি টেস্ট ব্যান ট্রিটি ভেঙে পরীক্ষা করেছি নতুন সুপারওয়েপন। আগামী পরশু সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিং ডেকেছে ইউএন। তার মানে ছুটির দিনেও কাজ করতে হবে আমাদেরকে।'

ব্যথা করছে বলে মাথা টিপলেন ব্রায়ান। নানান দেশের অন্যায্য সব দাবি আর কড়া ধমক জটিল করে তুলেছে পরিস্থিতি।

'আপনি আসলে কী বলতে চান?' বিরক্ত সুরে জানতে চাইলেন তিনি।

'আমি বলতে চাই, আপনার ওই স্ফটিক খুবই বিপজ্জনক,' তিক্ত সুরে বললেন ক্যালাগু।

'এত ক্ষমতা যে জিনিসের, সেটা তো বিপজ্জনক হবেই,' বললেন ব্রায়ান। 'গাড়ি, অস্ত্র, বোমা, এসব এমনই হয়। এমন কী আপনি নিজেও বিপজ্জনক। প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে এগুলো ব্যবহার করবেন বিপদ এড়িয়ে।'

'ঠিকই ধরেছেন, ব্রায়ান। আমরা জানি না, ওই স্ফটিক কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। আসলে ওটা কী তা-ও জানি না। আমরা শুধু জানি, প্রায় একবছর ধরে গবেষণা করেও গুরুত্বপূর্ণ কিছুই আবিষ্কার করতে পারেননি আপনারা। আর সে কারণে আমাদের সবার প্যান্ট খারাব হওয়ার অবস্থা হয়েছে।'

লোকটা নিশ্চয়ই এরই ভেতর সব ডেটা প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, ভাবলেন ব্রায়ান। এমনিতেই নানা দেশের চাপ তাঁর ওপর। এখন মুখ রক্ষার মত জরুরি তথ্য না পেলে বিগড়ে বসবেন আমেরিকার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষটা।

তাঁর বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করবেন ডেটা সংগ্রহে, জানেন ব্রায়ান। বিস্ফোরণে সব নষ্ট হওয়ায় এরই ভেতর ইয়াকা মাউন্টেনে

পাঠানো হয়েছে আরও আধুনিক ইকুইপমেন্ট। চালানো হবে আরও কিছু পরীক্ষা।

খুলে গেল ট্রেইলারের দরজা। ভেতরে ঢুকল এয়ার ফোর্সের এক মেজর। পেছনে সিভিলিয়ান পোশাকে কয়েকজন। এঁদের একজন ব্রায়ানের চিফ অ্যানালিস্ট। দুর্ভাগ্য, বিস্ফোরণের সময় তিনি ট্রাকে ছিলেন না। এ ছাড়া রয়েছেন সিআইএর বেছে নেয়া এক বিজ্ঞানী। কঠোর চেহারা তাঁর। বয়স পঁয়তাল্লিশ। মিলিটারির জন্যে অত্যাধুনিক সব অস্ত্র তৈরির সঙ্গে জড়িত। তৃতীয় লোকটির বয়স অন্তত সত্তর। রেড ইণ্ডিয়ান। ঝুলঝুল করছে গাল ও গলার চামড়া। পাতলা হয়েছে মাথার সাদা চুল। থুতনিতে সামান্য দাড়ি। পরনে কাউবয় শার্ট ও হাজার খানেক পকেটওয়ালা কর্ডের প্যান্ট। পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে নানান যন্ত্রপাতি।

তাঁকে চিনে ফেললেন ব্রায়ান।

ক্যাথিবা আলিহা। নামকরা থিয়োরিটিকাল ফিযিসিস্ট। আগে কাজ করতেন নিউ মেক্সিকোর অ্যাণ্ডিয়া ল্যাব-এ। এখন আছেন ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্স-এ।

সুনাম আছে তাঁর পরিবারের। তাঁর দাদা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ছিলেন ন্যাভাজো কোড টকার্সের একজন। কোরিয়া যুদ্ধে সাহসিকতার জন্যে মেডেল পান ক্যাথিবা আলিহার বাবা। বড় ভাই ছিলেন রেড ইণ্ডিয়ানদের ভেতর প্রথম গ্রিন ব্যারেট। বুক ভরা ছিল মেডেল। তিনবার যান ভিয়েতনামে যুদ্ধ করতে।

নিজে মিলিটারিতে যোগ না দিয়ে কলেজে গেলেন ক্যাথিবা আলিহা। কিন্তু আত্মীয়দের চেয়েও বেশি নাম করেন মিলিটারির জন্যে নিউক্লিয়ার ট্রিগার আবিষ্কার করে। এখন ট্রাইডেন্ট মিসাইল আরও আধুনিক করা এবং মিসাইল ডিফেন্সের কাজে ব্যস্ত। সত্যি কখনও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে, ক্যাথিবা আলিহার অস্ত্রের কারণে যেমন হাজার হাজার মানুষ খুন হবে, তেমনি

হাজার হাজার মানুষ রক্ষা পাবে আমেরিকার।

সিআইএ চিফের কথা থেকে এরই ভেতর ব্রায়ান বুঝেছেন, লোকটা চাইছে ধ্বংস করে দেয়া হোক ব্রাযিল স্টোন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত মত অন্যরকম। ভয়ঙ্কর অনুচিত হবে ওই স্ফটিক বিনষ্ট করা। তবে আর কোনও উপায় না পেলে শেষে হয়তো তাই করতে হবে।

স্ফটিক ধ্বংস করা বা রেখে দেয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন ক্যাথিবা আলিহা। শেষ সিদ্ধান্ত হয়তো নির্ভর করবে তাঁর ওপর।

উঠে বিজ্ঞানীর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন ব্রায়ান। ট্রেইলারের গবেষণাগারে ঢুকে পড়লেন ক্যাথিবা আলিহা। তাঁর সঙ্গে থাকলেন ব্রায়ান। খেয়াল করলেন, স্ফটিক দেখে কুঁচকে উঠেছে রেড ইণ্ডিয়ানের ভুরু। ঠোঁটে চেপে বসল ঠোঁট। কৌতূহলের কারণেও এমন হতে পারে। অথবা, ওটা তাঁর অভ্যেস। তবে ব্রায়ানের মনে হলো, জ্বলজ্বলে স্ফটিক দেখে চরম বিরক্ত হয়েছেন বিজ্ঞানী।

ঊনত্রিশ

ভেবেচিন্তে ফাইভ স্টার হোটেলেই উঠেছে মাসুদ রানা। এখন বসে আছে ব্যালকনির চেয়ারে। জায়গাটা পুয়ের্তো আযুল থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে। উপকূলীয় অন্যসব এলাকার মতই বিদ্যুৎ নেই। তাতে খুশিই রানা, ওদের তথ্য ইলেকট্রনিকালি রেকর্ড করতে পারেনি ডেস্ক ম্যানেজার।

রানা ঘুষ দিয়েছে বলে বিদ্যুৎ ফিরলেও ওদের ব্যাপারে তথ্য তুলতে ভুলে যাবে লোকটা। আগাম টাকা দিয়েছে বলে পাশাপাশি দুটো ঘর পেয়েছে। বলে দেয়া হয়েছে, আগামী পাঁচ দিন ওদের উপস্থিতি গোপন রাখলে লোকটা পাবে আরও এক হাজার ডলার। তবে রানা জানে, আগেই এখান থেকে সরে যাবে ওরা।

বিদ্যুৎ তো নেই, তার ওপর চাঁদও নেই আকাশে। কুচকুচে কালো লাগছে সাগর। ওদিকে তৈরি হচ্ছে দুটো ভারী বজ্রবৃষ্টির ঝড়। থেকে থেকে ঝিলিক মেরে রাতকে ফরসা করে দিচ্ছে লালচে-কমলা বজ্রবিদ্যুৎ। জ্বলে উঠছে মেঘের বুকে হাজারখানেক আঁকাবাঁকা বর্শা। সেই আলোয় অদ্ভুত সুন্দর লাগছে মিতাকে।

মোমবাতির আলোয় চুপচাপ বসে আছে ওরা।

সাগর থেকে এসে শহর ছেয়ে ফেলছে ঝড়ের মেঘ। থমথম করছে চারপাশ। রানা ভাবছে, অতীতের কথা। কিছুক্ষণ পর ফিরল বাস্তবে। মস্তবড় বিপদে আছে ওরা। একদিকে রাশান এফএসবি, অন্য দিকে হুয়াং লি ল্যাং-এর লোক। যে-কোনও সময়ে খুন হবে ওরা। তবু ভাল লাগছে, পাশেই আছে মিতা। বড় অদ্ভুত কোমল হৃদয়ের মেয়ে। মায়ের মত আগলে রেখেছে পাবলোকে। ছেলেটাও অন্তর থেকে ভালবেসে ফেলেছে ওকে।

রানা বুঝতে পারছে, ঠিকই হামলা হবে। তখন বৃদ্ধ আর্কিওলজিস্ট ও মিতার পাশে থাকবে ও, যে ভয়ানক বিপদই হোক না কেন। এখনও ওরা স্থির করতে পারেনি কোথায় লুকিয়ে রাখবে পাবলোকে।

ঘরে গিয়ে ঢুকল মিতা। চুপ করে বসে থাকল রানা। পাঁচ মিনিট পর আবার ফিরে এল মেয়েটা।

মোমবাতির আলোয় মুখ তুলে ওকে দেখল রানা। 'তোমার রোগীর কী অবস্থা?'

রানার পাশের চেয়ারে বসল মিতা। 'প্রফেসরের ইনফেকশন কমে গেছে। বসে বসে কাজ করছেন। তোমার বিশ্বাস হবে না, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে পাবলো।'

'আমার মাথায় ওভাবে বিলি কেটে দিলে আমিও ঘুমাতাম,' মৃদু হাসল রানা।

'মানা তো করিনি!' লজ্জায় লাল হলো মিতার গাল। 'ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। তোমার বোধহয় লাগবে না?'

'না। লাগবে না।' দূরের অন্ধকারে তাকাল রানা।

'জানলে, কীভাবে আমাদের খুঁজে নিয়েছিল লোকগুলো?' জানতে চাইল মিতা।

'সম্ভবত বোটের ডিলারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'প্রশ্ন হচ্ছেঃ ওরা জানল কীভাবে, আমরা ওদিকে আছি।'

'পাহাড়ি দ্বীপের মূর্তি থেকে তথ্য পেয়েছে,' বলল মিতা। 'ওটা দেখেই মায়ান মন্দির খুঁজে নিয়েছিলেন প্রফেসর।'

'তুমি বলেছিলে ভেঙে দিয়েছ হায়ারোগ্লিফ্‌গুলো।'

'সাধ্যমত করেছি,' বলল মিতা। 'তা যথেষ্ট ছিল না।'

মুখ ফিরিয়ে মিতাকে দেখল রানা।

'তুমি কি খুব চিন্তিত?' জানতে চাইল মিতা।

'হ্যাঁ। যে-কোনও সময়ে বিপদ আসবে।'

স্মিত হাসল মিতা। 'অত চিন্তা কেন? মায়ান স্ফটিক এখন আমাদের কাছে, ধরতেও পারেনি শত্রুরা। পাবলো ঠিক আছে। আমরাও সবাই সুস্থ। আর কী চাই?'

অস্থির লাগছে রানার মন।

আকাশ চিরে এক পাশ থেকে আরেক পাশে গেল সাদা ঝিলিক। চোখে পড়ল দিগন্ত ও নিচের সাগর। কয়েক সেকেণ্ড পর এল আবছা আওয়াজ। ওই আলো দেখে আবারও মায়ান স্ফটিকের কথা মনে পড়েছে রানার। 'বোটে ওই শক ওয়েভ

কীসের, বুঝতে পেরেছ, মিতা?'

'এনার্জি তৈরি করে এসব স্ফটিক,' বলল মেয়েটা। 'বিচ্ছুরণ হয় ওগুলো থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ।'

'মন্দির থেকে ওটাকে সরিয়ে নিয়েছি বলে এমন হয়েছে?'

'আমিও তাই ভাবছি। তবে সেসময়ে শক ওয়েভ না এলে খুন হতাম আমরা। সৈকতে নামলেই গুলি করত চিনারা।'

'কাকতালীয়,' বলল রানা।

দূরের ঝড়ের দিকে চেয়ে নরম সুরে বলল মিতা, 'তুমি তো না-ও আসতে পারতে আমার সঙ্গে?'

'টাকা পাব বলে হয়তো এসেছি?' হাসল রানা।

'কে দেবে টাকা?'

'এরই ভেতর ফাণ্ডে জমা নিজের সব টাকা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান। পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারি বাকি জীবন।'

'সত্যিই অত টাকা দিয়েছেন?'

মাথা দোলাল রানা। 'তোমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন। তাই ফিরে পাওয়ার জন্যে পথে নেমে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েছেন।'

'মায়ান স্ফটিক খোঁজার ব্যাপারে তাঁকে রাজি করিয়েছিলেন হ্যারিসন, তাই আমিও আসি এই অভিযানে,' বলল মিতা। 'তারপর যখন কিডন্যাপ হলাম, সব দায় নিজের কাঁধে তুলে নিলেন আঙ্কেল ব্রায়ান। অদ্ভুত ভাল মানুষ।'

'উদ্ধার পেয়েও দেশে ফিরলে না,' বলল রানা। 'তুমি নিজেও ভাল, তাই প্রফেসরকে খুঁজতে গিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছ। ভুলে যেতে পারতে তাঁর কথা, তা না করে চেয়েছ তাঁকে নিরাপদে রাখতে।'

'স্রেফ দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছি।' রানার চোখে তাকাল মিতা। 'সব ফেলে আমার জন্যে ছুটে গেলে তুমি হংকঙে, এটাই আমাকে অবাক করেছে। বুঝে গেছি, যাদেরকে পছন্দ

করো, তারা বিপদে পড়লে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করো না তুমি।'

চুপ করে থাকল রানা।

'তুমি এমনই, তাই না? কখনও হেরে যেতে চাও না।'

মোমবাতির আলোয় লোভনীয় লাগছে মিতার অধর।

অস্ফুট স্বরে কী যেন বলল মিতা। একটু ফাঁক হলো ঠোঁট।

হঠাৎ ওর দিকে ঝুঁকল রানা।

পরস্পরের চোখে চোখ, বুকে অদ্ভুত এক তোলপাড়।

ছুঁয়ে গেল দু'জনের ঠোঁট, কিন্তু তখনই বেরসিকের মত বেজে উঠল রানার স্যাটেলাইট ফোন। পকেট থেকে ওটা বের করে স্ক্রিন দেখল রানা। 'মিস্টার ব্রায়ান।' চেয়ারে হেলান দিয়ে স্পিকার অন করে কল রিসিভ করল ও। 'বলুন?'

বিস্মিত সুরে বললেন এনআরআই চিফ: 'পশ্চিম উপকূলে

খুব কম মোবাইল ফোন এখনও কাজ করছে। কপাল ভাল যে আপনার ফোন এখনও চালু।'

'আমারটা বিসিআই থেকে পাওয়া সোলার পাওয়ার্ড ফোন,' বলল রানা।

'দুঃখিত, দেরি করেছি যোগাযোগ করতে,' বললেন ব্রায়ান। 'খুব ব্যস্ত ছিলাম। এদিকে ঘটে গেছে দুর্ঘটনা।'

ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন তিনি। শেষে বললেন, সুযোগ পেয়ে এনআরআই-এর ঘাড়ে চেপে বসতে চাইছে এখন সিআইএ। তাদের ধারণা, ধ্বংস করে দেয়া উচিত মায়ান স্ফটিক।

'আপনি এখন কোথায় এবং কী করছেন?' জানতে চাইল রানা।

'ইয়াকা মাউন্টেনে, দেখছি আবারও এনার্জি বিচ্ছুরণ হবে কি না ওই পাথর থেকে। সময়ের আগেই হঠাৎ করে বসেছে।'

পরস্পরকে দেখল রানা ও মিতা।

বোট আর ইয়াকা মাউন্টেনে একইসময়ে তৈরি হয়েছিল

শক ওয়েভ। হয়তো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

'বোধহয় জানি কী হয়েছে,' বলল রানা।

'বলুন তো?'

'আরেকটা মায়ান স্ফটিক পেয়েছি। ওটা ছিল উপকূল থেকে আট মাইল গভীর সাগরে এক ডুবো মন্দিরে।'

'দুর্দান্ত খবর,' খুশি হলেন ব্রায়ান।

'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এনার্জি বিচ্ছুরণ হয়েছে আমাদের স্ফটিক থেকেও। সেজন্যে চলে গেছে ইউক্যাটানের অর্ধেক এলাকার বিদ্যুৎ।'

'আমাদেরটাও একই কাজ করেছে,' বললেন ব্রায়ান।

'আমার ভুল না হলে এসব স্ফটিক সর্বক্ষণ সিগনাল দেয় পরস্পরকে,' বলল রানা।

'একটা আরেকটাকে খুঁজে নেয়, যেমনটা করে কমপিউটারের নেটওঅর্ক?'

এবার আলোচনায় যোগ দিল মিতা। 'আপনার স্ফটিক ছিল পাঁচ নম্বর দালানের নিচে, আর আমাদেরটা ছিল উপসাগরের পঞ্চাশ ফুট নিচে। চারপাশ থেকে ঘেরা ছিল হাজার হাজার টন পাথর ও প্রবালে। কিন্তু যখন সরিয়ে নিলেন আপনাদের স্ফটিক, ওই একইসময়ে সাগর থেকে আরেকটাকে তুলে এনেছি আমরা।'

'দুটোর শক ওয়েভ কাকতালীয় মনে হচ্ছে না,' সায় দেয়ার সুরে বললেন এনআরআই চিফ। 'এনার্জি ওয়েভ কীভাবে বাড়ে, ওটা নিয়ে গবেষণা করছি আমরা। হঠাৎ বিকিরণ হলো। স্ফটিকের ভেতর ম্যালফাংশান হয়েছে, অথবা ওই দুই স্ফটিকের ওয়েভ মিলে যেতেই তৈরি হয়েছে শক ওয়েভ।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল মিতা।

'ফলে নতুন তথ্য পাব,' ব্রায়ানের কণ্ঠে ফুটে উঠেছে সামান্য স্বস্তি। 'এবার হয়তো বুঝব, কী কারণে বেড়ে গেল

সিগনাল।'

'অস্বাভাবিক এসব স্ফটিক নিজেদের ভেতর সংযোগ রাখছে,' ফিযিসিস্ট হিসেবে মতামত দিল মিতা, 'হয়তো কোনও নেটওঅর্ক আছে?'

'শক ওয়েভের সময় হয়তো ছিল,' বললেন ব্রায়ান, 'এখন নেই। তা ছাড়া, কনটেন্টমেন্ট সাইটের মত ইয়াকা মাউন্টেনের টানেল। হয়তো সেজন্যে এখানে আনার পর খুব সাধারণ হয়ে গেছে ব্রাযিল স্টোন।'

আপত্তি তুলল না মিতা।

'তোমার নতুন এই থিয়োরি অনুযায়ী কাজে নামব আমরা,' বললেন ব্রায়ান। 'আমার ধারণা, ঠিক পথেই ভাবছ।'

'এবার দেখবেন দুই স্ফটিক এক হলে কি ঘটে?' জানতে চাইল মিতা। 'আমরা অবশ্য এ দেশের সিকিউরিটি এড়িয়ে আমেরিকায় জিনিসটা নিতে পারব না। তা ছাড়া, ওটা বিমানে তোলাও নিরাপদ নয়।'

'ঠিক,' সায় দিলেন ব্রায়ান। 'আপাতত রাখো তোমাদের কাছে। চেষ্টা করো ওটাকে বদ্ধ কোথাও রাখতে। নইলে আবারও দেশ জুড়ে বৈদ্যুতিক বিপর্যয় হতে পারে।'

'চেষ্টা করব আগলে রাখতে,' কথা দিল মিতা।

'আপনি দেখুন পাবলোকে সরাবার জন্যে কাগজপত্র পাঠাতে পারেন কি না,' বলল রানা।

'আপনাদের সঙ্গে ও থাকলে অসুবিধা কী?'

'ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পালসের জন্যে ক্ষতি হচ্ছে ওর,' বলল রানা। 'আপাতত সুস্থ, কিন্তু ওকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে দেয়া উচিত। রাশানরা যে এক্সপেরিমেন্ট করেছে, সে কারণে বিচ্ছুরণ হলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ও।'

'আসলে কী করেছিল রাশানরা?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান।

'ব্রেনে কিছু ইমপ্ল্যান্ট করেছিল,' বলল মিতা, 'শক

ওয়েভের পর আধঘণ্টা অজ্ঞান ছিল। হাসপাতালে নিয়ে এমআরআই করিয়েছি।' বড় করে দম নিল ও। 'বড় কথা, ওর দরকার ভাল একটা পরিবার। আমাদের সঙ্গে রয়ে গেলে যে-কোনও সময়ে বিপদে পড়বে।'

চুপ করে আছেন ব্রায়ান।

'গোপনে নিতে পারবেন ওকে আমেরিকায়?' জানতে চাইল রানা।

'আগেও বলেছি, একবার ওকে পেলে গাপ করে দেবে সিআইএ,' তিক্ত স্বরে বললেন ব্রায়ান। 'ওটা আরও খারাপ হবে। তার চেয়ে দিমিতভের হাতে ওকে তুলে দেয়াও ভাল।'

রেগে গেছে মিতা। কাটা কাটা স্বরে বলল, 'আমরা চাইলেই তো ওর মত ছোট্ট বাচ্চাকে বিপদের ভেতর রাখতে পারি না!'

'বুঝতে পারছি কী বলছ, কিন্তু আপাতত আমি নাচার,' বললেন এনআরআই চিফ।

'আমরাও প্রায় নাচার,' বলল মিতা, 'বিপদের ভেতর আছি।'

'রানার কাছে বেশি নিরাপদ থাকবে ছেলেটা,' অপরাধী সুরে বললেন ব্রায়ান। কয়েক সেকেণ্ড পর জিজ্ঞেস করলেন, 'আসলে ওখানে কী ঘটছে?'

'পিছনে লেগে গেছে চিনা বিলিয়নেয়ার আর রাশানরা।'

'ওই দুটো দেশই খেপে গেছে আমাদের ওপর,' বললেন এনআরআই চিফ। 'বলছে, আমরা নাকি গোপনে নিষিদ্ধ কোনও শক্তিশালী অস্ত্র পরীক্ষা করছি। ওটার ওপর আমাদের নিজেদেরই নিয়ন্ত্রণ নেই। তাদের সঙ্গে একমত সিআইএ চিফ ক্যালাগু। এখন সেটাই বোঝাতে চাইছে প্রেসিডেন্টকে। তিনি হয়তো বুঝবেন না যে এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়। মনোভাব পাল্টে ফেলতে পারেন। তা হলে সমস্ত দায় পড়বে এনআরআই

বা আমার ওপর।'

'এসব থেকে কী বুঝব?' জানতে চাইল রানা।

'চিনা বিলিয়নেয়ারের কিডন্যাপ করা এক রাশান ছেলেকে আমরা কিডন্যাপ করে সরিয়ে নিলে, সমস্ত দোষ পড়বে আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর ওপর।'

'তা হলে ব্যবস্থা করুন কোনও সেফহাউসের,' বলল রানা।

'মেক্সিকোতে? এনআরআই-এর? তেমন কিছু আমাদের নেই!'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। খেয়াল করল, দরজা দিয়ে ঘরে চোখ রেখেছে মিতা। বিছানায় ঘুমিয়ে আছে পাবলো।

রানার মনে হলো, ফালতু এবং নিষ্ঠুর একটা দেশের জন্যে নিরীহ বাচ্চাটার জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে ও। ওই একই বিপদ ঘাড়ে নিয়েছে মিতা ও প্রফেসর হ্যারিসন। অথচ, এদের তিনজনকে আগলে রাখা প্রায় অসম্ভব ওর পক্ষে!

মেঘের মত গুড়গুড় করে উঠল ওর কণ্ঠ, 'বলতে চাইছেন, আমাদের সঙ্গে পাবলোর রয়ে যাওয়াই নিরাপদ?'

'তা নয়,' নরম সুরে বললেন ব্রায়ান, 'বলছি, ছেলেটাকে এ দেশে আনলে ক্ষতি হবে ওর। ওকে কেড়ে নেবে সিআইএ বা মিলিটারি। তাতে লাভ হবে না আমাদের কারও।'

ঝিরঝির করে একরাশ হাওয়া বইল ব্যালকনিতে। চুপ করে আছে রানা। ওকে দেখছে মিতা, চোখে দ্বিধা ও ভয়। এই রানাকে চেনে না ও।

'সবমিলে পাবেন বিরানব্বুই ঘণ্টা,' বললেন ব্রায়ান, 'তারপর একসঙ্গে বাড়বে দুই স্ফটিকের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিচ্ছুরণ।'

একটু পর বলল রানা, 'কী করব, সেটা ফোনে আপনাকে পরে জানিয়ে দেব।' বিরক্ত হয়ে কল কেটে দিল ও।

বাড়ছে বাতাসের জোর। শীতল হয়ে উঠছে চারপাশ। কাত

হয়ে ব্যালকনির মেঝেতে পড়ল বৃষ্টির বড় কয়েকটা ফোঁটা। তারপরই শুরু হলো ঝমাঝম বর্ষণ। বিজলি জ্বলে উঠল সাগরের বুকে। সেই আলোয় দেখা গেল অস্থির সব বড় ঢেউ।

চুপ করে দূরের ঝড় দেখছে মিতা।

রানার মনে হলো, মেয়েটার বুকেও ভীষণ তুফান। কীসের, বোঝা কঠিন। ওর মগজে ঘুরছে ব্রায়ানের গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা: 'সবমিলে পাবেন বিরানব্বুই ঘণ্টা, তারপর বাড়বে দুই স্ফটিকের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিচ্ছুরণ।'

কী ঘটতে চলেছে আসলে?

মিতার কাঁধে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল রানা।

বিপদের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে ওদেরকে।

ত্রিশ

ক্যামপেচে শহরতলীতে বিশাল ওয়্যারহাউসটি হুয়াং লি ল্যাং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান। আপাতত এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে সাধারণ সব ব্যবসার মালপত্র। ওয়্যারহাউস ব্যবহার হচ্ছে ল্যাং-এর ব্যক্তিগত কাজে। আশা করা হচ্ছে, যে-কোনও দিন বিলিয়নেয়ার পাবে তার সাধের মায়ান স্ফটিক।

হুইল-চেয়ারে বসে সবার ব্যস্ততা দেখছে ল্যাং। পেছনের দেয়ালের কাছে স্কাইক্রেন হেলিকপ্টার। ওটা দিয়েই আইলা কিউবার্তো দ্বীপ থেকে আনা হয়েছিল রাজার মূর্তি। নতুন মিশনের জন্যে পাশেই আরও দুটো হেলিকপ্টার। দেয়াল ঘেঁষে

অসংখ্য ইকুইপমেন্ট। একপাশে আর্মার্ড ভেহিকেল, ইনফ্লেটেবল রাফট, দু'জন আরোহীর উপযোগী সাবমেরিন ও কয়েকটি ড্রোন। শেষের চাইনিজ জিনিসটা ইউ.এস. আর্মির প্রিডেটর ড্রোনের মতই।

চারপাশে চেয়ে গর্বে বুক ভরে গেল ল্যাং-এর। পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী। বছরের পর বছর ধরে বাড়ছে তার হাই-টেক সব ইকুইপমেন্ট। সে-কারণেই যুদ্ধে জয় পাবে সে।

ক্রমেই বেড়েছে শারীরিক অসুস্থতা, তাই বাধ্য হয়ে এসব আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে চোখ রেখেছে সাম্রাজ্যের ওপর। অসুখ বাড়তেই সে সুযোগ নিয়ে তাকে শেষ করতে চেয়েছে অন্য বিলিয়নেয়াররা। তা সম্ভব হয়নি শুধু টেকনোলজির কারণে। অসুস্থতার শুরুর দিকেই সে বুঝে গিয়েছিল, চারপাশে নজর রাখার ক্ষমতা মানুষের বড় কম। তাই নানান দিক থেকে হামলা করবে বাইরের শত্রুরা।

তার ওপর ছিল ঘরের শত্রু। অনেকেই চেয়েছে, শেষ হোক ল্যাং ইণ্ডাস্ট্রি। চরম অসুস্থতার ভেতর বাধ্য হয়ে ব্যবহার করল সে আলট্রামডার্ন সার্ভেইলেন্স সিস্টেম।

আশপাশের প্রতি ইঞ্চি জায়গায় চোখ রাখল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সফ্‌ট্‌ওয়্যার। শত শত অ্যানালিস্টকে চাকরি থেকে বিদায় করে ওই কাজ নিল আধুনিক সব প্রোগ্রাম। নজরদারীর ভেতর পড়ল দক্ষ ও অদক্ষ সবাই। প্রোগ্রাম স্থির করল, কাকে চাকরিতে রাখবে, আর কাকে নয়। আজকাল কোনও মিটিং হয় না। কাজ করে না আবেগ বা বন্ধুত্ব; শুধু ডেটা ও অ্যালগোরিদম বলে দিচ্ছে কী করতে হবে আর কী করতে হবে না। বাড়তি মানুষ বিদায় নেয়ায় মুনাফা বেড়েছে ল্যাং-এর প্রতিষ্ঠানের।

এবার স্ফটিক খুঁজতে অত্যাধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করছে ল্যাং। ক্যাং লাউ এবং তার দলের লোক যতই চেষ্টা করুক, সে বুঝে গেছে, শেষপর্যন্ত জিততে আধুনিক যন্ত্রপাতি।

ওসব চালাতে মানুষের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তারা ভুল করলেও কখনও ব্যর্থ হয় না মেশিন।

ল্যাং-এর ধারণা, ক্যাং লাউ বা তার দল বড়জোর স্পেয়ার পার্টস্। নষ্ট হলে বদলে নেবে। মূল কথা: চালু রাখতে হবে দরকারী মেশিন।

ল্যাং-এর সামনে এসে থামল এক ডাক্তার। নতুন চিকিৎসার জন্যে তৈরি।

হুইল-চেয়ার ঘুরিয়ে নিল ল্যাং, চলল টেস্টের টেবিলের দিকে। বরাবরের মতই পাশেই থাকল বিশ্বস্ত ক্যাং লাউ।

ধাতব টেবিলে নানান চেনা ইকুইপমেন্টের সামনে পৌঁছুল ল্যাং। সেগুলোর ভেতর রয়েছে ইলেকট্রিকাল স্টিমুলেটর, মনিটর বা পাওয়ার প্যাক।

'আপনি কি তৈরি?' জানতে চাইল ডাক্তার।

'টেস্ট শেষ?' জানতে চাইল ল্যাং।

মাথা দোলাল ডাক্তার। 'আগের পরীক্ষা থেকে ফিডব্যাক ও ডায়াগনস্টিক দেখে স্থির করা হয়েছে, কীভাবে চলবে চিকিৎসা।'

এবার বোঝা যাবে সুস্থ হবে কি না ল্যাং। মৃদু মাথা দোলাল সে। বাড়িয়ে দিল মুচড়ে থাকা হাত। 'বেশ। কাজ শুরু করুন।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল ডাক্তার। টেনে নিল বিলিয়নেয়ারের বাহু। ওটার সঙ্গে যুক্ত করল কাঁধে রাখার মত অদ্ভুত এক হার্নেস। প্রায় বেঁধে ফেলল ল্যাংকে। হার্নেসের নির্দিষ্ট জায়গায় একের পর এক কেবল লাগাল কয়েকজন ডাক্তার।

'আপনি চিকিৎসা নিন, আমি যাই,' বলল লাউ।

'না, এখানেই থাকবে,' নির্দেশ দিল ল্যাং।

অস্বস্তি নিয়ে পাশের চেয়ারে বসল বিশ্বস্ত স্যাঙাত।

কাজে নেমে পড়ল ডাক্তাররা।

ওদিকেই এল হলদে এক ফোর্কলিফ্ট্। বয়ে আনছে বড়

সব বাক্স। টেবিলের পাশে নামিয়ে দিয়ে গেল। দৌড়ে এসে বাক্স খুলল কয়েকজন মজুর। সবচেয়ে বড় বাক্স থেকে বেরোল বিশাল এক যন্ত্র, দেখতে চতুর্পদী খচ্চরের মত। মাঝে শক্তিশালী ইঞ্জিনটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে কমপিউটার, নিখুঁত ভারসাম্য রাখবে যন্ত্র, চলবে যে-কোনও উঁচু-নিচু জমিতে। ওটার সঙ্গে আছে কয়েক শ' পাউণ্ড ওজনের নানান ইকুইপমেন্ট।

ব্যস্ত হয়ে মেশিন অ্যাসেম্বল করছে ল্যাং-এর টেকনিশিয়ানরা। বিরক্তি নিয়ে ওদিকে চেয়ে রইল ক্যাং লাউ।

'তোমার বোধহয় ভাল লাগছে না?' জানতে চাইল ল্যাং।

দ্বিধা করল লাউ।

'তোমার মনে হচ্ছে খামোকা এসব করছি?' রাগ চেপে বলল ল্যাং।

'আপনার এত ইকুইপমেন্ট আমাদেরকে দেরি করিয়ে দেবে,' বলল লাউ।

'না, তার উল্টো হবে,' বলল বিলিয়নেয়ার।

তার ও কেবল ঠিক জায়গায় আটকে দিয়েছে ডাক্তাররা। ল্যাং-এর বাহুর ওপর বেঁধে দেয়া হলো হার্নেসের পাওয়ার প্যাক। প্রশংসার চোখে টাইটানিয়ামের ব্রেস, হাইড্রোলিক, অ্যাকচুয়েটর, নকল কনুই ও কাঁধের জয়েন্ট দেখল ল্যাং। কবজিতে ভবিষ্যতের বডি আর্মারের মত জিনিস। বাস্তবে ওটা আরও বেশি কিছু।

সব পরীক্ষা করল ডাক্তাররা। অ্যাডজাস্ট করল কিছু জিনিস। নতুন করে টাইট দিল কয়েকটা স্ট্র্যাপ। এবার নানান ছোট মেশিন আটকে দেয়া হলো ল্যাং-এর আঙুলে।

'ওই ছেলে বা মেয়েটার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার,' বলল ল্যাং, 'বারবার তোমাকে ফাঁকি দিয়ে গেছে তারা।'

'আপাতত। কিন্তু ঠিকই ওদেরকে হাতের মুঠোয় পাব,' বলল ক্যাং লাউ।

'গতকাল প্রায় পেয়ে গিয়েছিলে,' বলল ল্যাং, 'কিন্তু তোমাকে বোকা বানিয়ে উধাও হয়েছে।'

ক্যাং ও ল্যাং-এর মাঝে টেবিলের পাশে থামল এক ডাক্তার। ল্যাং-এর আঙুলের তারের সঙ্গে আটকে দিল অ্যাকচুয়েটর।

'প্রথম সুযোগে পালিয়ে গেছে,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল লাউ। 'পারত না, কিন্তু তখনই এল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বার্স্ট। তবে তার আগে সরাসরি আমরা যেতে পেরেছি সাগরের ওই মন্দিরের কাছে। এখন আমাদের লোক ডাইভ দিচ্ছে ওখানে। মন্দিরের হায়ারোগ্লিফের ছবি তুলছে। দু'এক দিনের ভেতর অনুবাদ হবে সব। নতুন তথ্য পেলেই সরাসরি যাব পরের গন্তব্যে।'

কথা শুনে খুশি হলো না ল্যাং। 'তুমি দেরি না করলে অনেক আগেই ওই মন্দির থেকে স্ফটিক পেয়ে যেতাম।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল লাউ, 'কিন্তু বড় সমস্যা হয়নি, জেনে গেছি ওদের থিয়োরি। সবমিলে আছে মোট চারটে স্ফটিক। তার মানে রয়ে গেছে আরও দুটো।'

'না,' নিশ্চিত সুরে বলল ল্যাং। 'ওই জিনিস আছে আর মাত্র একটা।'

অবাক চোখে তাকে দেখল লাউ।

প্রিয় কুকুরের সঙ্গে কথা বলার সময় যেমন নরম হয় মানুষের কণ্ঠ, সেই সুরে বলল ল্যাং, 'জানি, এসব ভালভাবে বোঝার যোগ্যতা বা দূরদৃষ্টি তোমার নেই। তুমি আসলে যন্ত্রের সামান্য একটা পার্টস্, যেটাকে দরকারে ব্যবহার করা হয়।'

টেকনিশিয়ানদের দিকে দেখাল সে। তারা টুইযার দিয়ে সরু সব তার আটকে দিচ্ছে হাতের নানান নার্ভ জংশনে।

প্রতিবারে সামান্য নড়ে উঠছে ল্যাং-এর বাহু।

'সূক্ষ্ম কাজে ধারালো তলোয়ারের ফলার বদলে হাতুড়ি ব্যবহার করলে যা হয়,' বলল ল্যাং, 'হাতুড়ির দোষ দিতে পারে না মজুর। আসলে নিজের কাজ না বুঝে সময় নষ্ট করেছ। আমি কাজ বুঝিয়ে দিয়েছি বলে দোষটা আমার হতে পারে না। চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছ তুমি।'

'এখন আমাদের কাছে যে ধরনের তথ্য আছে, এবার ওদের আগেই পরের সাইটে পৌঁছব,' বলল লাউ। 'ওরা যখন ওখানে পৌঁছুবে, দেখবে অপেক্ষা করছি আমরা। তখন ফাঁদ পেতে ধরব ওদেরকে। পালাতে পারবে না চাইলেও।'

'আমরা এবার পাওয়ার দেব,' বলল টেকনিশিয়ানদের নেতা।

বিরক্ত চোখে তাকে দেখল ক্যাং লাউ।

'কাজ শুরু করো,' বলল ল্যাং। মেশিন চালু হতেই সামান্য নড়ল তার বাহু।

টেকনিশিয়ানদের সামনে গোপন কথা বলতে হচ্ছে বলে অপমানিত সুরে বলল লাউ, 'আমি চিন্তিত।'

'কী বিষয়ে?' বাহু নাড়াবার ডিভাইসটা দেখছে ল্যাং।

সাবধানে মুখ খুলল লাউ, 'বুঝতে পারছি আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন স্ফটিকের জন্যে, কিন্তু ওটার যে ভয়ঙ্কর শক্তি...'

লাউ মুখে মুখে কথা বলছে, তাই রাগী স্বরে বলল ল্যাং, 'রাশানরা ওটা ব্যবহার করেছে ছোট ছেলেটাকে সুস্থ করতে।'

'তা ঠিক। কিন্তু ওই স্ফটিকের টুকরো কী করেছে, তা নিজেই বুঝতে পারছেন। ওটা কিন্তু নিরাপদ নয় আমাদের জন্যে।'

সামান্য বিস্ফারিত হলো ল্যাং-এর চোখ। কড়া সুরে বলল, 'আমি যা চাই, সেটা সবসময় পেয়ে অভ্যস্ত।'

'তাই হবে, আপনার জন্যে ওটা কেড়ে এনে দেব,' বলল

লাউ। 'কিন্তু খুব সতর্ক হতে হবে আমাদেরকে।'

বাড়াবাড়ি করছে ক্যাং লাউ, রাগে অস্থির লাগল ল্যাং-এর। অন্য কিছুও খেয়াল করেছে। ধনদৌলতের লোভ পেয়ে বসেছে লাউয়ের। এ কারণেই বেঈমানি করছে, নির্দেশ অমান্য করছে। এখন পরিষ্কার সব বুঝতে পারছে সে। ইচ্ছে করেই ব্যর্থ হয়েছে লোকটা। তার চাই ল্যাং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালের মালিকানা।

'তুমি চাও যেন না পাই ওই স্ফটিক,' গনগনে রাগ নিয়ে বলল ল্যাং।

'না, তা ঠিক নয়,' বলল লাউ।

সবই বুঝেছি, আমি মরলেই পথ খুলবে তোমার, ভাবল ল্যাং। তুমিও আর সবার মতই বিশ্বাসঘাতক, লাউ!

'সুযোগ পেলে ওটা সরিয়ে ফেলবে,' বলল ল্যাং। 'তুমি চাও আমি মারা যাই!'

'না, ভুল ভাবছেন। আমি চাই আপনি যেন ওটা পান। তবে এটাও চাই, ওটার কারণে আপনি যেন বিপদে না পড়েন। সেজন্যে...'

কথা শেষ করতে পারল না ক্যাং লাউ। চোখ পড়েছে ল্যাং-এর কবজির কাছে। ওখানে অদ্ভুত এক ডিভাইস। ওটার ওপর ফণা তোলা সাপের মত নড়ছে ল্যাং-এর আঙুল। তালু মেলল ল্যাং।

ক্যাং লাউ ও হুয়াং লি ল্যাং-এর কাছেই কফিনের মত বড় এক ক্রেট খুলেছে টেকনিশিয়ান। ধুম শব্দে মেঝেতে পড়ল ডালা। বাক্সের ভেতরে ল্যাং-এর কাঁধ ও হাতের অদ্ভুতদর্শন মেশিনের মতই জিনিস। আরও আছে যান্ত্রিক দুই পা। বুক ও মাথার জন্যে বর্ম ও শিরস্ত্রাণের মত জিনিস। হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েটরের সঙ্গে এক বাণ্ডিল ওয়্যায়ার ও র‍্যাক ভরা জি ফোর লিথিয়াম ব্যাটারি।

ওদিকে চেয়ে খুশি হয়ে উঠল হুয়াং লি ল্যাং।

দ্বিধা ও ভয় ফুটল ক্যাং লাউয়ের মুখে।

'কয়েক বছর ধরে তোমার ওপর আমি নির্ভরশীল,' লাউকে বলল ল্যাং, 'সহ্য করেছি তোমার ব্যর্থতা। চুরি থেকে শুরু করে বেয়াদবি কম করোনি। তবে এখন থেকে তোমাকে আর দরকার পড়বে না আমার।'

তার বাহু ঝুলছে বড় একটা স্ক্রু-ড্রাইভারের ওপর। হাইড্রোলিক আঙুলগুলো চোখের পলকে খপ্ করে ধরল ওটা। পেছনে নিল স্ক্রু-ড্রাইভার, পরক্ষণে সামনে বাড়ল বাহু।

বুলেটের মত গতি চমকে দিল ক্যাং লাউকে। বোঝার আগেই বুকে গাঁথল স্ক্রু-ড্রাইভার। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ল সে। দু'হাতে বের করতে চাইল স্টিলের দণ্ড। কিন্তু হাড়ে লেগেছে, খুলল না ওটা। ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছে তাজা রক্ত।

বার কয়েক হাঁফিয়ে উঠে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করল লাউ। চোখ গেল মনিবের চোখে। বিড়বিড় করল, 'আমি... বেঈমান নই... ওদেরকে ধরে আনব... আপনার জন্যে...'

মৃতপ্রায় লাউকে মৃদু হেসে জানাল হুয়াং লি ল্যাং, 'তোমাকে আর লাগবে না, লাউ। যখন পাব ওদেরকে, আমি নিজেই শাস্তি দেব!'

একত্রিশ

দিনটা ভাল, ভাবছে পাবলো। জোরালো কোনও আওয়াজ নেই। ফিরে এসেছে বিদ্যুৎ। ধীরে ধীরে ঘুরছে সিলিং ফ্যান।

ঘাড় কাত করে ঘরের আরেক দিকে তাকাল পাবলো।

ওই যে টেবিলে বসে কী যেন করছে কালো, বুড়ো

লোকটা। বহু কিছু জানে সে। এমন কিছু দেখে বা শোনে, যেটা রানা, মিতা বা ও নিজে বুঝতে পারে না। খুব জানোয়ার লোক, জানে অনেক। কীসব ভাবতে থাকে আর বিড়বিড় করে কার সঙ্গে যেন কথা বলে। কিন্তু কাউকে দেখা যায় না।

বুড়োকে পছন্দ করে পাবলো। দয়ালু লোক। মিষ্টি করে কথা বলে। যদিও তার অচেনা ভাষা বোঝা যায় না। কাগজ-পেন্সিল পেলেই খসখস করে কীসব লেখে। আপন মনে কী যেন গাল দেয়। কমপিউটারের চাবি টেপে।

গরম হয়ে উঠছে কমপিউটার, টের পেল পাবলো। কে জানে, হয়তো একদিন পুড়েই যাবে মেশিনটা। ওটার জ্বলজ্বলে আলো পড়লেই জ্বলতে থাকে ওর চোখ।

না, ওই জিনিসটা ভাল না, ভাবল পাবলো।

বুড়োও ওটাকে বেশি পছন্দ করে না। মাঝে মাঝে চাপড় মারে ওটার পিঠে।

আচ্ছা, ওটা নিয়ে গিয়ে ব্যালকনি থেকে ফেলে দেয় না কেন?

চিন্তায় পড়ে গেল পাবলো। ও নিজেই কি ফেলে দেবে ওটা?

না, উচিত হবে না বোধহয়।

গাল দিলেও ওটাকে আগলে রাখে বুড়ো।

দরজা খুলে যেতেই ভেতরে ঢুকল সুন্দরী মেয়েটা। ওকে খুব ভালবাসে পাবলো। কী আদর করে খাইয়ে দেয়!

বুড়ো লোকটাকে কী যেন বলছে। কিচ্ছু বোঝা যায় না!

'কপাল খুলল, প্রফেসর?' জানতে চাইল মিতা।

'হাল ছাড়িনি। অনেক কিছু জেনেও গেছি।'

পাবলোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মিতা।

খুব ভাল মেয়ে, ভাবল পাবলো। এমন একটা আম্মু থাকলে ভাল হতো। কিন্তু আমার তো তেমন কেউ কখনও ছিল না।

কিন্তু মেয়েটা আম্মু হবে কী করে? বুড়োর সঙ্গে বসে কী যেন খোঁজে। রানার সঙ্গেও কথা বলে। কিন্তু মনে হয় না ওরা বিয়ে করেছে। ওরা কী যেন চায়। হয়তো একই জিনিস খুঁজছে না।

কাঁচের দরজার দিকে তাকাল পাবলো। ওদিকে আছে মাসুদ রানা। সে খুব গম্ভীর মানুষ। কিন্তু মনে হয় ওকে ভালইবাসে। কখনও কড়া সুরে কথা বলে না। মাথায় হাতও বুলিয়ে দেয় না। আগে যে লোকগুলো বা মেয়েগুলো আসত, তারা কখনও কখনও খুব বকত ওকে। রানা এমন নয়। রানা ওর বাবা হলে ভাল হতো। তা হলে কেউ বকতে পারত না ওকে।

ভুলও হতে পারে, তবে বোধহয় মিতা আর বুড়ো খুঁজছে কিছু। ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে রানা। কিন্তু পাহারা দিচ্ছে কেন?

আবারও বুড়োর দিকে ফিরে কথা বলে উঠল মিতা। 'আমরা যদি এম্ব্যাসির মাধ্যমে ওকে সরিয়ে নিতে পারি, তা হলে...'

'সম্ভব নয়,' বললেন প্রফেসর। 'মিস্টার ব্রায়ান তো আগেই বলেছেন, সিআইএ বা আর্মি কেড়ে নেবে পাবলোকে। এদিকে যে-কোনও সময়ে হামলা হবে মনে করছে রানা।'

প্লাস্টিকের ব্যাগ খুলল মিতা। ওটা থেকে নিল বেশ কয়েকটা বোতল।

ওষুধ, বুঝে গেল পাবলো। কখনও কখনও এমন বোতল থেকে ওকে ওষুধ খাওয়াত রাগী সব মহিলা। মিতা কখনও রাগারাগি করে না ওর সঙ্গে। ভাল মেয়ে। কিন্তু ওর আম্মু নয়। ওষুধগুলো কোনওটা কালো রঙের, কোনও হালকা রঙের। ওসব না খাওয়াই ভাল। ওষুধ খেলে মাঝে মাঝে শরীর খারাপ লাগে। মাথা ঘোরে, পেট ব্যথা হয়। মিতা কখনও ওকে ওষুধ দেয় না।

একটা বোতল থেকে দুটো ট্যাবলেট নিয়ে প্রফেসরের পাশে

থামল মিতা। 'এ-দুটো খেয়ে নিন।'

'কীসের ওষুধ?' জানতে চাইলেন হ্যারিসন।

'নতুন অ্যান্টিবায়োটিক। জ্বরটা প্রায় গেছে, ইনফেকশনও চলে যাচ্ছে। আগামী কয়েক দিনের ভেতর পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

হাত পেতে ট্যাবলেট দুটো নিলেন প্রফেসর। 'ধন্যবাদ।'

ঘুরে ব্যালকনির দিকে চলল মিতা।

কালো বুড়ো গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল। চোর-চোর চেহারা করে পকেটে পুরে ফেলল ট্যাবলেট দুটো।

সুন্দরী মেয়েটা কিছুই দেখতে পায়নি। জানবেও না ওষুধ খায়নি লোকটা। নতুন করে গরম মেশিনের দিকে ফিরেছে।

ওষুধ খেলে মন থেকে কিছু হারিয়ে যায়, তাই কালো লোকটা ওসব খাবে না, ভাবল পাবলো। অনেক কিছু দেখতে চায় সে, শুনতে চায় অনেক কিছু।

আনমনে ভাবল পাবলো, ভাল, বড় হলে কখনও ওষুধ খাবে না ও।

বত্রিশ

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে গ্রুম লেক বেস হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসতে হয়েছে এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ানকে। হামভিতে চেপে শটগানধারী সৈনিকরা আবারও ফিরিয়ে এনেছে তাঁকে ইয়াকা মাউন্টেনে। এইমাত্র চাকার গুড়গুড় আওয়াজ তুলে বিশাল সুড়ঙ্গে ঢুকছেন তাঁরা।

ডানদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে দানবীয় এক মেশিন, দেখলে মনে হবে স্যাটার্ন ভি বুস্টার। এক শ' টনের চেয়েও বেশি ওজন। ওই জিনিস দিয়েই খুঁড়ে নেয়া হয়েছে ইয়াকা মাউন্টেনের সুগভীর সুড়ঙ্গ। কাজ শেষ হলে ওটাকে আর সরানো হয়নি। তাতে একটা একটা করে খুলতে হতো নানান অংশ। রেখে দেয়া হয়েছে, দরকার পড়লে তৈরি করা হবে আরও সুড়ঙ্গ।

পিচের পথে চড়-চড় শব্দে প্রকাণ্ড ব্লাস্টডোর পেরোল হামভি, সামনেই টানা সুড়ঙ্গ। প্রায় জ্বলন্ত নেভাডার পরিবেশ থেকে ঢুকে পড়ল হামভি ঘুটঘুটে আঁধারে। তবে সিলিঙে দূরে দূরে জ্বলছে একটা করে বাতি। ওই আলোয় চলা কঠিন। জ্বেলে নেয়া হয়েছে জিপের হাই বিম।

'তোমরা এ পরিবেশে মানিয়ে নিলে কী করে?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান।

'সময় লেগেছে, স্যর,' বলল ড্রাইভার, 'দিনে তিনবার পাহাড় সার্চ করি। বিজ্ঞানীরা এলে খুশি হই। তবে আপনার মত এত বড় বিজ্ঞানী আগে কখনও আসেননি। মুখের কথা না, আপনাকে পাহারা দিয়ে এসেছে অন্তত বিশজন সৈনিক!'

আবারও সুড়ঙ্গের দূরে চোখ রাখলেন ব্রায়ান। শুরুর দিকে সুড়ঙ্গ তিনগুণ চওড়া। দু' শ' গজ যাওয়ার পর সরু হয়েছে টানেল। দুই লেনের রাস্তার মত। পাথর ও সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি। সরু, দীর্ঘ টানেলের ভেতর ব্রায়ানের মনে হলো আটকে আসছে দম। অথচ তিনি ক্লসট্রোফোবিক নন।

'দেয়াল বা ছাত ধসে পড়লে?' জানতে চাইলেন।

'চিন্তা নেই, স্যর,' বলল ড্রাইভার, 'একটু পর পর এস্কেপ ভেণ্ট। উঠে গেছে একেবারে পাহাড়ের মাথায়। কয়েক শ' ফুট মই বেয়ে উঠতে হবে। তবে পাগল হয়ে যাবেন পায়ের ব্যথায়।'

‘ও,’ খুশি হতে পারলেন না ব্রায়ান। ভাবছেন, চাপা পড়ে মরা ভাল, না শত শত ফুট মই বেয়ে পাহাড়ে ওঠা। আবার ওখান থেকে নামা। ‘কোনও এলিভেটর নেই?’

মাথা নাড়ল ড্রাইভার। ‘না, স্যর।’

একমাইল যাওয়ার পর হেডলাইটের আলোয় দূরে দেখা গেল চওড়া ল্যাব ট্রাক। ওটাকে পাশ কাটিয়ে আরও চার মাইল গেছে সুড়ঙ্গ। এরই ভেতর বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলেছেন, এই গভীরতা স্ফটিকের জন্যে যথেষ্ট কি না। আগেও নানান এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে টেস্ট টানেলে। সেগুলো ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। এসবের জন্যে মাইলের পর মাইল টেনে নেয়া হয়েছে পাওয়ার কেবল। এ কারণে এনআরআই ও সিআইএর টিম সহজেই ব্যবহার করতে পারছে আধুনিক সব মেশিনারি।

ট্রেইলারের পাশে রকেট স্লেড তৈরি রাখা হয়েছে। সাইড-ওয়াইণ্ডার মিসাইল থেকে খুলে ওখানে সেট করা হয়েছে মোটর, ক্রিটিকাল হলে দেরি না করে ব্রাযিল স্টোনটাকে ফেলা হবে পাহাড়ের প্রত্যন্ত গভীরে। তিন সেকেণ্ডে ধুলোয় মিশে যাবে ওটা।

ট্রেইলারের পাশে হামভি থামতেই নেমে পড়লেন ব্রায়ান, দুই ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন অস্থায়ী গবেষণাগারে। শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তে তৈরি তিনি, কিন্তু এখন অন্যদিকে মন সবার।

উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ইউএন মিটিং।

হাই-ডেফিনেশন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভি দেখছে ট্রেইলারের উপস্থিত সবাই। একের পর এক দেশের প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন।

সবার তর্জনী ইউনাইটেড স্টেটসের দিকে।

এমন কী বন্ধু সব রাষ্ট্রও কঠোর সুরে জানতে চাইছে, কী হয়েছিল আমেরিকার মরুভূমির ভেতর। সত্যিই কি আমেরিকা পরীক্ষা করেছে অচেনা কোনও বিপজ্জনক অস্ত্র?

চুপ করে আছেন ইউ.এস. অ্যাম্বাসেডার। নিজ বক্তব্য কখন দেয়ার সুযোগ পাবেন, এখনও জানেন না। পাথুরে চেহারা করে বসে নোট নিচ্ছেন। বামহাত হেডফোনের ওপর।

সার্কাস চলছে, ভাবলেন ব্রায়ান। সবচেয়ে খারাপ দিক, ওভাল অফিসে বসে এসব দেখছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টও। চলছে টেলিকনফারেন্স। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে চুপচাপ ইউএন তর্ক শুনছেন তিনি। কপাল ভাল, আপাতত ল্যাংলিতে ফিরেছে ক্যালাগু। আজ জ্বালাবে না লোকটা।

'অবস্থা কতটা খারাপ?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান।

নানান ডেটা থেকে চোখ তুললেন বিজ্ঞানী ক্যাথিবা আলিহা। 'কেউ জুয়া খেলতে চাইলে তার উচিত হবে না বাজির অঙ্ক বাড়িয়ে দেয়া।'

টিভির স্ক্রিনে মন দিলেন ব্রায়ান। চাইনিজ ডেলিগেট বলছেন, বিশেষ কোনও সুপারওয়েপন তৈরি করেছে আমেরিকা। ওটার কারণে নষ্ট হয়েছে চিনের কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হামলা। কাজটি অগ্রাহ্য করার মত নয় এবং বেআইনী। এর ফলে চিন ধরে নিতে পারে, যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তার বিরুদ্ধে। ডেলিগেট বললেন না, কী কারণে ইউ.এস. এলাকায় মরতে গেল চিনের 'কমিউনিকেশন' স্যাটেলাইট। দেশগুলোর ডেলিগেটরা ভাল করেই জানেন, আসলে গুপ্তচরের মত তথ্য সংগ্রহ করে এসব স্যাটেলাইট। তবে সেজন্যে ওগুলো ধ্বংস করে দিলে সত্যিই বেধে যেতে পারে অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ।

'সত্যিই কি পড়ে গেছে চিনা স্যাটেলাইট?' জানতে চাইলেন ব্রায়ান।

জবাব দিলেন প্রেসিডেন্ট, 'আমাদের কাছে তথ্য আছে, আজ সকাল থেকে ব্যস্ত হয়ে একটা ইনফরমেশন গ্যাদারিং স্যাটেলাইট খুঁজতে শুরু করেছে ওটাকে।'

‘কপাল,’ বিড়বিড় করলেন ব্রায়ান।

‘পরিস্থিতি আরও খারাপ,’ বললেন প্রেসিডেন্ট, ‘রাশানরা বলছে, তারাও হারিয়ে ফেলেছে একটা স্যাটেলাইট।’

বিড়বিড় করে কী যেন বললেন ব্রায়ান।

অন্য এক সুপারপাওয়ারের আকাশে নষ্ট হয়েছে স্যাটেলাইট। এবং চোখ রাখবেই না কেন রাশা বা চিন, ইউ.এস. রিয়াল এস্টেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাহারা দেয়া হয় নেলিস এয়ার ফোর্স বেস, গ্রুম লেকের এয়ারফিল্ড ও এরিয়া ৫১। ব্রায়ান যথেষ্ট অবাক হয়েছেন, ওই সময়ে আমেরিকার আকাশে ছিল মাত্র দুটো স্যাটেলাইট।

‘কোনও মিলিটারি মুভমেন্ট, স্যর?’

‘রাশা ও চিন নানা দিকে নিয়েছে নিজেদের আর্মির ডিভিশন,’ বললেন প্রেসিডেন্ট, ‘ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নেভি ও এয়ার ফোর্স। যে-কোনও সময়ে হামলা করতে তারা তৈরি।’

সবই বুঝছেন ব্রায়ান। যুদ্ধের আগে যে-কোনও দেশ ঘাড়ের কাছ থেকে সরাতে চাইবে শত্রু স্পাই স্যাটেলাইট। এ কারণেই সতর্ক ও ভীত হয়ে উঠেছে ওই দু'দেশ। দেশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নিরাপদে রাখতে আর্মি, এয়ার ফোর্স ও নেভির ইউনিট নানান দিকে সরিয়ে দিয়েছে তারা। যুদ্ধাবস্থা তৈরি হলে ওই একই কাজ করত ইউনাইটেড স্টেট্স্।

কপাল টিপলেন ব্রায়ান। অতিরিক্ত চাপের কারণে মাথা জুড়ে শুরু হয়েছে মাইগ্রেনের ব্যথা। আবারও হাসপাতালে গিয়ে আশ্রয় নেবেন কি না ভাবলেন এনআরআই চিফ।

‘তাদের মুভের কারণে পাল্টা কী করেছি আমরা?’

‘উপায় ছিল না, বাধ্য হয়ে অ্যালার্ট স্ট্যাটাস বাড়াতে হয়েছে,’ বললেন প্রেসিডেন্ট। ‘ডিফেন্স কণ্ডিশন ফোর ঘোষণা করেছি। জয়েন্ট চিফরা বলছেন রাশা বা চিন নিজেদের মিলিটারি তৈরি রাখলে আমাদেরও উচিত হবে ডেফকন থ্রি

ঘোষণা করা।’

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্রায়ান। ‘ওরা ভয় পেয়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।’

‘অবাক হওয়ার কিছু নেই, না?’ ভুরু কুঁচকে তাঁকে দেখলেন প্রেসিডেন্ট।

‘আমাদের উচিত ওদের সঙ্গে কথা বলা, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,’ বললেন ব্রায়ান, ‘লঞ্চ পযিশনে ট্যাঙ্ক বা এয়ারক্রাফট নেয়া ভুল হবে। একটা বাড়াবাড়ি তৈরি করে অন্যের বাড়াবাড়ি। ফলাফল সবসময় খারাপই হয়।’

রেগে গিয়ে ভুরু কুঁচকে এনআরআই চিফকে দেখলেন প্রেসিডেন্ট। ‘তুমি কিছুই বুঝছ না, জেমস। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। এসব ঝামেলা তৈরির জন্যে অর্ধেক দায় তোমার। এখন পর্যন্ত তোমার পাশে থেকেছি, কিন্তু আমারও ধৈর্যের একটা সীমা আছে। নতুন কোনও জরুরি তথ্য দিতে পারছ না। তোমাকে দেয়া তিন দিনও প্রায় ফুরিয়ে এল। এরপর...’

‘মিস্টার প্রেসিডেন্ট...’

জেমস ব্রায়ানকে থামিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট, ‘তুমি বলেছিলে কোনওভাবে আমাদেরকে নিরাপদ রাখছে ওসব স্ফটিক। কোথায় কী, এখন তো দেখছি মস্তবড় বিপদে ফেলে দিয়েছে ওগুলো আমাদেরকে! এবার স্থির করতে হবে ওগুলোর কী করব। ভেবে বের করো এই গাড্ডা থেকে কীভাবে আমাকে বের করবে, নইলে বাধ্য হয়েই ব্যবস্থা নিতে হবে আমাকে।’

চুপ করে থাকলেন ব্রায়ান। হুমকির সুরে কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট। বন্ধুত্বের খাতিরে এমনিতেই সীমানার বাইরে চলে গেছেন তিনি। এখন যা ঘটছে, সবই সাধারণ যুক্তির বাইরে। এবার প্রেসিডেন্ট এবং কমাণ্ডার ইন চিফ হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।

ব্রায়ান ভাবলেন, যখন-তখন প্রেসিডেন্টের নির্দেশে ধ্বংস

করে দেয়া হবে ব্রাযিল স্টোন।

'আমি দুঃখিত, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বললেন ব্রায়ান। 'আমি খুব ক্লান্ত। ভুল কথা বলে থাকতে পারি। দয়া করে কি বলবেন, আমরা আপাতত কী বলছি ওদেরকে?'

ব্রায়ানের দিকে চেয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'বরং তুমিই বলো কী বলা উচিত? কী বলব আমরা ওদেরকে?'

কাজে আসবে এমন যৌক্তিক কিছুই মনে এল না ব্রায়ানের। মাথা নিচু করে নিলেন। স্ট্যাটিক ঠেকিয়ে সূক্ষ্ম সব ইন্সট্রুমেন্ট রক্ষা করতে ট্রেইলারের মেঝেতে রাখা হয়নি কার্পেট। এতই ক্লান্তি, ব্রায়ানের মনে হলো কেমন হতো এখন লোহার শীতল মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে? প্রেসিডেন্ট নির্ঘাৎ ভাববেন, তিনি চিরকালের জন্যে পাগল হয়ে গেছেন!

গবেষণাগারের যেদিকে সায়েন্স সেকশন, সেদিকে তাকালেন ব্রায়ান। প্রথমবার স্ফটিকটা দেখার পর তাঁর মনে হয়েছিল, ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজের জিনিস। ওই চিন্তা এসেছিল বলেই ওটাকে অনেক বেশি মূল্যবান ভেবেছেন? অবশ্য ভাবার যথেষ্ট কারণও ছিল। আজও আছে। বিবেক ও যুক্তির বাইরে একটা পা-ও ফেলেননি তিনি।

প্রায় একবছর ধরে ওটার ওপর গবেষণা করেও পুরো বুঝতে পারেননি তাঁরা। প্রচণ্ড শক্তি ওটার ভেতর। দ্বিতীয় স্ফটিক পাওয়ার পর অন্তত দশ গুণ শক্তির বিচ্ছুরণ হয়েছে ওটা থেকে। এমনও হতে পারে, তৃতীয় স্ফটিক পেলে ওগুলো থেকে বেরোবে এক শ' গুণ শক্তি। আর চার নম্বর স্ফটিক হয়তো দেবে হাজার গুণ ক্ষমতা। দুই স্ফটিকের কারণে এরই ভেতর যে শক্তি দেখা গেছে, তা কয়েক শ' নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডের এনার্জি বিচ্ছুরণের চেয়েও বেশি।

অথচ, এখন পর্যন্ত স্ফটিকে দেখা যায়নি কোনও রেডিয়েশন, নেই কোনও এক্সপ্লোসিভ কমপোনেন্ট। আছে শুধু

প্রচণ্ড শক্তির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। কিন্তু এর বাইরে আর কিছু নেই, তা-ই বা বলবেন কী করে? এরই ভেতর তাঁদেরকে বিস্মিত করে দিয়েছে ওই জিনিস। তিনিই হয়তো ভুল করেছেন, সব হাতের নাগালের বাইরে যাওয়ার আগেই উচিত ছিল ওই স্ফটিক ধ্বংস করে দেয়া।

'ওই দুই দেশের কর্তাকে সত্য বলুন, স্যর,' বললেন ব্রায়ান।

চুপচাপ চেয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট।

'কিছুই গোপন না করে দুনিয়ার প্রতিটি দেশের সঙ্গে ডেটা শেয়ার করুন। জরুরি তথ্য এবং ভয়ের কারণে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা। সেটা হয়তো পৃথিবীর জন্যে ভাল হবে না।'

স্ক্রিনে বিস্মিত দেখাল প্রেসিডেন্টকে, চট্ করে তাকালেন এক পাশে। নিচু গলায় কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। ব্রায়ান আঁচ করলেন, তাঁরা চিফ অভ স্টাফ।

'তোমার পরামর্শ মাথায় রাখলাম,' প্রেসিডেন্ট জানালেন।

'আশা করি এসব ঠিকই বুঝবেন রাশা ও চিনের নেতারা,' বললেন ব্রায়ান। মাথায় কথাগুলো খেলে গিয়েছিল বলে বুকে টের পেলেন গর্ব। 'তারা হয়তো নতুন কোনও পথও দেখিয়ে দিতে পারে। যেটা আমরা এখনও ভেবে বের করতে পারিনি।'

প্রেসিডেন্টের পাশে থামলেন এক এইড। টেবিলের ওপর রাখলেন একটা ফোল্ডার। ফিসফিস করে কী যেন বললেন। কথাগুলো শোনার পর আড়ষ্ট হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট, ঘুরে তাকালেন স্ক্রিনে ব্রায়ানের দিকে। চাপা স্বরে বললেন, 'আরেকটা সমস্যা। এইমাত্র মিসাইল মেরে চিনের দুটো গুপ্তচর বিমান ফেলে দিয়েছে রাশানরা।'

নতুন করে ইউএন স্ক্রিনে তাকালেন ব্রায়ান। শিরশির করছে তাঁর মেরুদণ্ড।

ওই যে, নতুন তথ্যটা পেয়েছেন চিনা অ্যাম্বাসেডার।

লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে দৌড়ে গেলেন রাশান ডেলিগেশনের দিকে। আরও খারাপ দিক, চিৎকার করে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে বলছেন রাশানদেরকে!

ব্রায়ান ভাবলেন, কেমন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে সব!

তেত্রিশ

গতরাত ও আজ সকাল জুড়ে নিমজ্জিত মায়া মন্দির থেকে মিতার তুলে আনা ছবি দেখেছেন প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন। ছবি কোনও কোনওটা খুব পরিষ্কার, অন্যগুলোর রেযোলুশন খারাপ। আলো ছিল না বললেই চলে। কিন্তু হায়ারোগ্লিফ থেকে এখন পর্যন্ত তিনি যা জানতে পেরেছেন, তা কম নয়।

নিজের থিয়োরি বলতে শুরু করলেন তিনি। কিন্তু হাত তুলে মানা করল মিতা। 'স্যর, আমার মনে হয় রানারও জানা উচিত।'

মাথা দোলালেন আর্কিওলজিস্ট।

সত্যিই, এরপর তাঁরা কী করবেন, এখনই তা স্থির করতে হবে। সেজন্যে রানার মতামত প্রয়োজন। ওকে ছাড়া কোনও কাজেই নামতে পারবেন না।

ঘরের মাঝ থেকে ডাকল মিতা, 'নতুন তথ্য পেয়েছেন প্রফেসর। তোমার জানা থাকা দরকার, রানা।'

ব্যালকনি ছেড়ে ঘরে এসে ঢুকল রানা। মিতার পাশের চেয়ারে বসল।

'রানা, তোমার মনে আছে ব্রাযিলের ওই অভিযানের কথা?'

বললেন হ্যারিসন।

মৃদু হাসল রানা। 'খেপে গিয়েছিল আদিবাসী। হামলা করেছিল কুমিরের মত দেখতে খুব দ্রুত চলতে পারে এমন অদ্ভুত জন্তু। খুন করতে চেয়েছে এক উন্মাদ বিলিয়নেয়ার। দারুণ মজা! চলুন, আবারও বেরিয়ে পড়ি ওরকম কোনও অভিযানে!'

'না, ঠাট্টা নয়,' হেসে ফেললেন প্রফেসর। 'বিপজ্জনক সব জায়গায় যেতে হয়েছে, তাই না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল রানা।

'এখন কথা হলো, ওসব এলাকার হায়ারোগ্লিফ থেকে জানতে পেরেছি, মায়ানরা কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে দেবতা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল অন্য এলাকায়। সঙ্গে ছিল জ্বলজ্বলে স্ফটিক।'

'তার দুটো আমরা পেয়েছি,' বলল মিতা।

'অন্যগুলোর জন্যে দরকার জরুরি তথ্য,' বললেন প্রফেসর। 'তবে তথ্য পাইয়ে দেয়ার জন্যে সূত্র রেখে গেছে মায়ানরা।' ম্যাপে আঙুল ঠুকলেন। 'এই ম্যাপ ধরে গেলে পাব পাহাড়ি জাগুয়ার রাজার আয়নার এক মন্দির। ওটা আগুন দেবতার। ওখানেই আছে তৃতীয় স্ফটিক।' নিজের নোট দেখলেন হ্যারিসন। 'ওই মন্দিরের কাছেই ছিল বা আছে ব্রাদারহুডের অবশিষ্ট সৈনিকরা। হাজার হাজার বছর ধরে পাহারা দিচ্ছে ওই স্ফটিক। নৌকা ব্যবহার করে যেতে হবে ওই মন্দিরে। তারপর ডুব দিতে হবে পাতকুয়ায়। এরপর বেঁচে ফিরলে গ্রামের মোড়ল বুঝবেন এই লোকের অন্তর পবিত্র। তখন ইচ্ছে হলে স্ফটিক সরিয়ে নিতে পারবে সে।'

'এবার হয়তো অদ্ভুত মিউটেট জন্তু বা হাঙরের বদলে থাকবে আরও অনেক ভয়ঙ্কর কিছু,' বলল রানা।

মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'স্ফটিকের কারণে ধ্যানের মত ঘোর তৈরি হবে। ওই পাথর বা স্ফটিকের নাম এমনিতে দেয়া

হয়নি পাহাড়ি জাগুয়ার রাজার আত্মত্যাগের আয়না। ওই স্ফটিকের জন্যে অবাক করা মায়া তৈরি হবে মনে। নইলে প্রাণের ভয় মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এ দেশে পড়ে থাকতাম না। ভাল করেই জানি, সুযোগ পেলে আমাদেরকে মেরে ফেলবে দিমিতভ বা ল্যাং।'

'এসব স্ফটিক সমস্যা তৈরি করে,' বলল মিতা, 'তোমার হয়নি, কিন্তু আমাদের হয়েছে— মাসের পর মাস ঘুমাতে পারিনি আমরা। বারবার মনে হয়েছে স্ফটিকের কথা: আরও তো আছে ওই জিনিস। দেরি না করে খুঁজে বের করতে হবে। সবগুলোকে রাখতে হবে নির্দিষ্ট সব জায়গায়।'

'বলতে চাইছ, তোমরা প্রভাবিত হয়েছ স্ফটিকের কারণে?' জানতে চাইল রানা।

'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়,' বলল মিতা, 'মন পাল্টে দেয় অনেক কিছুই। যেমন শিশুর কান্না অস্থির করে মেয়েদেরকে। মনের ভেতর প্রভাব পড়েছে বলে ওই স্ফটিকের জন্যে প্রাণ দিতেও রাজি হয়ে গেছি প্রফেসর আর আমি।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'কিন্তু ওটার জন্যে আবেগ আসছে কেন? কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারবে?'

'মায়ান চিলাম বালাম থেকে যা পড়েছি, এসব স্ফটিক ঠেকিয়ে দেবে পৃথিবীর ধ্বংস।' নিজের নোট দেখলেন প্রফেসর। 'এখানে লিখেছে, বারো সালের পর থেকে বাবার পাপের জন্যে দায় নেবে তাদের সন্তানরা। অন্ধ হবে আকাশের চোখ। সভ্যতা হবে অসহায়। তা ঠেকাতে হলে লাগবে ওসব স্ফটিক।'

'স্যাটেলাইটের কথা লিখেছে নাকি?' বলল রানা।

'তাই তো মনে হয়,' জানালেন প্রফেসর। 'সভ্যতা রক্ষা করতে হলে চাই ওই জ্বলজ্বলে স্ফটিক।'

'কিন্তু সভ্যতার ধ্বংস ঠেকাবে কী ভাবে?' নরম সুরে

জানতে চাইল রানা।

'তা এখনও জানি না, আরও চাই তথ্য।' প্রফেসরের দিকে তাকাল মিতা। 'আপনার নতুন তথ্যগুলো বলুন।'

'নিমজ্জিত মন্দির থেকে পাওয়া গ্লিফ দেখিয়ে দিচ্ছে কোথায় পাব পরের স্ফটিক,' বললেন হ্যারিসন।

'জায়গাটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'পাহাড়ি জায়গা। এই যে।'

মানচিত্রের দিকে তাকাল ওরা।

নিমজ্জিত মন্দির থেকে সরল রেখা তৈরি করে প্রফেসরের হাত থামল দক্ষিণ মেক্সিকোয়। কয়েকটা সংখ্যা লেখা মানচিত্রে। ওখান থেকে আর্কিওলজিস্টের তর্জনী গেল গুয়াতেমালার উঁচু জমিতে।

'এই অ্যাংগেল থেকে রওনা দিতে হবে,' একটা রেখা দেখালেন হ্যারিসন, 'এটাই নেবে পরের স্ফটিকের কাছে। ওটাই পাহাড়ি জাগুয়ার রাজার আত্মত্যাগের আয়না।'

'এই রেখা ধরে কোথায় যাব?' মিতার চোখ অনুসরণ করছে রেখাটা।

মানচিত্র দেখলেন প্রফেসর। তাঁর তৈরি পথ গেছে নিচু ম্যানগ্রোভ জঙ্গল ও জলাভূমির মাঝ দিয়ে নিচু টিলাসারিতে। ওদিকটা সিয়েরা মাদরে ওক্সিডেন্টাল। পাঁচ থেকে ছয় হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ার ওপাশে প্রশান্ত মহাসাগর। পৌঁছুতে লাগবে অন্তত এক থেকে দেড় মাস।

একবার মাথা চুলকে নিলেন প্রফেসর, তারপর বললেন, 'ঠিক বুঝছি না। জটিল করে লিখেছে মায়ানরা: দেবতার পথে হাঁটবে ব্রাদারহুডের সবাই। ওখানেই আছে পাহাড়ি জাগুয়ার রাজার মন্দির। ওই জ্বলজ্বলে পথে পৌঁছতে হবে দেবতার কাছে।'

'আসলে কী বলতে চায়?' আনমনে বলল মিতা।

‘জানি না,’ বললেন হ্যারিসন।

‘জ্বলজ্বলে পথ?’ রানার দিকে তাকাল মিতা। ‘মিল্কি ওয়ের কথা বলছে নাকি? জ্যোতির্বিদ্যায় খুব দক্ষ ছিল মায়ানরা।’

‘একই কথা ভেবেছি,’ বললেন প্রফেসর, ‘কিন্তু গ্লিফের মধ্যে সময় বা ঋতু বলতে কিছুই নেই। এককেক মৌসুমে ওপরের দিকে থাকে মিল্কি ওয়ে, আবার অন্য সময়ে নেমে আসে। বছরের নির্দিষ্ট মাস না পেলে কিছুই বুঝব না।’

‘তা হলে এখন কী করবেন?’ জানতে চাইল মিতা।

রানার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। ‘কোনও পথই তো পাচ্ছি না!’

মৃদু হাসল রানা। ‘আমি হয়তো জানি কোথায় ওই জ্বলজ্বলে পথ। এবার আমাদের লাগবে...’

হাউস ফোন বেজে উঠতেই চুপ হয়ে গেল ও। খপ্ করে তুলে রিসিভার ঠেকাল কানে।

প্রফেসর ও মিতা আবছা শুনল ফ্রন্ট ডেস্কের ক্লার্কের বেসুরো, কর্কশ চিৎকার: ‘পালিয়ে যান, সেনোর! পালান! ওরা আসছে আপনাদেরকে ধরতে!’

ঠাস্ করে ফোন রাখল রানা। ‘পাবলোকে নিয়ে তৈরি হও, স্ফটিক নাও! ওরা আসছে!’ চেয়ার ছেড়ে ক্লসিট থেকে শটগান বের করল ও।

পাবলোকে কোলে তুলে নিলেন হ্যারিসন, ওদিকে সুইটের কিচেন কেবিনেট থেকে ব্যাকপ্যাক নিল মিতা।

দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিয়েছে রানা। করিডোর ধরে হেঁটে আসছে কয়েকজন লোক, পরনে টুরিস্টদের পোশাক। গম্ভীর চেহারা। ছুটি কাটাবার মুডে নেই। দু'জন থেমে গেছে সিঁড়ির মুখে। রানাদের সুইটের দরজা লক্ষ্য করে আসছে বাকি তিনজন।

কপাল ভাল, হোটেলের ডেস্কের ছোকরা চালু, ভাবল রানা।

প্রাণে বাঁচলে পরে ওকে মোটা অঙ্কের বকশিশ দেবে।

পাশের ঘরে ঢুকল দুই ককেশিয়ান। তৃতীয়জনের চোখ ওদের দরজার ওপর।

নিঃশব্দে দরজা আটকে পরক্ষণে দূরের মেঝেতে ডাইভ দিল রানা। উড়ন্ত অবস্থায় গলা ছাড়ল, 'সবাই শুয়ে পড়ো!'

দু'সেকেণ্ড পর একরাশ গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হলো পাশের ঘরে যাওয়ার দরজা।

মেঝেতে গড়ান দিয়ে উঠেই পাল্টা জবাব দিল রানা। কান ফাটানো আওয়াজে দরজা ও পাতলা প্লাস্টিকের দেয়াল ভেদ করে পাশের ঘরে ঢুকল বন্দুকের চারটে বুলেট। হাউমাউ করে উঠেছে এক লোক। দুই সেকেণ্ড পর ধুপ্ করে মেঝেতে পড়ল কেউ। ওই ঘরে রয়ে গেছে আরও কেউ।

কাউণ্টারের আড়াল থেকে উঁকি দিল মিতা। 'কোন্ দিকে যাব?'

ঝাঁঝরা দরজার ওপর আছড়ে পড়ল কারও ভারী কাঁধ। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল এক লোক। কী করতে হবে বুঝে গেল মিতা। প্রফেসর ও পাবলোকে নিয়ে দৌড়ে গেল ব্যালকনিতে। বিশ ফুট নিচে বালিময় জমিন। এদিকে দরজার সামনের লোকটাকে এক গুলিতে গেঁথে ফেলেছে রানা।

পাশের ঘরের দেয়াল ভেদ করে এল একঝাঁক গুলি। চুরচুর হলো একগাদা বাসন-গ্লাস। ঝনঝন করে খসে পড়েছে ব্যালকনিতে যাওয়ার কাঁচের দরজা। পাশের ঘরে পাল্টা গুলি পাঠাল রানা, পরক্ষণে লাফিয়ে সরে গেল নতুন পযিশনে। একবার দেখল ব্যালকনি। এইমাত্র পাবলোকে বুকে নিয়ে রেলিং টপকে খসে পড়েছে মিতা। কমব্যাট ট্রেনিং ভালই শিখেছে, ভাবল রানা। রেলিঙের পাশে থেমে বরফমূর্তি হয়েছেন প্রফেসর হ্যারিসন।

ভদ্রলোক অন্য পথ খুঁজছেন, বুঝে গেল রানা। ধমকের

সুরে বলল, ‘কী হলো, লাফ দিন!’

ওর কথা শেষ হতে না হতেই বুলেটের কারণে ঘরে তৈরি হলো ঝড়। নানান দিকে ছিটকে গেল প্লাস্টিক ও কাঠের টুকরো। আগেই মেঝেতে শুয়ে পড়েছে রানা, ক্রল করে চলল ব্যালকনির দিকে। আবারও বলল, ‘লাফ দিন!’

রেলিঙের ওদিকে একটা পা নিলেন প্রফেসর হ্যারিসন, করুণভাবে ফিরে চাইলেন রানার চোখে। হেডলাইটের তীব্র আলো চোখে পড়ায় থমকে দাঁড়ানো হরিণ যেন।

পাশের ব্যালকনিতে রাশানরা চলে এলেই মরবেন! ভাবল রানা। নিজে মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছে বলে এক লাথিতে সুইটের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল এফএসবির এক এজেন্ট।

রানার চারপাশে বিঁধল অন্তত দশটা গুলি। একটা ছিলে দিয়ে গেল ওর কনুই। ঘুরেই পাল্টা গুলি পাঠাল রানা।

বুলেট গায়ে না বিঁধলেও লাফিয়ে ডানদিকে সরে গেল কালো চুলের মোষ। খালি হয়ে গেছে রানার বন্দুক। ওটা ব্যবহার করল ক্রিকেটের ব্যাটের মত। উড়াল দিল লোকটার হাতের অ্যাসল্ট রাইফেল, মেঝেতে পড়ে খটাং-খট আওয়াজে পিছলে গেল দূরে। ওটা পাওয়ার জন্যে ঝাঁপ দিল রানা। কিন্তু এক পাশ থেকে ওকে জাপ্টে ধরল মোষ। ধড়াস করে পড়ল দু'জন মেঝেতে।

রানার বুকের ওপরে পড়েছে লোকটা। গড়ান দিয়ে তাকে মেঝেতে ফেলল রানা। কিন্তু উঠে বসেই শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করছে সে!

মেঝেতে ছোরার মত চোখা এক কাঁচের টুকরোর ওপর হাত পড়ল রানার। ওটা তুলেই গেঁথে দিল এফএসবি এজেণ্টের গলায়। ছেঁড়া গলা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোল রক্ত। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে ছটফট করতে লাগল মৃতপ্রায় এজেন্ট।

উঠেই ব্যালকনি লক্ষ্য করে ঝেড়ে দৌড় দিল রানা। রেলিং টপকে পড়ার সময় সঙ্গে নিল হতভম্ব প্রফেসরকে। সাঁই করে নেমে এল ওরা বালি-জমিতে। হ্যারিসনের ওপর পড়েছে রানা। প্রফেসরের ওপর থেকে সরে গেল। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'থাকি কী করে?' নাকমুখ কুঁচকে উঠে বসলেন প্রফেসর।

'সাবধান!' একটু দূর থেকে চিৎকার করল মিতা।

ঝট্ করে ওপরে তাকাল রানা। একইসময়ে হোলস্টার থেকে ওয়ালথার বের করে তাক করেছে ব্যালকনির দিকে। রেলিঙে থেমেছে এক লোক, হাতে রাইফেল। বাঁটে লাগল রানার গুলি। ছিটকে গেল রাশানের অস্ত্র। রানার পরের গুলি বিঁধল লোকটার কপালে। ধড়াস্ করে ব্যালকনির মেঝেতে পড়ল লাশ।

ঘুরে তাকাল রানা। রক্তে ভেসে গেছে প্রফেসরের পোশাক।

'রক্ত তোমার হাতের,' বললেন হ্যারিসন।

'দেখব পরে,' টান দিয়ে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। 'চলুন, ভাগতে হবে!'

সৈকত ধরে দৌড়ে চলেছে ওরা। কাঁচে লেগে কেটে গেছে রানার বাহু। খুব গভীর নয় ক্ষত।

পঞ্চাশ গজ গেলেই সামনে পড়বে হোটেলের কাছের সড়ক। তার আগে এক পাশে ছোট কয়েকটা মেইনটেনেন্স ঘর। একটার ভেতর ঢুকল ওরা। পেছনে দরজা আছে। পিস্তলের বাড়ি পড়তেই খুলে গেল তালা। ঘরের র‍্যাকে তোয়ালে পেয়ে রানার বাহুতে জড়িয়ে দিল মিতা।

পাঁচ মিনিট পর ওরা বেরোল কর্মীদের ওভারঅল পরে। হোটেলের সামনের ঘাসজমি পেরিয়ে চলেছে রাস্তার দিকে। মিতার বাহু শক্ত করে ধরে রেখেছে পাবলো।

দূর থেকে আসছে পুলিশের সাইরেন। যে যার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে হোটেলের গেস্টরা।

পিস্তল দেখিয়ে ভীত ভ্যালের কাছ থেকে চাবি নিল রানা। দু' মিনিট পর হোটেলের আঙিনা ছেড়ে তুমুল বেগে ছুটল চোরাই রেন্টালকার।

'সবাই ঠিক আছ তো?' জানতে চাইল রানা।

'আমি ছাড়া সবাই সুস্থ,' বললেন হ্যারিসন।

'পাবলোর কী অবস্থা?'

রিয়ার ভিউ মিররে রানা দেখল ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মিতা। কোমল স্বরে বলল, 'মনে হচ্ছে ও ঠিকই আছে।'

ছেলেটার চোখে এখন উন্মাদনা নেই, খেয়াল করল রানা।

'ওরা ল্যাং-এর লোক নয়,' বলল মিতা।

'রাশান,' বলল রানা, 'জানতাম, আগে হোক পরে ওদের সঙ্গে দেখা হবেই।'

'আমাদেরকে খুঁজে পেল কী করে?' জানতে চাইল মিতা।

ল্যাং-এর লোকও খুঁজে নিয়েছে ওদেরকে।

এই দুই প্রশ্নের জবাব খুঁজছে রানা।

ওরা অদ্ভুত এক দল। কৃষ্ণ বর্ণের এক বয়স্ক লোক, রূপসী এক যুবতী, বাচ্চা এক ছেলে, আর এশিয়ার বাদামি এক যুবক। সহজেই ওদেরকে আলাদা করা যাবে ভিড় থেকে।

প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছেন হ্যারিসন। তাঁর দিকে তাকাল রানা। 'প্রফেসর, আপনি ওপর থেকে নামতে ভয় পান?'

'গত বছর তোমার হেলিকপ্টারে উঠেছিলাম, নাকের কাছে ছিল গাছের সারি, তখনই কেঁপে গেল আত্মা। তারপর থেকে ভয় লাগে।'

'তা হলে ভয়টাকে এবার সামলে রাখতে হবে,' বলল রানা।

ঠিক করেছে, ওরা আবারও উঠবে আকাশে।

তছনছ হয়ে যাওয়া হোটেলের কামরায় ঢুকল ইগোর দিমিতভ। সোজা গেল ব্যালকনিতে। একটু আগে ওই পথে পালিয়ে গেছে তার শিকার। পায়ের নিচে কুড়মুড় করে ভাঙল কাঁচ। দূর থেকে আসছে পুলিশের গাড়ির সাইরেন।

রেলিঙের পাশে পড়ে আছে দিমিতভের দলের এক লোক, মৃত। ঘরের ভেতরেও লাশ। একজনের গলা চিরে গিয়েছিল কাঁচের ফালি লেগে। আরও দু'জন খারাপভাবে আহত। বন্দুকের বাকশট লেগে ঝাঁঝরা হয়েছে একজনের পাছা। অন্যজনের ছিঁড়ে গেছে যৌনাঙ্গের ডগা। অন্যরা সরিয়ে নিচ্ছে তাদেরকে। আকাশে চোখ রেখে কড়া সুরে বলল দিমিতভ, 'ওদেরকে ভ্যানে তুলে দাও।'

'লাশগুলোর কী হবে?' জানতে চাইল একজন।

মাথা নাড়ল দিমিতভ। 'পড়ে থাকুক। ট্রেস করতে পারবে না পুলিশ।'

পা ছেঁচড়ে ঘর ছাড়ল লোকটা। নিজেও ব্যালকনি ছেড়ে ঘরে ফিরল দিমিতভ। বিড়বিড় করল, 'বাঙালি গুপ্তচর, এবার নিয়ে দু'বার কপাল সাহায্য করল তোমাকে, কিন্তু তৃতীয়বার কপালই রাখব না!'

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে চোখের কোণে মেঝেতে খোলা মানচিত্র দেখল সে। ঝুঁকে তুলে নিল ওটা। জায়গায় জায়গায় বৃত্তাকার চিহ্ন। কালো সরল রেখা গেছে বহু দূরে। বিস্মিত হয়ে বৃত্তাকার চিহ্ন ও সরল রেখা মন দিয়ে দেখল সে।

হাসি ফুটে উঠল নিষ্ঠুর ঠোঁটে।

নাহ্, ওদের নয়, আসলে ভাগ্যদেবী ওর সঙ্গেই আছে!

চৌত্রিশ

নাসার মিশন কন্ট্রোল-এর মতই হয়ে উঠেছে ক্যামপেচে শহরে ল্যাং-এর ওয়্যারহাউস। এক পাশের টেবিলে সাগরের মন্দির থেকে পাওয়া হায়ারোগ্লিফ অনুবাদ করছেন স্কলাররা। আরেক দিকে সারি সারি কমপিউটার স্ক্রিনের সামনে এক ডজন ট্রেইণ্ড টেকনিশিয়ান নিয়ন্ত্রণ করছে নানান ইকুইপমেন্ট। ওদের জায়গাটা হয়ে উঠেছে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের ঘরের মত।

আরেক দিকে মানুষের ছবি বিশ্লেষণ করছে একুশ শতাব্দীর কমপিউটার। নানা শহর, গ্রাম ও আর্কিওলজিকাল সাইটে ছড়িয়ে পড়েছে ল্যাং-এর একদল কর্মী।

দলবল নিয়ে ওসব জায়গায় যেতে পারে মাসুদ রানা। চোখ রাখা হয়েছে মেক্সিকো সিটির অ্যানথ্রোপলজির মিউযিয়ামে।

সবমিলে দু'শ' লোকের হাতে ভিডিয়ো ক্যামেরা ও সেন্সিং ইকুইপমেন্ট। ঘুরছে তারা নানান এলাকায়। স্ক্যান করছে হাজারো মানুষের ছবি। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ প্লাযা, এয়ারপোর্ট, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, অ্যাভিন্যু, কিছুই বাদ পড়ছে না। ল্যাং-এর লোকদের জানা নেই কাকে খুঁজতে হবে, তাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে মনিবের টেকনিশিয়ানদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে ছবি। বাকি কাজ করছে কমপিউটার।

ল্যাং-এর পেছনে গুনগুন আওয়াজ তুলছে র‍্যাক ভরা হাই পাওয়ার্ড সার্ভার। পেলেই প্রসেস করছে ডেটা। বিদ্যুদ্বেগে দেখা হচ্ছে হাজার মানুষের মুখের ছবি। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দুই

মিনিটের ভেতর পাঁচ শ' মানুষের ছবি স্ক্যান করছে কর্মীরা।

ঝড়ের গতি তুলে কাজ করছে স্পটারদের দল।

রিডআউট দেখল ল্যাং। তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম জানিয়ে দিয়েছিল, রানারা এসব এলাকায় থাকবে, সে সম্ভাবনা মাত্র একত্রিশ পার্সেন্ট।

তবে কাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন আপডেট অনুযায়ী কাজ করছে প্রোগ্রাম। তাতে একটু হতাশ ল্যাং। ওই কালো লোক, বাচ্চা ছেলে, সুন্দরী মেয়েটা আর মাসুদ রানা বোধহয় পরিচিত কোনও মায়ান সাইটে যাবে না।

কমপিউটারের বর্তমান অ্যানালাইসিস অনুযায়ী ওদেরকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখানো হচ্ছে:

* মাসুদ রানার দলের ধরা পড়ার সম্ভাবনা: ৩.২৫%.

* মাসুদ রানার দল এরই ভেতর মেক্সিকো ত্যাগ করে চলে গেছে আমেরিকায়। সম্ভাবনা: ৯.৩৬%.

* মাসুদ রানার দল আবারও প্রফেসর হ্যারিসনের নিউ ইয়র্কের ইউনিভার্সিটির মেইনফ্রেম ব্যবহার করবে। সম্ভাবনা: ১১.৭৮%.

* মাসুদ রানার দল রওনা হয়েছে পরের সাইটের উদ্দেশে। সম্ভাবনা: ১৪.৫৯%.

* মাসুদ রানার দল স্থানীয় কোনও ইউনিভার্সিটি বা জাদুঘরে যাবে। সম্ভাবনা: ২৮.৯৯%.

* মাসুদ রানার দল যথেষ্ট তথ্য পেয়ে পৌঁছে যাবে পরের সাইটে। সম্ভাবনা: ৩১.৫০%.

* অন্যান্য সম্ভাবনা: .৫৩%.

এই ডেটা আবারও দেখল হুয়াং লি ল্যাং।

সম্ভাবনা সবচে' বেশি, যথেষ্ট তথ্য পেয়ে স্ফটিক খুঁজতে বেরোবে রানা।

কখন তা করবে, তার হিসেব দেয়নি কমপিউটারের

প্রোগ্রাম। ওই তথ্য লাগবেও না। মাসুদ রানা একবার শহর ছেড়ে গেলেই ঢুকে পড়বে ল্যাং-এর মুঠোয়। ওদেরকে খুঁজে নেয়ার জন্যে অন্য ট্র্যাকিং সিস্টেম আছে তার। এরপর যখন পাবে, আশপাশে কেউ না থাকলে হাসতে হাসতে ওদেরকে খুন করবে সে। সাক্ষী বলতে কেউ থাকবে না তখন।

প্রজেক্ট লিডারের দিকে তাকাল হুয়াং লি ল্যাং।

'আকাশে তোলার জন্যে তৈরি করো ড্রোন।'

পঁয়ত্রিশ

হোটেল থেকে চোরাই গাড়ি নিয়ে বেরোবার আধঘণ্টা পর নকল আইনী কাগজ দেখিয়ে এক রেন্টালকার নিয়েছে রানা। আপাতত ওরা চলেছে উত্তরদিকে। আবারও ফিরছে ক্যানকুনের উপকূলীয় ব্যস্ত এলাকায়। ওদিকেই আছে এয়ারপোর্ট।

পেছনে বসে পাবলোর সঙ্গে রাশান ভাষায় টুকটাক কথা বলতে চাইছে মিতা। স্ফটিক এত কাছে বলে প্রায় খেপে আছে পিচ্চি ছেলেটা। বারবার দেখছে ব্যাকপ্যাক।

'পাবলো, আমরা নতুন বাড়িতে যাচ্ছি,' বলল মিতা। 'ওখানে কেউ আমাদেরকে ধরতে আসবে না।'

স্ফটিক রাখা ব্যাকপ্যাক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল পাবলো, 'অনেক বেশি আলো! অনেক!' দু'হাতে ঢেকে ফেলল চোখ।

রানা, প্রফেসর এবং মিতার ধারণা, ব্রাযিলের ওই স্ফটিকের

মতই এই স্ফটিক। কিন্তু ভাবতে শুরু করেছে মিতা, যদি এক না হয় দুটো? বিচ্ছুরণের খুব কাছে পৌঁছে গিয়ে থাকলে? ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ মেপে দেখার যন্ত্রপাতি ওদের কাছে নেই।

'কী দেখছ, পাবলো?' জানতে চাইল মিতা।

হাত তুলে আঁকাবাঁকা রেখা তৈরি করল ছেলেটা। চাপা স্বরে বলল, 'হলদে।'

'চোখে কষ্ট লাগছে?' জানতে চাইল মিতা।

জবাব দিল না পাবলো।

'চোখে ব্যথা?' জিজ্ঞেস করল মিতা। 'মাথাব্যথা করছে না তো?' পাবলোর মাথা স্পর্শ করল ও।

নিচু স্বরে বলল পাবলো, 'হলদে মানেই ভাল। নীল খারাপ। যত কালচে, তত খারাপ। ব্যথা লাগে।'

মিতা খেয়াল করছে, আগের চেয়ে বেশি সহ্য করছে পাবলো এই স্ফটিক। তবে আবারও এনার্জি বাড়লে সমস্যা হবে।

ওর আন্দাজ অনুযায়ী, আবারও এনার্জি বাড়বে পাঁচ ঘণ্টা পর। তবে সেটা সাধারণ বিচ্ছুরণ, না বোটে যা হয়েছিল, তেমন ভয়ঙ্কর কিছু, বোঝার উপায় নেই। পাবলোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মিতা। ওর কোলে শুয়ে পড়ল পিচ্চি ছেলেটা।

সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে আছেন প্রফেসর হ্যারিসন। মিতার মনে হলো, বেড়ে গেছে মানুষটার পায়ের ব্যথা। সাবধানে ক্ষতের জায়গায় আঙুল বোলালেন তিনি।

'আপনি ঠিক আছেন তো, স্যর?' জানতে চাইল মিতা।

'হয় পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি, অথবা বাড়ছে ইনফেকশন।'

'আরেক দফা অ্যান্টিবায়োটিক দেব,' বলল মিতা।

'এখন না,' বললেন প্রফেসর, 'কেমন মাথা ঘুরছে। কোথাও পৌঁছে তারপর খাব।'

রানার দিকে তাকাল মিতা।

স্থানীয় এয়ারপোর্টের দিকে চলেছে ওরা। সরু দুই লেনের রাস্তায় গিজগিজ করছে গাড়ি। একটু পর পর থামতে হচ্ছে।

‘এই ছোট শহরে এত ভিড় হয় কী করে?’ বলল মিতা।

‘খেয়াল করোনি, সৈকতের কাছের সব হোটেল ভরে গেছে টুরিস্টে?’ বলল রানা। ‘মেক্সিকোর বড় অনুষ্ঠান ক্রিসমাস আর নিউ ইয়ার।’

চুপ করে থাকল মিতা।

রেডিও ছাড়ল রানা।

স্প্যানিশ ভাষায় ব্রডকাস্ট করছে বিবিসি ওঅর্ল্ড।

প্রথমেই জানাল সংবাদদাতা: অত্যন্ত ঘোলাটে হয়ে উঠছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে আমেরিকা, চিন ও রাশা। অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যায়নি, যুদ্ধঘোষণা আগে করবে কোন্ দেশ। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, বরাবরের মতই আমেরিকার পাশে থাকবে ব্রিটেন... ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটু পর শুরু হলো জটিল এ বিষয়ে ক'জন বিশিষ্টজনের গালভরা আলোচনা।

ওই অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত হালকা সংবাদ প্রচারের এক স্টেশন ধরল রানা।

সংবাদ পাঠিকা বলল: ‘চমৎকার পরিবেশের লোভে হাজারো টুরিস্ট এ দেশে এসেছেন ক্রিসমাস ও নিউ ইয়ার পালন করতে। খুশি ছিল সবাই। কিন্তু গতকাল দুপুরে অদ্ভুত এক শক ওয়েভ বন্ধ করে দেয় এ দেশের বেশিরভাগ এলাকার বিদ্যুৎপ্রবাহ। মেক্সিকান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছেন, ইউ.এস.-এর টপ সিক্রেট গ্রুম লেক এয়ার ফোর্স বেস-এ দুর্ঘটনার ফলে ওভারলোড হয়েছে তাঁদের গ্রিড। অনেকেই বলছেন, ওই শক ওয়েভ এতই শক্তিশালী ছিল, তা অনুভব করা গেছে এ দেশ

থেকেও। ধারণা করা হচ্ছে, ওটা কোনও টেরোরিস্ট হামলা। ...এদিকে আজ এক হোটেলে হঠাৎ হামলা করেছে একদল সশস্ত্র লোক। এ খবর জানার পর বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বেশিরভাগ টুরিস্ট। আমরা এখন কথা বলব মেক্সিকান ফরেন মিনিস্টার মিস্টার গুড্ডু হাচ্চির সঙ্গে...'

রেডিও বন্ধ করল রানা। দূরে চোখ ওর। একমাইল দূরে এয়ারপোর্টের প্রবেশপথের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে মেক্সিকান আর্মি ও রায়ট পুলিশ। একে একে গাড়ি পরীক্ষা শেষ করে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে তারা।

'হয়তো ওদের কাছে আমাদের ছবি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ,' বলল রানা, 'চাই না ওই সিকিউরিটির ভেতর পড়তে।'

'কী করবে?' জানতে চাইল মিতা।

'খুশি মনে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে হেলিকপ্টার ধার নিতাম, কিন্তু আপাতত তা সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'লোক বেশি।'

সরল স্বীকারোক্তি শুনে হেসে ফেলল মিতা। 'চুরি করতে?'

'একে আপন করে নেয়া বলতে পারো।'

খুশি হয়ে বললেন প্রফেসর, 'আমার ভাল লাগছে যে রানার হেলিকপ্টারে আমার উঠতে হচ্ছে না।'

'দয়া করে অত খুশি হবেন না, স্যর,' বিনয়ের সঙ্গে বলল রানা। 'এবার কাজে লাগাতে হবে বি প্ল্যান।'

কথা শুনে চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল হ্যারিসনের। পরিষ্কার মনে আছে রানার ঝরঝরে, প্রাচীন হেলিকপ্টারের কথা।

সামনের পেট্রল স্টেশনে ঢুকল রানা। অপেক্ষা করল কয়েক মিনিট, তারপর আবারও বেরোল রাস্তায়। এবার চলেছে ফিরতি পথে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে।

রিয়ার ভিউ মিররে ওকে দেখে জিজ্ঞেস করল মিতা, 'অত মিটমিট করে হাসছ কেন?'

'কারণ মহা-হারামি এক আমেরিকান বিলিয়নেয়ারের কথা

মনে পড়েছে,' বলল রানা, 'তার কাছ থেকে কিছু নেয়া সত্যিকারের পুণ্যের কাজ। ভাবছি, ওর পাপ কিছুটা মোচন করি।'

লেক রেনেগেড এলএ-২৫০ সিঙ্গল ইঞ্জিন উভচর বিমানে পণ্টুনের বদলে পেটের নিচে থাকে নৌকার খোল। টেক্সান ট্রাভেল্স্ কোম্পানির জিনিস। চাইলে দু' শ' ডলার খরচ করে ওটাতে চেপে চল্লিশ মিনিটের জন্যে সাগর ও উপকূলের ওপর দিয়ে ঘুরে আসতে পারে টুরিস্ট। আরও কিছু ডলার খরচা করলে দু'ঘণ্টার জন্যে ঘুরিয়ে আনবে দূরের উপসাগর থেকে। নামা যাবে নির্জন সৈকতে, বাধা নেই পিকনিক করতে। তবে এত সময় নেই যে ওসব করবে রানা, মিতা, হ্যারিসন ও পাবলো।

রানা এজেন্সিকে দিয়ে জরুরি কিছু গোয়েন্দাগিরির কাজ করিয়ে নিয়েছিল টেক্সান ট্রাভেল্স্ কোম্পানির বিলিয়নেয়ার মালিক। কাজ শেষে টাকা চাইলে ঘোরাতে লাগল: কাল দেব, পরশু দেব। কাটিয়ে দিল এভাবে কয়েক মাস। এরপর টাকা তো দিলই না, আইনের আশ্রয় নিতে চাইলে তার তরফ থেকে এল কড়া ধমক।

শাখা প্রধানের কাছ থেকে সব শোনার পর রানা বলল, 'বাজে লোক, টাকা তো দেবেই না, বরং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে লেলিয়ে দেবে, যাতে সমস্যা তৈরি করে। আইনী ঝামেলায় যাব না আমরা। তবে মনে রাখব, ওর কাছে টাকা পাই। সুযোগ পেলেই আদায় করে নেব পাওনা।'

আজ রাতে এসেছে সেই লোভনীয় সুযোগ।

প্রায় দুপুর থেকে ঘন জঙ্গলে গাড়ি রেখে অপেক্ষা করেছে ওরা। বিচ্ছুরণ হওয়ার আগেই গভীর গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রেখেছে স্ফটিক। পরে তুলে নিয়েছে আবার। তারপর মাঝরাতে হাজির

হয়েছে জনমানবহীন সাগর-সৈকতে।

অন্যান্য বিমান ভাড়ার এজেন্সিতে না ঢুকে টেক্সান ট্রাভেল্স্ কোম্পানির সামনে থেমেছে রানা। স্কেলিটন কি ব্যবহার করে ঢুকেছে ওই অফিসে। মাত্র পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এসেছে পছন্দের বিমানের চাবি হাতে।

ডকে অপেক্ষা করছিল মিতা, হ্যারিসন ও পাবলো।

রানা যেতেই জিজ্ঞেস করেছেন হ্যারিসন, 'কোনও গোলমাল হয়নি তো?'

মাথা নেড়েছে রানা। 'না। লবির সোফায় আরাম করে ঘুমিয়ে ছিল পাহারাদার। মাথায় টোকা দিয়ে অজ্ঞান করে হাত-পা-চোখ-মুখ সব বেঁধে রেখে এসেছি।'

মুচকি হেসে বলেছে মিতা, 'পাকা চোর বলব, না ডাকাত!'

'চোর-ডাকাত? এসব আবার কী কথা?' ভুরু কুঁচকে ফেলেছে রানা। 'সুদে-আসলে নিয়েছি প্রাপ্য। এই কোম্পানির মালিকের কাছে অনেক টাকা পাই।' একটু দূরের উভচর বিমানের ককপিটে চেপেছে। 'উঠে পড়ো।'

সবাই সিটবেল্ট বেঁধে নেয়ার পর ঝিনুকের মত দরজা বন্ধ করেছে রানা। ইঞ্জিন চালু করে ডক থেকে সরিয়ে নিয়েছে বিমান। গভীর পানিতে যেতেই ঠেলে দিয়েছে থ্রটল।

বিলিয়নেয়ার ব্র্যাড হাডসনের দামি বিমান আকাশে উঠতে সময় নিয়েছে মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড।

সেটা পুরো আড়াই ঘণ্টা আগের কথা।

প্রফেসর হ্যারিসনের মানচিত্রে আঁকা রেখা অনুসরণ করছে রানা। ভরসা দিয়েছে মিতাকে, ভাল করেই জানে, কোথায় যেতে হবে। তবে এটা বলেনি, যতটা দূরে যেতে হবে, তাতে প্রায় ফুরিয়ে যাবে বিমানের ট্যাঙ্কের তেল। ঠিক সময়ে উপযুক্ত জায়গায় নামতে না পারলে করুণ পরিণতি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে!

চমৎকার বিমান বেছে নিয়েছে ও। বিশাল জানালা দিয়ে দেখা যায় চারপাশ। ছাতেও ওই একই জিনিস, পরিষ্কার চোখে পড়ে বহু দূরের মিটমিট করা নক্ষত্র।

অন্ধকারে বিকট আওয়াজ তুলছে বিমান। আপাতত দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। খুলে রেখেছে ককপিট দরজা, ঘুরে যাত্রীদের দেখল রানা। ঘুমিয়ে কাদা প্রফেসর হ্যারিসন ও পিচ্চি পাবলো। বিমানের ইঞ্জিনের গর্জনকে দাবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে আর্কিওলজিস্টের থ্যাবড়া নাক।

পাশের কো-পাইলটের সিটে বসে বলল মিতা, 'আকাশে উড়তে খুব পছন্দ করো, তাই না?'

'পাখির মত ডানা নেই, তাই সাহায্য নিচ্ছি যন্ত্রের,' বলল রানা। এই রেনেগেড বিমানের আড়াই শ' হর্সপাওয়ারের ইঞ্জিন কেবিনের ওপরে পাইলনে বসানো, প্রচণ্ড শব্দ করে। 'তবে এত আওয়াজ না থাকলে খুশি হতাম।'

'গতরাতে ফোন দিলেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান,' লজ্জায় লাল হলো মিতা। 'তার আগে কী যেন দিতে চেয়েছিলে?'

'তাই? একদম ভুলে গেছি।' হাসল রানা। জোরালো আকর্ষণে টানছে ওকে মিতা। কিন্তু ওর জীবনে মেয়েটা কোনওভাবে জড়িয়ে যাক, তা চাইছে না রানা। 'মনে পড়লে তোমাকে জানাব।'

'কখনও ভেবেছ, এত ঝুঁকির জীবন থেকে অবসর নেয়ার কথা?' বলল মিতা। 'হয়তো সংসার করলে?'

নদীর বিপজ্জনক বাঁকে পৌঁছে গেছে মিতা। চুপ করে থাকল রানা।

'কী ভাবছ?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'ভাবছি, সামনে বিপদ হবে।'

'ও,' হতাশ হলো মিতা। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, সত্যি,

কখনও বাঁধতে পারবে না মানুষটাকে মায়ার জালে। মনে পড়ল আশা ভোঁশলের প্রিয় একটা গানের কথা: *তারে ভোলানো গেল না কিছুতেই!* এদের ভোলানো যায় না কোনওদিন।

'বাইরে দেখো।'

জানালা দিয়ে দূরে তাকাল মিতা। অন্ধকার ছাড়া কিছুই নেই। মাইলের পর মাইল প্রায়-অভেদ্য ঘন জঙ্গল। তারপর হঠাৎ দেখল রুপালি ঝিলিক। যেন প্রতিফলিত হয়েছে দানবীয় কোনও আয়নায়। হারিয়ে গেল আলো।

ওটা কী, বুঝল না মিতা। আগে কখনও এমন কিছু দেখেনি। ঝলসে উঠেছিল জঙ্গলের মাঝে।

অন্ধকারে চেয়ে রইল ও। কানফাটা শব্দে এগিয়ে চলেছে বিমান। কিছুক্ষণ পর আবারও দেখল রুপালি ঝলক। এবার চারপাশের অন্ধকারের সঙ্গে মিতালি করে রয়ে গেল ওই আলো। সাপের মত চলেছে ঘাসের মাঝে। হারিয়ে গিয়ে আবারও ফিরল সাদা রশ্মি। বিমানের সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে হবে তার।

কয়েক সেকেণ্ড পর মিতা বুঝল, আকাশের চাঁদ প্রতিফলিত হচ্ছে অনেক নিচের সরু নদীর জলে।

'আগেও দেখেছ এই দৃশ্য?' বলল মিতা।

'হ্যাঁ। দারুণ না?'

মাথা দোলাল মিতা।

'এবার ঘুমন্ত সুন্দরকে জাগিয়ে তোলো,' কুচকুচে কালো প্রফেসরকে দেখাল রানা। 'কিছুক্ষণ পরেই পৌঁছে যাব।'

গিয়ে কাঁধে টোকা দিয়ে হ্যারিসনকে তুলল মিতা।

চোখ কচলে নিয়ে চমকে গেলেন প্রফেসর। নিচে জঙ্গলের মাঝে নদী, নানাদিকে তৈরি করেছে ছোট কিছু খাল। সেগুলোরই কোনওটায় নামতে হবে। পিছিয়ে গেল বামে কয়েকটা লেক।

জলে চাঁদের প্রতিফলন। সবমিলে ডজনেরও বেশি লেক।

মিতার মনে হলো, পায়ের ছাপ রেখে গেছে স্বর্গের কোনও দেবতা।

'অকল্পনীয় দৃশ্য,' বললেন প্রফেসর।

'ফুরিয়ে এসেছে তেল, এবার নামব সবচেয়ে বড় লেকে, নইলে বিধ্বস্ত হবে বিমান জঙ্গলে,' দুঃসংবাদ দিল রানা।

অবাক চোখে ওকে দেখল মিতা ও কম্পমান প্রফেসর।

'অন্য উপায় ছিল না, নইলে রাশানরা, ল্যাঙের লোক, আর্মি বা পুলিশের লোকের হাতে ধরা পড়তাম,' ব্যাখ্যা দিল রানা।

মাথা দোলাল মিতা। 'ও!'

'শেষে খুন হলাম বেপরোয়া, নচ্ছার, দুর্ধর্ষ রানার হাতে!' করুণ সুরে বললেন প্রফেসর।

সরু, আঁকাবাঁকা নদী গেছে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে, দু'পাশে ছোট পুকুর ও লেক, যেন আলোর দেবতার রুপালি পদচিহ্ন।

প্রফেসরের কাছ থেকে পাওয়া মানচিত্র দেখল রানা। এ দেশের উঁচু জমিতে পৌঁছে গেছে ওরা। নানান দিক থেকে নদী বা লেকে পড়েছে ঝর্না। কিন্তু সবই শীর্ণ। এ বছর অস্বাভাবিক বৃষ্টি হ্রাসের ফলে লেকের গভীরতা কম। হেলিকপ্টার পেলে বিপদ ছিল না, কিন্তু এত ছোটসব লেকে উভচর বিমান নামানো খুব কঠিন কাজ!

ছত্রিশ

আগে কখনও হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে এত লোক

দেখেননি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। জয়েন্ট চিফ, সিআইএ ডিরেক্টর ক্যালাগু, স্টেটসের ডিফেন্স সেক্রেটারিরা এবং তাঁদের এইডরা গিজগিজ করছে ঘরে। প্রধান টেবিল ঘিরে অন্যান্য কেবিনেট সদস্যরা।

গত কয়েক ঘণ্টায় আরও জটিল হয়েছে পরিস্থিতি। রাশানরা গুপ্তচর ফাইটার বিমান ফেলে দিয়েছে বলে পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে চিন নেভি। বিতর্কিত সাগরে দুটো গুপ্তচর রাশান বোট দখল করে নিয়েছে তারা। সীমান্তে জড় হচ্ছে দু'দেশের সেনাবাহিনী।

বিপজ্জনক সাগরের দিকে যাচ্ছিল আমেরিকার এক নেভির জাহাজ, কিন্তু বিপদ বুঝে পিছিয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন। নইলে বেদখল হতো ওই রণতরী। এখন প্রতারক দেশ হিসেবে আমেরিকার দিকে আঙুল তুলছে রাশানরা। একই কথা বলছে চিন সম্পর্কে।

এদিকে চিনা কর্তৃপক্ষ জানতে চেয়েছে, কী কারণে তাদের সাগরে ঘুরঘুর করছে রাশান ও আমেরিকান গুপ্তচর রণতরী। সেক্ষেত্রে তারা কেন ধরে নেবে না, ওই দুই দেশ মিলে হামলা করতে চাইছে চিনের ওপর?

আমেরিকার দিকে আঙুল তাক করছে চিন ও রাশা।

নিজেরাও সন্দেহ করছে পরস্পরকে।

নিজের চেয়ারে চুপ করে বসে সিচুয়েশন রিপোর্ট শুনছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

বড় ফ্ল্যাট-স্ক্রিন দেখিয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করছেন জয়েন্ট চিফ।

'...এদিকে তাদের মোকাবিলা করতে রাশান সীমান্তে পাঠানো হয়েছে চাইনিজ আর্মির চল্লিশটা ডিভিশন। শুধু তাই নয়, কৌশলগত সব জায়গায় মোতায়েন হয়েছে আধুনিক যুদ্ধবিমান। সবই রাখা হয়েছে সীমান্তের এক শ' মাইলের

ভেতর।'

ক্লিক করে নতুন ছবি আনলেন জয়েন্ট চিফ।

ওটা স্যাটেলাইট ইমেজ। দেখা গেল রাশান আইসিবিএম সাইলো। বিদঘুটে মস্ত এক ট্যাঙ্কার ট্রাক থেকে নানান হোস গেছে মিসাইলের পেটে। 'যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে রাশানরা। তৎপরতা দেখে বোঝা যাচ্ছে, তারা হামলা করতে পারে দু'দিকে। সেনাবাহিনী সদস্যরা দু'ভাগে ভাগ হয়েছে, একদল হামলা করবে এশিয়ায় চিনের ওপর, অন্য দল ইউরোপে।'

নতুন ছবি এল স্ক্রিনে।

সীমান্তের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে মোবাইল এসএস-২০ লঞ্চার।

বিশেষ একটি ছবি দেখা গেল। বছরের এ সময়ে বরফে ঢাকা থাকে মারম্যানস্ক বন্দর, কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে প্রকাণ্ড আইসব্রেকার দিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছে সমস্ত বরফ।

'আমাদের দৃষ্টিতে এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা,' বললেন জয়েন্ট চিফ, 'আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাগরে ছড়িয়ে পড়বে তাদের ব্যালিস্টিক মিসাইল বহর। কিউবার মিসাইল ক্রাইসিসের সময় আমরা ধরে নিয়েছিলাম, যুদ্ধে নামতে হলে সময় নেবে রাশানরা। কিন্তু এখন অন্য কিছু দেখছি আমরা।'

প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন তিনি। 'এটা মস্ত বিপদ সঙ্কেত, স্যর। রাশানরা খুবই সিরিয়াস। আমাদেরও উচিত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া।'

কী করবেন ভাবছেন প্রেসিডেন্ট।

আপাতত বিপদ ঘটাবে না ব্রাযিল স্টোন। রাখা হয়েছে ইয়াকা মাউন্টেনের গভীর অংশে। চারপাশের সেন্সর থেকে জানা গেছে, ওই স্ফটিক থেকে বেরোচ্ছে না ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি। তবে এনআরআই স্টাফ, সিআইএর এক্সপার্ট বা ক্যাথিবা আলিহাও বলতে পারবেন না,

আবার কখন মারাত্মক বিচ্ছুরণ হবে ওটা থেকে।

শুরু হয়েছে তিন দেশের স্নায়ু যুদ্ধ, এখন ব্রাযিল স্টোন থেকে আবারও বিচ্ছুরণ হলে মহাবিপদে পড়বে আমেরিকা।

যুদ্ধাবস্থায় পড়েছেন, ভাবছেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু হঠাৎ বুঝলেন, অন্যদিক থেকে কপাল ভাল।

এনআরআই হেডকোয়ার্টারে বা অ্যাণ্ড্রিউ এয়ার ফোর্স বেস থেকে রওনা হওয়ার আগেই ওই স্ফটিক বিচ্ছুরণ ঘটালে বিদ্যুৎহীন হতো পুব উপকূল। কানা হতো পেন্টাগন, হোয়াইট হাউস, কংগ্রেস, ল্যাংলির সিআইএ— সবই।

ওই বিচ্ছুরণের ফলে বিনষ্ট হয়েছে গ্রুম লেকের প্রায় প্রতিটি সার্কিট ও ব্যাকআপ সিস্টেম। এমন কী আশি মাইল দূরের নেলিস এয়ার ফোর্স বেসও হয়ে পড়েছে অকার্যকর।

ওদিকে নেয়ার আগেই ব্রাযিল স্টোন থেকে বিচ্ছুরণ হলে অসহায় অবস্থায় পড়ত পুরো দেশ। এমন কী কাজ করত না ল্যাণ্ড ফোন। টিভি নেই, রেডিয়ো নেই, ইন্টারনেট নেই। পুবের কোনও এয়ারপোর্টে নামতে পারত না একটাও বিমান। হঠাৎ করেই যেন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যেত নিউ ইয়র্ক থেকে শুরু করে ওয়াশিংটন। যে-কেউ ভাবত, আমেরিকার ওপর নিউক্লিয়ার হামলা করেছে কোনও সুপারপাওয়ার।

সন্দেহের বশে অন্য দেশের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা হামলা করত ওয়েস্টার্ন কমাণ্ড।

হ্যাঁ, কপাল ভাল, ওই বিচ্ছুরণ হয়েছে সভ্যতা থেকে বহু দূরে। তবে ওটার কারণে মনোভাব পাল্টে গেছে প্রেসিডেন্টের। বারবার সিআইএ চিফ ক্যালাগুর কথা শুনে এখন তাঁরও মনে হচ্ছে, ভয়ঙ্কর স্ফটিক সত্যিই তাঁদের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। যারা এসব নিয়ে গবেষণা করছে, তারাও জানে না এরপর কী ঘটাবে ওটা। কাজেই এ ধরনের এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাওয়া বোকার কাজ।

গত কিছু দিন হলো পুরনো বন্ধু জেমস ব্রায়ানের দিকে ঝুঁকে তাকে সহায়তা করেছেন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছেঃ কী ধরনের বিপদ আসছে, তা বুঝতে পারছে না সে।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বললেন জয়েন্ট চিফ, 'দেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে অনুরোধ করছি, আমরা যেন তৈরি রাখি আমাদের মিলিটারিকে। তাই বলব, আপনার বোধহয় ঘোষণা করা উচিত ডিফেন্স কণ্ডিশন টু।'

'টু?' থমকে গেলেন প্রেসিডেন্ট।

'জী, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। রাশা ও চিনের যুদ্ধাবস্থার কারণে এটা ঘোষণা করা এখন জরুরি।'

প্রেসিডেন্টের মনে পড়ল জেমস ব্রায়ানের কথাঃ একটা বাড়াবাড়ি তৈরি করে অন্যের বাড়াবাড়ি। ঠিকই বলেছে এনআরআই চিফ। তবে নিজে ভুলে গেছে, তার কারণেই আজ এই বিপদ।

ব্রিফিং ফোল্ডারের ছবি দেখলেন প্রেসিডেন্ট।

ফিউয়েল ভরা হচ্ছে রাশান আইসিবিএম-এর বুকে। এটা করা হচ্ছে পুরো দশ বছর পর।

হাতের তালু ঘামছে প্রেসিডেন্টের। একটু আগেও ভেবেছেন, সামলে নেবেন সব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, হাতের বাইরে চলে গেছে পরিস্থিতি। আরও একটা চিন্তা এল তাঁর মনেঃ পুরনো বন্ধু জেমস ব্রায়ান আর আমেরিকার জনগণকে একইসময়ে নিরাপদে রাখতে পারবেন না।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট... জরুরি হয়ে উঠেছে আপনার নির্দেশ।'

ফোল্ডার বন্ধ করে মুখ তুললেন প্রেসিডেন্ট। 'না। ডেফকন থ্রি ঘোষণা করুন। নিরাপত্তার জন্যে সবই করুন, কিন্তু আগেই যেন সাগরে না যায় আমাদের রণতরী। সতর্ক থাকুক বোমারু বিমানের পাইলট ও ক্রুরা। তৈরি রাখা হোক আইসিবিএম।

কিন্তু রাশা বা চিনকে কোনওভাবেই ভয় দেখাবেন না। নইলে চাকরি থাকবে না আপনাদের। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?'

এতই গম্ভীর কণ্ঠে বলেছেন প্রেসিডেন্ট, একেবারে থমকে গেছে ঘরের সবাই। এরপর উত্তেজিত হয়ে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করবে না কেউ প্রেসিডেন্টকে।

'জী, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বললেন জেসিএস।

চেয়ার ছাড়লেম প্রেসিডেন্ট।

সবার মনোযোগ চলে এল তাঁর ওপর।

'প্রতি দু'ঘণ্টা পর পর আপডেট চাই।' সিআইএ চিফ ক্যালাগুর দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

দৃঢ় পায়ে সিচুয়েশন রুম থেকে করিডোরে বেরিয়ে এলেন তিনি। রাগে থমথম করছে চেহারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যারা অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে, সবাই সরে গেল দেয়ালের কাছে। এখন সময় নয় আবদার করার।

প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে পিছু নিয়েছেন সিআইএ চিফ ক্যালাগু। হোয়াইট হাউসের এলিভেটরের দিকে চলেছেন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে মাঝ করিডোরে ধরলেন তিনি।

'ব্রায়ানের ব্যাপারে কী বুঝলেন?' ধমকের সুরে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

থমকে গিয়ে দ্বিধা করলেন ক্যালাগু। কয়েক সেকেণ্ড পর কথা গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'যা খুশি তা-ই করতে চান তিনি। শেষ কথা: বিচার মানি, কিন্তু তালগাছ আমার।'

ব্রায়ান অমন লোক নন, ভাল করেই জানেন প্রেসিডেন্ট। যুক্তি না থাকলে এত ঝুঁকি নিতেন না তিনি। আরও কিছু আছে এসবের ভেতর।

করিডোরে বাঁক নিয়ে পরের প্রশ্ন ছুঁড়লেন প্রেসিডেন্ট: 'ব্রায়ান কী ধরনের তথ্য গোপন করছেন?'

দূরে চোখ রাখলেন সিআইএ চিফ। ভঙ্গি নিয়েছেন, তিনি ভাবছেন। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'প্রথম দিন থেকেই এনআরআই-এর বিপক্ষে ছিলাম। ব্রায়ান চিফ হওয়ার পর বিরক্তি বেড়েছে আরও। তিনি মনে করেন, মাঝখান থেকে এসে নাক গলাতে চাইছি। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, যা করছি, সবই দেশের জন্যে। এনআরআই থেকে সমস্ত ডেটা নিয়েছি আমরা। সেসবের ভেতর কোনও ত্রুটি থাকলে অবশ্যই তা চোখে পড়বে আমাদের। ব্রায়ান গোপন কিছু করে থাকলে, তা হয়তো রাখেননি ডেটার মাঝে।'

একমত হলেন না প্রেসিডেন্ট। তবে অযৌক্তিক কিছু কাজ করেছেন ব্রায়ান। ছোট একটি দল পাঠিয়ে দিয়েছেন মেক্সিকোয়। পরে সাহায্য চেয়েছেন বাংলাদেশের এক লোকের কাছে। এসব দায়িত্ববান, দেশপ্রেমিক ব্রায়ানের চরিত্রের সঙ্গে ঠিক মেলে না।

এলিভেটর থেকে ত্রিশ ফুট আগে থামলেন প্রেসিডেন্ট। অপেক্ষা করছে সিক্রেট সার্ভিসের গার্ড।

'আপনার কি মনে হয় ব্রায়ানের কাজ যৌক্তিক?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

সবুজ সিগনাল পেয়ে গেছেন সিআইএ চিফ। অবশ্য নালিশ না করে নরম সুরে বললেন, 'আপনি যদি জানতেই চান, মিস্টার প্রেসিডেন্ট...' চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

পেটের সব নোংরা প্যাঁচ মারবে এবার ক্যালাগু।

বন্ধু ব্রায়ানের ওপর রেগে গেলেন প্রেসিডেন্ট। তার কারণেই আজ এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে!

'আমি চাই আপনি আবারও ফিরবেন ইয়াকায়,' বললেন তিনি, 'ব্যক্তিগতভাবে চোখ রাখবেন ব্রায়ানের ওপর।'

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট...'

'অনেক জড়িয়ে গেছে ব্রায়ান, চাইলেও তাকে সরিয়ে দেয়া কঠিন। অন্যদের চেয়ে বেশি জানে ব্রাযিল স্টোন সম্পর্কে। আমার মনে হচ্ছে, শেষপর্যন্ত ওই জিনিস ধ্বংস করে দেয়াই ভাল। তবে তাতে আপত্তি থাকতে পারে ব্রায়ানের, সরিয়ে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে ঠেকাবেন আপনি।' কয়েক সেকেণ্ড ভেবে আবারও বললেন তিনি, 'প্রয়োজনে চরম সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা করবেন না।'

সাঁইত্রিশ

আকাশ থেকে নিচের জঙ্গলের মাঝে নদী ও লেক দেখছে রানা। একটু পর পর বাঁক নিয়েছে সরু নদী, ওখানে প্লেন নামানো অসম্ভব। এদিকে বর্ষা মৌসুম শুরু হয়নি বলে অগভীর ছোট সব লেকে নামা আরও বিপজ্জনক। কিন্তু ফুরিয়ে এসেছে তেল, ঝুঁকি না নিয়ে কোন উপায়ও নেই।

পুরো সাত মিনিট নদী অনুসরণ করল রানা। না, আশপাশে বড় কোনও লেক নেই। মাত্র পাঁচ মিনিট পর শেষ হবে তেল। বিমান ঘুরিয়ে আগে-দেখা বৃত্তাকার এক লেকের দিকে চলল রানা।

কিছুক্ষণ পর বিমান নিয়ে নেমে এল অনেক নিচে।

একটু গেলেই সামনে সরু কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এক লেক। কিন্তু পাশ থেকে আসবে জোরালো হাওয়া। বিপদ হতে পারে।

ওটা বাদ দিয়ে বৃত্তাকার লেকের দিকেই চলল রানা। জ্বেলে নিল ল্যাণ্ডিং বাতি। গাছের সারি প্রায় ছুঁয়ে পৌঁছল লেকের কাছে। অগভীর জলে পচা গাছের কাণ্ড ভাসছে দেখে গলা শুকিয়ে গেল ওর। ভাল দিক হচ্ছে, পেছন থেকে আসছে হাওয়া।

লেক পেরিয়ে আবারও ঘুরল রানা। ইন্টারকমে জানাল, 'সিটবেল্ট বেঁধে নাও।' আবারও কো-পাইলটের সিটে এসে বসেছে মিতা। ওর সিটবেল্ট পরীক্ষা করল রানা। ওদিকে পাবলোকে পাশে নিয়ে চোখ বুজে আছেন প্রফেসর, গলা থেকে বেরোচ্ছে জ্বরাক্রান্ত রোগীর মত কোঁ-কোঁ আওয়াজ।

ইঞ্জিনের গতি কমিয়ে ফ্ল্যাপ আরও খুলল রানা। বিমানের নাক উঁচু রাখতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে।

'আরেকবার ঘুরে দেখলে ভাল হতো না?' জানতে চাইল মিতা। 'তেল আছে?'

'মাত্র দু'মিনিটের,' বলল রানা।

'কিন্তু লেকে গাছ থাকলে? আমরা তো খুন হব!'

একই কথা ভেবেছে রানা। কিন্তু এ-ও জানে, মেক্সিকোর দুর্ভেদ্য নরকের মত কারাগারে বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়ার চেয়ে জঙ্গলের মাঝের লেকে লাশ হওয়া ঢের আনন্দের ব্যাপার।

'পাইলটদের পুরনো একটা বাণী শুনবে?' বলল রানা। 'রাতে ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিঙের সময় এক শ'ফুট ওপরে জ্বেলে নেবে ল্যাণ্ডিং বাতি। যা দেখবে, ওটা অপছন্দনীয় হলে নিভিয়ে দেবে সেটা। তারপর স্রষ্টা বা শয়তানের কাছে প্রার্থনা করবে। তাই, মিতা, তুমি এখন ভগবানের কথা ভাবতে পারো।'

বিড়বিড় করে প্রার্থনা শুরু করেছে মিতা। রাগী চোখে একবার দেখল রানাকে।

নির্বিকার চেহারায় কী সব সুইচ দেখছে বাঙালী গুপ্তচর।

ঝাঁকি খেয়ে নামছে বিমান। দুলছে এদিক-ওদিক।

সামনে থ্রটল ঠেলে দিল রানা। গাছের সারির ওপর পড়ল বিমানের ল্যাণ্ডিং বাতি।

মিতার মনে হলো হাজারটা ডাল ছুটে আসছে ওর দিকে! ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল ও, 'রানা!'

একটা গাছের মগডাল ভেঙে এগোল বিমান। পরক্ষণে বিশাল এক ঝপাস্ শব্দে নামল লেকের জলে। দ্রুত কমছে বেগ। সামনে ছিটকে যেতে চাইল ওদের দেহ, কিন্তু টানটান হয়ে বাধা দিল সিটবেল্ট।

লেকের জল ছেড়ে ওপরে উঠল বিমান। ধুপ্ করে আবারও নামল নিচে। কালো কাঁচের মত জল ছলকে চলেছে দূরে।

'শক্ত হয়ে বোসো,' বলল রানা।

'কেন? আমরা তো নেমে গেছি!' কাঁপা গলায় বলল মিতা।

একবার ওকে দেখল রানা, তারপর কথাটা পাড়ল, 'সমস্যা হচ্ছে, আমাদের কোনও ব্রেক নেই।'

'নেই?' উইণ্ডশিল্ড দিয়ে সামনে তাকাল মিতা।

একই কাজ করছে রানা। ঝড়ের বেগে আসছে লেকের তীর!

বেগ কমছে বটে, কিন্তু তীরে গিয়ে গুঁতো দেবে বিমান!

কয়েক সেকেণ্ড পর ধুম্ শব্দে তীরে ধাক্কা মারল বিমান। হুড়মুড় করে উঠে এল জঙ্গলের ভেতর। থামল সরু কয়েকটা গাছ ভেঙে।

সোজা হয়ে বসে রানাকে দেখল মিতা। 'ব্রেক নেই? এটা জেনেও এমন বিমান নেয় কোনও পাগল?'

'নিয়েছি, যাতে নামতে পারি লেকে,' বলল রানা, 'তুমি জানতে না, এসব বিমানে ব্রেক থাকে না?'

'ও!' বড় করে দম ফেলল মিতা। 'না, জানতাম না। এবার এই খাঁচা থেকে বেরোতে চাই!'

ওর হাতে ফ্ল্যাশলাইট ধরিয়ে দিল রানা। সিটবেল্ট খুলে

ককপিটে চলে এল পাবলো। দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। ঢালু জমিতে ওর পিছু নিল অন্যরা।

পাশে পৌঁছে রানার কাঁধ চাপড়ে দিলেন হ্যারিসন। 'ভীষণ ভয় পেয়েছি। তবে একেবারে মেরে ফেলোনি, এজন্যে থ্যাঙ্ক ইউ। আর কখনও তোমার বিমানে বা হেলিকপ্টারে জীবনেও উঠব না!'

রানা ভাবছে, বিমান তো গেল, কিন্তু ওটার ব্যাটারি আর রেডিও পরে কাজে আসবে।

জঙ্গলে ফ্যাকাসে সাদা আলো ফেলেছে নক্ষত্র ও চাঁদ। রানা টের পেল, যা ভেবেছিল, তার চেয়েও ছোট ছিল বৃত্তাকার লেক। চওড়ায় ও দৈর্ঘ্যে বড়জোর সাত শ' ফুট। তীরে পঞ্চাশ ফুটি গাছের সারি। খারাপ ল্যাণ্ডিং হয়নি। কিন্তু তাতে খুশি হওয়ার কিছু নেই। দূরে কাঁপা কাঁপা আলো। তারপর এল ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল রশ্মি। বেশ কয়েকটা কমলা আগুনও জ্বলছে মশালের আগায়।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে আসছে একদল লোক। জেনে গেছে, লেকে নেমেছে বিমান। তারা শত্রু না বন্ধু বোঝা যাবে একটু পর।

থেমে দাঁড়াল রানা। 'অপেক্ষা করো, ওরা আসুক।'

'ওরা কারা?' জানতে চাইল মিতা।

'মায়ানদের উত্তরসূরী,' বলল রানা, 'তবে আমাদেরকে সাহায্য করবে না ক্ষতি করবে, সেটাই দেখার বিষয়।'

জঙ্গলের মাঝে ওরা পেল পোড়া কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ।

কাছে চলে এসেছে লোকগুলো।

পাবলোর কাঁধে হাত রাখল মিতা। 'আমাদের উচিত নয় পালিয়ে যাওয়া?' জানতে চাইল রানার কাছে।

'সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'আমরা এই এলাকা চিনি না।' ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল ও। আলো নেড়ে দেখাল ওরা কোথায়

আছে।

দিক বদল করে এদিকে এল মশাল ও ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

'কাছেই বোধহয় ছোট শহর আছে,' বললেন প্রফেসর, 'কপাল ভাল হলে এখানকার লোক বলতে পারবে, জঙ্গলের ভেতর কোথায় আছে প্রাচীন মায়ান স্থাপত্য।'

একই কথা ভেবেছে রানা।

খুব কাছে পৌঁছে গেল আলো। নেমে আসছে টিলার গা বেয়ে। একটু পর ঝোপঝাড় ছেড়ে বেরিয়ে এল অন্তত বিশজন লোক। কয়েকজনের হাতে শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট।

আলো ফেলতেই চোখ ঢাকল মিতা।

স্প্যানিশ ভাষায় জানতে চাইল রানা, 'আপনারা কি সাহায্য করতে পারবেন? আমরা বিপদে পড়েছি।'

জবাব দিল কর্কশ স্বরের এক লোক, 'পংগো লস ম্যানোস!'

নির্দেশমত মাথার ওপর হাত তুলল রানা। ওর দেখাদেখি অন্যরা। কিছু বলতে হয়নি, কড়াৎ-কড়াৎ কয়েকটা শব্দে বুঝে গেছে, কক করা হয়েছে কয়েকটা পাম্প শটগান।

ঘিরে ফেলা হলো রানা, হ্যারিসন, মিতা ও পাবলোকে। সবার ওপর তাক করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র।

বয়স্ক এক লোককে দলের নেতা মনে হলো রানার।

দৈর্ঘ্যে খাটো সে। বুক ভরা দাড়ি। গোঁফটা কাঠবিড়ালির লেজের মত বড় ও ফোলা। একহাতে ফ্ল্যাশলাইট, অন্যহাতে পিস্তল।

সার্চ করতে রানাদের বিমানে উঠল এক লোক। আরেকজন কেড়ে নিল মিতা ও হ্যারিসনের ব্যাকপ্যাক। ভালভাবে ওদের দেহ তল্লাশী করল তৃতীয় লোকটা। রানার কাছে ওয়ালথার পেয়ে সরিয়ে ফেলল।

রানাদের ঘিরে পায়চারি শুরু করেছে দাড়িওয়ালা। তবে

দূরত্ব রেখেছে। হামলা করে তাকে জিম্মি করবে রানা, সে উপায় নেই। সবার পর পাবলোর ওপর মনোযোগ দিল সে। কিছুক্ষণ পর কোমরে গুঁজে রাখল পিস্তল।

'সেনোর, সেনোরা, আপনারা এখানে কী চান?'

'বিমান ক্র্যাশ করেছে,' রানা কিছু বলার আগেই তৈরি জবাব দিল মিতা। 'আমার স্বামী যাচ্ছিলেন পুয়ের্তো ভ্যালার্তায়, কিন্তু বেসামাল করে দিল দমকা বাতাস। তার ওপর ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে পড়ে গেল সব তেল।'

কাছে সরে মিতাকে দেখল বয়স্ক লোকটা। তার চোখ পড়ল ওর হাতে। 'এই যুবক যদি স্বামীই হবে, তো কোথায় আপনার আঙটি?' মিতা কিছু বলার আগেই জানাল, 'অনেকক্ষণ চক্কর কেটেছেন আকাশে। উপকূলে চলে যেতে পারতেন। কাজেই বুঝতে পারছি, আপনার পেটে অন্য গল্প আছে। তো সেটা কী?'

ধরা পড়ে লজ্জায় লাল হলো মিতা।

রানার দিকে ফিরল গোঁফওয়ালা। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই বিমানের পেট থেকে জানাল একজন, 'ভেতরে কেউ নেই। মালপত্রও নেই।'

ব্যাকপ্যাক খুলে ফেলেছে আরেকজন। দাড়িওয়ালার হাতে দিল কাঁচের মত স্ফটিক ও স্যাটেলাইট ফোন।

কাছে স্ফটিক দেখে ছুটে যেতে চাইল পাবলো। শক্ত হাতে ওকে ধরে রাখল মিতা।

পাবলোর প্রতিক্রিয়া খেয়াল করেছে বয়স্ক লোকটা। 'আপনার ছেলে?' জানতে চাইল।

'পালক,' বলল মিতা। 'ওর শারীরিক সমস্যা আছে। এখানে জঙ্গলের ভেতর আমাদেরকে আটকে রাখবেন না।'

এক তরুণের হাতে স্ফটিক দিল লোকটা। পুরো সময়ে ড্যাব-ড্যাব করে ওটাকে দেখল পাবলো। সীসা দিয়ে মজবুত করা বাক্সে রেখে দেয়া হলো স্ফটিক।

'নানান মিথ্যা বলছেন,' বলল গোঁফওয়ালা, 'যাজকের কাছে আপনাদের স্বীকারোক্তি করা উচিত। তাতে পাপ মোচন হবে।' ঘুরে টিলার দিকে পা বাড়াল সে, 'এদেরকে নিয়ে এসো!'

আটত্রিশ

প্রায়ান্ধকার বার-এ বসে আছে ইগোর দিমিতভ। টেবিলে তিনটে গ্লাসে কম পয়সার তিন পেগ ভোদকা। পাশের চেয়ারে বসেছে স্থানীয় এফএসবি ইউনিটের নেতা।

বেয়াড়া যুবককে পছন্দ হয়নি ইগোর দিমিতভের। নেতা হওয়ার যোগ্যতা নেই এর। ইগোর বুঝে গেছে, এদেরকে রাখা হয়েছে ওকে পাহারা দেয়ার জন্যে। প্রশ্ন করলে বা নির্দেশ দিলে জবাব দেবে বা আদেশ পালন করবে, কিন্তু চোখে-মুখে অন্যকিছু। তাদের সত্যিকারের প্রভু রয়ে গেছে মস্কোয় এফএসবি অফিসে।

'ভোদকা নেব তোমার জন্যে?' বলল ইগোর দিমিতভ।

'আমি ড্রিঙ্ক করি না,' বলল যুবক।

কাঁধ ঝাঁকাল ইগোর। 'করলেই ভাল করতে, খুব বিরক্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'লাশ ফেলে চলে আসা ঠিক হয়নি,' বলল এফএসবি ইউনিট দলনেতা।

'এ ছাড়া উপায় ছিল না,' বলল ইগোর।

'পিছু নেয়া উচিত ছিল,' জোর দিয়ে বলল যুবক।

এক পেগ ভোদকা শেষ করে আরেকটা গ্লাস নিল ইগোর।

কুঁচকে উঠেছে ভুরু। 'টুরিস্ট ভরা ব্যস্ত সৈকতে অস্ত্র হাতে ধাওয়া করতে? তোমার ধারণা আছে, কয়েক মিনিট পরেই পৌঁছত মেক্সিকান পুলিশ? মাত্র পাঁচ থেকে সাত মিনিটে হাজির হতো হেলিকপ্টার আর অন্তত দশটা পুলিশের গাড়ি। পালাতে কীভাবে? কাজ এগোত তাতে? আমাদের প্রথম দায়িত্ব পাবলোকে দেশে ফিরিয়ে নেয়া।'

যুবক রেগে গেলেও সামলে রাখল নিজেকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে: আপনি আসলে ওকে ধরতে চান কি না।'

বিরক্তি চেপে হাসল ইগোর দিমিতভ। 'অনেক কিছুই ভাবতে পারো।'

উঠে দাঁড়াল এফএসবি ইউনিট দলনেতা। 'আগামীকাল রওনা হব। পরেরবার আপনার কথামত সময় নষ্ট করব না, সেটা মাথায় রাখবেন।'

বার ছেড়ে বেরিয়ে গেল যুবক।

এর বয়স কম, ভাবল দিমিতভ। ওজন ওর চেয়ে ত্রিশ পাউণ্ড বেশি। শক্তিশালী। পুরনো এজেন্টের প্রতি সম্মান নেই মনে।

দিমিতভের মনে পড়ল, কীভাবে বদলে গেছে সব। একসময় ও-ই ছিল সত্যিকারের হিরো, এজেন্টদের মাঝে সবচেয়ে প্রতিভাবান। এফএসবি ছেড়ে দেয়ার পরেও নানান কাজে ডাকা হতো। আর আজ পাঠানো হয়েছে বাচ্চা এক ছেলেকে কিডন্যাপ বা খুন করতে!

এই অপমান রাখবে কোথায়?

এফএসবির কাজ না করলে খুন হবে ও। বাদ পড়বে না আত্মীয়স্বজন। এখন আর সম্মান বলতে কিছুই নেই ওর। কোনও দাম নেই।

আরেক পেগ ভোদকা গলায় ঢালল দিমিতভ। জমে উঠছে

নেশা। হ্যাঁ, কিছু করতে হবে, নইলে খুন হবে অর্ধেক বয়সের সব এজেন্টের হাতে!

ঊনচল্লিশ

রানা, মিতা, হ্যারিসন ও পাবলোকে বন্দি করে ঘন ঝোপঝাড় ও জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলেছে সশস্ত্র লোকগুলো।

অনেকক্ষণ পর হালকা হলো অরণ্য। পাহাড়ি উঁচু এলাকা ছেড়ে নেমে এসেছে ওরা।

পুবাকাশ ফর্সা হয়ে একটু পর উঁকি দিল লাল সূর্য।

দু'মাইল হাঁটার পর সামনে পড়ল খেলার মাঠ, অগভীর কাঁটা ঝোপঝাড়, সবুজ ফসলের জমি ও ঘাসে ঢাকা চারণভূমি।

একটু পর ওরা পৌঁছুল ছোট এক শহরে।

সাদা সব স্টাকো করা দালান। জেগে গেছে শহরবাসীরা। কাঁচা রাস্তায় খেলছে বাচ্চারা। গেট আটকে রাখা উঠানে গরু-ছাগল। মুক্তি পেয়ে গেছে মোরগ-মুরগি। ছোট সব পোকা খুঁজে নিয়ে সাবড়ে চলেছে খুশি মনে।

হিসাবে ভুল হয়নি, ভাবছে রানা। এটা সন্ত্রাসী দলের আস্তানা নয়। অবশ্য অস্ত্রের মুখে ওদেরকে নেয়া হচ্ছে প্রধান সড়ক ধরে। বন্দিদের দেখে সব ফেলে থমকে গেছে শহরবাসীরা। কয়েক সেকেণ্ড পর এগিয়ে এল অনেকেই।

দলের সামনে হাঁটছে দাড়িওয়ালা বয়স্ক লোকটা। সাধারণ পোশাকের সুন্দরী এক যুবতী আসতেই হাতের ইশারায় সবাইকে থামতে বলল সে। মহিলা শুভ সকাল বলার পর নিচু

স্বরে আলাপ শুরু হলো দু'জনের।

আড় চোখে মিতা ও পাবলোকে দেখল মেয়েটা।

এরা নিচু স্বরে কী বলছে, কিছুই জানা নেই, আরও শক্ত হাতে পাবলোর হাত ধরল মিতা। প্রাণ থাকতে ছেলেটাকে কেড়ে নিতে দেবে না।

'ভাববেন না,' আশ্বাসের সুরে বলল দাড়িওয়ালা। 'আপাতত ওর দায়িত্ব নেবে লিনিয়া। এদিকে আলাপ করব আমরা।'

মিতার মনে হলো নরম মনের মানুষ মহিলা। হাত তুলে একটু দূরের ছোট্ট এক বাড়ি দেখাল সে। কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করে পাবলোকে ছাড়ল মিতা।

আবারও এগোতে ইশারা করল বয়স্ক লোকটা।

দু'তিনটা বাড়ি পেরোবার পর সাদা এক বাড়ির উঠানে ঢুকল ওরা। রানা, মিতা ও হ্যারিসন বুঝল, এই দালান আসলে গির্জা। দরজায় লেখা, এই চার্চ স্যান ইগন্যাসিয়োর নামে উৎসর্গকৃত। উনি ছিলেন ক্যাথোলিক যোদ্ধাদের জেসুইট সন্ত।

দালানে ঢোকার পর পেছনে বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা।

বেদির সামনে থেমে নতজানু হয়ে ক্রুশ আঁকলেন বয়স্ক লোকটা, নিজের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন শ্লোক পড়া পবিত্র জল। এবার খুলে দেয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখলেন পঞ্চো, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন।

পরনের কালো আলখেল্লা ও সাদা গলাবন্ধ বলে দিল, তিনি একজন ক্যাথোলিক যাজক। ভারী গলায় বললেন, 'শুভ আগমন স্যান ইগন্যাসিয়োয়। আমি ফাদার ভাসকুয়েজ।'

'আপনি ফাদার...' বিড়বিড় করল মিতা। মন দমে গেছে।

মৃদু হাসলেন ফাদার ভাসকুয়েজ। 'একগাদা মিথ্যা বলে এখন বুঝি মন খারাপ লাগছে?'

রেগে গেছে মিতা। জানতে চাইল, 'বলুন তো, ফাদার, ঠিক

কবে থেকে অস্ত্রের মুখে মানুষকে কিডন্যাপ করছে এই চার্চ?'

ওর পাশেই টলে পড়ে যেতে গেলেন প্রফেসর হ্যারিসন, তবে চট্ করে তাঁকে ধরে ফেলল রানা। পাশের সরু এক বেঞ্চিতে শুইয়ে দিল। সতর্ক চোখে ওকে দেখলেন ফাদার ভাসকুয়েজ। আবার চোখ ফেরালেন মিতার চোখে। 'আমি যা করেছি, সেটা এই শহরের মানুষের নিরাপত্তার জন্যে।'

কড়া কথা বলার জন্যে মুখ হাঁ করল মিতা, কিন্তু আগেই বলে উঠল রানা, 'ফাদার, যদি আপনার কাছে সাহায্য চাই, তা কি পাব?'

'নির্ভর করবে কী চাইবেন, তার ওপর। আমরা নিজেরা কোনও বিপদের ভেতর পড়তে চাই না।'

'আপনাদের বিপদটা কোথা থেকে আসবে?' জানতে চাইল রানা।

'ড্রাগ স্মাগলারদের তরফ থেকে।'

'আমরা তাদের দলের লোক নই,' বলল রানা।

'এখন তাই মনে হচ্ছে,' বললেন ফাদার, 'কিন্তু আগে বোঝার উপায় ছিল না। কয়েক বছর আগে একদল লোক এসে টাকা সাধল আমাদেরকে। শুনল না কোনও কথা। গাছ কেটে তৈরি করল মাটির রানওয়ে। কেড়ে নিল আমাদের জমি। চাষ করতে লাগল ড্রাগসের গাছ।

'যারা তাদের টাকা নিয়েছিল, তারাও ফেরত দিতে চাইল। কিন্তু তত দিনে দানব হয়ে উঠেছে ড্রাগ লর্ড। মেরে ফেলল কয়েকজন সাধারণ নাগরিককে। কিন্তু এই শহরের মানুষের মন মরে যায়নি। যুদ্ধ ঘোষণা করলাম আমরা। কাজটা খুব কঠিন ছিল। লড়তে গিয়ে মারাও গেল বেশ কয়েকজন। তবে শেষপর্যন্ত তাড়িয়ে দিতে পারলাম দলবলসহ ড্রাগ লর্ডকে। আসলে একবার ঘরে বাঘ ঢুকতে দিলে ওটাকে বিদায় করা খুব কঠিন। শপথ নিলাম আমরা, আর কখনও এ এলাকায় ঢুকতে

দেব না ড্রাগ লর্ডের লোকদেরকে।'

জানালা দিয়ে নীল আকাশ দেখালেন ফাদার ভাসকুয়েজ। 'গভীর রাতে শহরের ওপর ঘুরছিল বিমান। তারপর নেমে পড়ল দূরের লেকে। ওদিকেই ছিল আমাদের কয়েকজন কাঠুরে। তাদের ফোন পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ করলাম আমরা। নিশ্চিত ছিলাম না আপনারা কারা। হয়তো জানেন না, মহান সন্ত ইগন্যাসিয়োও যাজক হওয়ার আগে সৈনিক ছিলেন। আমাদের উচিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আমরা তাই করেছি।'

চুপ করে আছে রানা। আগেও দেখেছে দুর্গম এলাকায় মানুষের ওপর কত অত্যাচার করে ড্রাগ লর্ডরা।

লজ্জা পেয়েছে মিতা, ভেবেছিল একদল ডাকাতের হাতে ধরা পড়েছে। 'আপনার কথা বুঝতে পেরেছি,' বলল ও।

'তোমার দিকটাও বুঝেছি,' বললেন ফাদার, 'মিথ্যা না বলে উপায় ছিল না। কিন্তু বুঝলাম না, এসেছ কী জন্যে। একটু খুলে বলবে? আমরা হয়তো সাহায্য করতে পারব তোমাদেরকে।'

'আপনি কি বিশ্বাস করবেন আমাদের কথা?' বলল মিতা।

'বলেই দেখো না। বিশ্বাস নিয়েই তো আমার কারবার।'

'আমরা খুঁজছি প্রাচীন এক মায়ান ধ্বংসাবশেষ। নাম ছিল পাহাড়ি জাগুয়ার রাজার মন্দির। আমাদের ধারণা, ওটা আছে এই শহরের কাছেই কোথাও।'

'হয়তো নেই,' বললেন ফাদার ভাসকুয়েজ, 'এসব না খুঁজে নিজেদের দেশে ফিরলেই ভাল করবে।'

'পথ ছিল না ফেরার,' বলল রানা, 'অন্যান্য কিছু কারণে শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই নেমেছি সবচেয়ে উপযুক্ত লেকে।'

'বুঝলাম,' মাথা দোলালেন ফাদার, 'ওই মন্দিরের ব্যাপারে গোপন রাখতে চান সব।'

'তার উপযুক্ত কারণ আছে, ফাদার,' বলল রানা।

'হয়তো তাই,' বললেন ভাসকুয়েজ, 'এমন জিনিস এনেছেন, যেটা বোঝেন না। খুঁজছেন অমন আরও একই জিনিস। ভাবছেন, খারাপ কারও হাতে ওগুলো পড়লে সর্বনাশ হবে পৃথিবীর। আমি কি ঠিক বলেছি?'

কয়েক সেকেণ্ড নিষ্পলক চোখে তাকাল রানা। তারপর মাথা দোলাল। 'ঠিকই বলেছেন।'

'জানলেন কীভাবে কী খুঁজছি?' জানতে চাইল মিতা।

'বোসো,' ওকে বেঞ্চি দেখালেন ফাদার, 'সব বুঝতে হলে ফিরতে হবে কয়েক শ' বছর আগের ইতিহাসের পাতায়।'

চল্লিশ

দুর্গম ইয়াকা পাহাড়ের গভীর সুড়ঙ্গে চলছে তুমুল বিতর্ক। আসলে এনআরআই চিফ, সিআইএ চিফ বা বিজ্ঞানীরা কেউই জানেন না কীভাবে আসছে বিদ্যুৎ ওই মায়ান স্ফটিকের ভেতর। জিনিসটা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ কারণেই টেলিকনফারেন্স হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত। একের পর এক প্রশ্ন ছোঁড়া হচ্ছে এনআরআই চিফ ব্রায়ানের উদ্দেশে।

সমস্ত দায় চাপাতে চাইছেন সিআইএ চিফ ক্যালাগু তাঁর ওপর।

ব্রায়ান বুঝে গেছেন, ওই স্ফটিক যে সত্যিই কাজের, তা বোঝাতে না পারলে ধ্বংস করে দেয়া হবে ওটাকে।

সিআইএ চিফ হাঁফিয়ে যেতেই জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট,

'কোথা থেকে আসছে ওটার শক্তি? ওটা কি নিউক্লিয়ার? বা ওই ধরনের কোনও কিছুর ফিউশন হচ্ছে?'

'রেডিয়োঅ্যাকটিভ নয়, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বললেন ব্রায়ান, 'হচ্ছে না কোনও কোল্ড বা হট ফিউশন। আমরা এখনও বুঝিনি, কীভাবে তৈরি করছে শক্তি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এনার্জি সংগ্রহ করছে কোথাও থেকে। জিনিসটা কণ্ডেট (conduit)-এর মত।'

'ব্যাখ্যা করে বলো,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'ধরুন বাড়ির বৈদ্যুতিক তারের সকেটে গুঁজে দিলেন আঙুল, সেক্ষেত্রে শক দেবে ওটা,' বললেন ব্রায়ান, 'কিন্তু বৈদ্যুতিক তার বা সকেট সৃষ্টি করেনি ওই শক্তি। ওগুলো বড়জোর কণ্ডেট। ওই বিদ্যুৎ এসেছে আপনার বাড়ি থেকে বহু মাইল দূরের পাওয়ার স্টেশন থেকে। আমরা ভাবতে শুরু করেছি, স্ফটিকের ওই এনার্জি আসছে অচেনা কোনওখান থেকে।'

'সেই জায়গাটা কোথায়?'

কথা বলতে হাঁ করেছিলেন এনআরআই চিফ, কিন্তু আগেই বলে উঠলেন সিআইএ চিফ ক্যালাগু, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, কখনও শুনেছেন জিওম্যাগনেটিক্ক রিভার্সালের কথা?'

'সরে যাচ্ছে উত্তর মেরু?'

মাথা দোলালেন ক্যালাগু। ফিরলেন তাঁর বিজ্ঞানীর দিকে। 'প্রেসিডেন্টকে খুলে বলুন, হ্যাগার্ড।'

চেয়ার ছেড়ে ল্যাব কোট ঝেড়ে নিয়ে দু'বার কাশলেন নার্ভাস বিজ্ঞানী। আগে এত ক্ষমতাশালী কারও সামনে পড়েননি। 'গত এক শ' মিলিয়ন বছর ধরে অন্তত বারোবার জায়গা ছেড়ে সরে গেছে দক্ষিণ ও উত্তর মেরু। শেষবার বড় পরিবর্তন এসেছে সাত শ' আশি হাজার বছর আগে। ওটাকে আমরা বলি ব্রানহেস-মাটুয়ামা রিভার্সাল। তবে এর আগে

এমনই হয়েছে বিলিয়ন বছর ধরে। কখনও চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার বছরের ভেতরেও সরে গেছে দুই মেরু। এরপর হয়তো স্থির থেকেছে পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর। ওটাকে বলি আমরা সুপারক্রন। অবশ্য কোনও বিজ্ঞানী হিসেব কষে বলতে পারবেন না কখন সরবে মেরু।'

সিআইএর বিজ্ঞানী কী বলতে চাইছেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই এনআরআই চিফের। অপেক্ষা করলেন তিনি।

চশমা ঠিক করে নিলেন বিজ্ঞানী, দরদর করে ঘামছেন। 'গত কয়েক বছর ধরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বুঝতে গবেষণা করছেন এনওএএ ও অন্যান্য সংস্থার রিসার্চ স্পেশালিস্টরা...'

বাধা দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'আগ্রহী হওয়ার মত বিষয়। কিন্তু এসবের সঙ্গে কীসের সম্পর্ক ওই ব্রাযিল স্টোনের?'

মস্ত ঢোক গিললেন সিআইএর বিজ্ঞানী। 'আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।' কমপিউটারের কি বোর্ডে টোকা দিলেন। ল্যাবের ফ্ল্যাট-স্ক্রিনে দেখা গেল গ্রাফ।

হোয়াইট হাউসের আরেকটি স্ক্রিনে ওই একই দৃশ্য দেখলেন প্রেসিডেন্ট।

গ্রাফের নিচে লেখা: আঠারো শ' সত্তর সাল।

সিআইএর বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা দেবেন, চিন্তায় পড়ে গেলেন ব্রায়ান। কী বলতে চাইছে এই লোক?

'আঠারো শতাব্দী থেকেই মেপে বের করা হচ্ছে উত্তর মেরুর ফিল্ড স্ট্রেংথ্ ও পযিশন,' বললেন বিজ্ঞানী, 'এই গ্রাফে দেখানো হয়েছে মেরু সরে যাওয়ার বিস্তার।'

চার্টের নির্দিষ্ট অংশে লাল রেখা দেখালেন। 'এখান থেকেই শুরু হয়েছে দ্রুত সরে যাওয়া। শুরু হয়ে গিয়েছিল আঠারো শ' সত্তর সালের আগেই। তা চরম কোনও কারণে বেড়ে ওঠে উনিশ শ' আট সালে।'

পয়েন্টার দিয়ে লাল রেখা দেখালেন। 'এরপর ধীর হয়েছে

সরে যাওয়া। গত এক শতাব্দী ধরেই প্রতি বছর সাত থেকে আট মাইল দক্ষিণে সরছে উত্তর মেরু। কিন্তু গত কয়েক বছর হলো গতি বেড়ে হয়েছে বছরে বিশ মাইল।'

কমপিউটারের মনিটরে ক্লিক দিতেই এল অন্য গ্রাফ। দেখা গেল গত তিন হাজার বছরের তৈরি ফিল্ড স্ট্রেংথ্।

'দেখছেন কীভাবে হাই-পয়েন্ট থেকে দু'হাজার বছর আগে কমে গেছে ফিল্ড স্ট্রেংথ্? কিন্তু গত বছর চূড়া থেকে নেমে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড কমে গেছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট। উনিশ শ' আট সালের পর থেকে অর্ধেক হয়েছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড।'

উনিশ শ' আট সাল ঘুরছে ব্রায়ানের মগজে। কিন্তু যথেষ্ট তথ্য নেই যে কিছু বলবেন।

এবার স্ক্রিনে দেখা দিল আঁকাবাঁকা রেখা।

টাইম ফ্রেম বর্তমানের।

'দেখুন গত তিন বছরের ফিল্ড স্ট্রেংথ্।'

চেয়ে রইলেন ব্রায়ান। দু'বার পতন হয়েছে গ্রাফে। ওপরে উঠেছে দু'বার। চট্ করে এনআরআই চিফ বুঝলেন, কী বোঝাতে চাইছে সিআইএর বিজ্ঞানী।

ব্রাযিল স্টোন এ দেশে আনার সময় গ্রাফে উঠেছে রেখা দু'বার। আবার পতন হয়েছে দু'বার। শেষের আগেরটা গত নভেম্বরের আর্কটিক সাগরের বিচ্ছুরণ। এরপর চার্টের শেষাংশে আরেকটা। তখন মেক্সিকো সাগরের মন্দির থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল দ্বিতীয় স্ফটিক। তাতে হঠাৎ করে কমে গেছে পঞ্চাশভাগ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। গত পঞ্চাশ হাজার বছরের ভেতর ঘটেনি এমন কাণ্ড।

ডেটায় ভুল না থাকলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দুর্বলতার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এসব স্ফটিকের, ভাবলেন ব্রায়ান।

প্রেসিডেন্ট খেয়াল করেছেন তা নিশ্চিত হতে বললেন সিআইএর বিজ্ঞানী হ্যাগার্ড, 'দেখেছেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,

কীভাবে কমে গেছে ফিল্ড স্ট্রেংথ্? আমরা ধারণা করছি: এনআরআই ব্রাযিল ও মেক্সিকো থেকে স্ফটিক সরিয়ে নেয়ায় এমনটি হয়েছে। গত পাঁচ মাসে এক শ' চল্লিশ মাইল দক্ষিণে সরে গেছে ম্যাগনেটিক নর্থ। বাইশ নভেম্বরের পর গেছে কমপক্ষে নব্বুই মাইল দূরে।'

চুপ করে আছেন এনআরআই চিফ ব্রায়ান।

লাইম লাইটে আসতে চাইলেন সিআইএ চিফ ক্যালাগু। 'অর্থাৎ, এককথায় বললে: ঠিকই ধরেছে এনআরআই। অজানা এক উপায়ে কণ্ডেটের মত ম্যাগনেটিক ফিল্ড খেয়ে ফেলছে এসব স্ফটিক। চোখের সামনে সর্বনাশ হতে দেখছি আমরা। একটা করে স্ফটিক আবিষ্কার করছে মিস্টার ব্রায়ানের টিম, আর দশ কদম করে নরকের দিকে হাঁটছি আমরা মানবজাতি।'

থমথম করছে প্রেসিডেন্টের মুখ। তিনি কিছু বলার আগেই আবারও শুরু করলেন ক্যালাগু, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ধারণা করছি সমস্ত এনার্জি শুষে নিচ্ছে এসব স্ফটিক। এবং যখন মারাত্মক বিচ্ছুরণ হবে, হয়তো ধ্বংস হবে মানব সভ্যতা। ইলেকট্রনিক কোনও কিছুই কাজ করবে না। ফিরতে হবে আদিম যুগে।'

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্রায়ানের। সিআইএ এমন সব তথ্য দিয়েছে, যেগুলো পাননি তিনি। এককথায়, তাঁকে অপদার্থ প্রমাণ করছেন ক্যালাগু।

'বুঝলাম,' বললেন প্রেসিডেন্ট, 'কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্বাভাবিক রাখতে কী করতে হবে? আগেও তো এমন হয়েছে। নিশ্চয়ই ডাইনোসরের মত নিশ্চিহ্ন হব না আমরা?' এনআরআই চিফের দিকে তাকালেন তিনি। 'ব্রায়ান?'

'স্যর, ডাইনোসরের আমল আর আমাদের বর্তমান সময়কে মেলালে চলবে না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন এনআরআই চিফ। 'আমাদের সভ্যতা নির্ভর করছে ইলেকট্রনিক শক্তির ওপর। তা

ছাড়া, ম্যাগনেটিক ফিল্ড উবে গেলেই বইবে সোলার উইণ্ড।'

'তার ফলে কী হবে?'

'ছুটে আসবে বিলিয়ন বিলিয়ন চার্জড্ পার্টিকল। ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে মানুষের টিশুর। নষ্ট হবে ইলেকট্রিকাল গ্রিড, কমপিউটার, প্রোসেসর বা আধুনিক প্রতিটি সার্কিট। হলিউডের সিনেমার দৃশ্যের মত পৃথিবী গলে না গেলেও ঘটবে মারাত্মক সোলার ফ্লেয়ার, বা করোনাল ম্যাস ইজেকশন। মিস্টার ক্যালাগুর কথা ঠিক, সেক্ষেত্রে আমরা আবারও ফিরব আঠারো শতকের জীবনে।'

চুপ করে মনের ভেতর কথাগুলো নেড়েচেড়ে দেখছেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু হঠাৎ ডুবতে থাকা লোকের মত তীরের খোঁজ পেলেন। 'ব্রায়ান, তুমি বলেছ, প্রাচীন কোনও সভ্যতার তৈরি এসব স্ফটিক। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড বিনষ্ট হওয়া ঠেকিয়ে দেবে।'

'ইয়েস, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বললেন ব্রায়ান, 'ডেটা অনুযায়ী ওগুলোর কাজ পৃথিবী রক্ষা করা।'

ভুরু কুঁচকে ফেললেন ক্যালাগু। 'এত কিছু হওয়ার পর পাগলের মত এসব কী বলছেন! পৃথিবী রক্ষা করবে? এখন তো দেখছি ধ্বংস করতে চাইছে!'

ছাপা কাগজ দেখালেন তিনি। 'আমার সিআইএর লোকের অনুবাদ অনুযায়ী: যারা শিক্ষা নেবে না, তাদেরকে শাস্তি দেয়াই উচিত। লড়াই হবে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির মানুষের। ফসল ফলবে না। সাগরের মত বইবে মানুষের রক্ত। ছেঁকে ধরবে ভয়ঙ্কর সব অসুখ। পাইকারি হারে মরবে মানুষ। চলবে লড়াই শত বছর ধরে। আর এসব ঠেকাতে হলে দিতে হবে মানুষের জীবন। উৎসর্গ করতে হবে তার সব।'

কাগজটা টেবিলে রাখলেন ক্যালাগু। 'যুদ্ধে মরবে লক্ষ লক্ষ মানুষ। অসুখে বিলিয়ন বিলিয়ন। না খেয়ে মরবে বেশিরভাগ

মানুষ। ব্রায়ান, এসব স্ফটিক আসলে প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র, আমাদের চেনা পৃথিবী ধ্বংস করতে রেখে গেছে অচেনা মায়ান জাতি।'

'আপনার কথার কোনও যুক্তি নেই,' ফুঁসে উঠলেন ব্রায়ান। 'পেয়েছেন কোনও প্রমাণ?'

তপ্ত তেলে পড়া বেগুনের মত ফোঁস করে উঠলেন সিআইএ চিফ, 'এত কাজেরই যদি হবে, তো লুকিয়ে রেখেছিল কেন? আপনি কি ফার্স্ট-এইড কিট লুকিয়ে রাখবেন? বা ফায়ার এক্সটিংগুইশার? তা করবেন না। আপনি গোপন করবেন লুকানো মাইন, বুবি ট্র্যাপ বা বোমা। উপকারই যদি করবে, তো তুলে দিত আমাদের হাতে! সেসব না করে কেন হাজার হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছে দুর্গম সব মন্দিরের ভেতর?'

এ কথায় নতুন করে শুরু হলো বিতর্ক।

প্রায় ঝগড়ায় নামলেন এনআরআই চিফ ও সিআইএ চিফ।

নানান যুক্তি দেখাতে লাগলেন দুই দলের বিজ্ঞানীরা।

ব্যস্ত আদালতের বিচারকের ভূমিকা নিয়ে সবাইকে শান্ত হতে আহ্বান জানালেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু চেঁচালেন ব্রায়ান, 'ক্যালাগু পাগল হয়ে গেছেন! অতীতের মানুষ কেন ধ্বংস করতে চাইবে আমাদেরকে? আমরা তাদের উত্তরসূরি!'

'নিজেকে চোখ ঠেরে লাভ হবে না, ব্রায়ান,' ধমকে উঠলেন ক্যালাগু। 'মানুষের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি দেশে দেশে যুদ্ধ দূর করে শান্তি বজায় রাখা! এ কাজেই ব্যস্ত সত্যিকারের ভাল মানুষ। আর প্রাচীন আমলে আপনার মায়ানরা চেয়েছে, যেন পরবর্তী সময়ে বেধে যায় দেশে দেশে যুদ্ধ!'

তর্কে হারছেন বুঝে চুপ হয়ে গেলেন ব্রায়ান। তাঁর ইচ্ছে হলো চড়িয়ে বত্রিশ দাঁত ফেলে দেবেন ক্যালাগুর। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমরা আর্নল্ড শোয়ার্যনেগার, এইচ. জি. ওয়েল্স্ বা স্টার

ট্রেকের গল্প বলতে বসিনি। হাজারো বছর আগে সভ্য একটি জাতি চেয়েছে ভবিষ্যতের মানুষকে রক্ষা করতে। সেজন্যে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করে নানান দিকে পৌঁছে দিয়েছে এসব স্ফটিক। এমনি এমনি এত কষ্ট করেনি তারা।'

'ওটা ছিল ওদের সুইসাইডিং মিশন,' টিটকারির সুরে বললেন ক্যালাগু, 'চেয়েছিল পরবর্তী সময়ে দেশে দেশে যুদ্ধ বাধুক।'

'এটা যৌক্তিক হতে পারে না,' প্রতিবাদ করলেন ব্রায়ান।

'অত্যন্ত যৌক্তিক,' জোর দিয়ে বললেন ক্যালাগু, 'অত্যন্ত বিপজ্জনক এসব স্ফটিক ভয়ঙ্কর বোমার মত। অথচ আপনি বা আপনার লোক জানেন না কীভাবে ডিফিউজ করবেন ওগুলোকে। এদিকে নাচতে লেগেছেন: আমরা দারুণ জিনিস পেয়েছি! আরে, আপনারা তো এটাও ভেবেও দেখেননি কোটি কোটি মানুষ যে-কোনও সময়ে খুন হতে পারে!'

প্রেসিডেন্টের দিকে চেয়ে ব্রায়ান বুঝে গেলেন, উনি ভাবছেন, যুক্তিতে হেরে গেছেন এনআরআই চিফ।

ভীষণ রাগ হলো ব্রায়ানের। কিছুই করতে পারছেন না!

সবাই ভাবছেন: না জেনেবুঝে মস্ত এক প্রজেক্টে হাত দিয়ে সব গুবলেট করে দিয়েছেন তিনি।

এনআরআই-এর বিজ্ঞানীদের দিকে চাইলেন তিনি, অসহায়। আরেকবার দেখলেন প্রেসিডেন্টকে। তারপর তাঁর চোখ পড়ল বিজ্ঞানী ক্যাথিবা আলিহার ওপর।

একটা কথাও না বলে এতক্ষণ দর্শকের মত চুপ থেকেছেন রেড ইণ্ডিয়ান বিজ্ঞানী।

'আপনি কিছু বলুন?' মরিয়া হয়ে বললেন ব্রায়ান। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট আপনাকে পাঠিয়েছেন মতামত দিতে। আপনারই তো জানার কথা, কোন্ পক্ষ ঠিক বলছে আর কোন্ পক্ষ অন্যায্য। মুখটা অন্তত খুলুন!'

বলে ফেলে ব্রায়ান বুঝলেন, এতক্ষণের খেলার রেফারিকে আক্রমণ করে বসেছেন তিনি। কিন্তু এ ছাড়া কীই বা করতেন? ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, জ্বলছে খুলির মধ্যে মগজ। যখন-তখন পাগল হয়ে যেতে পারেন!

কৌতূহল নিয়ে ব্রায়ানকে দেখলেন বিজ্ঞানী ক্যাথিবা আলিহা। নীরব হয়ে গেছে ঘরের সবাই। হোয়াইট হাউসে স্ট্যাটিকের আওয়াজ। অপেক্ষা করছেন প্রেসিডেন্ট। আলিহা বুঝে গেলেন, তিনি আছেন স্পট লাইটে। আরেক চুমুক আঙুরের রস দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনারা চান আমি কিছু বলি।' কণ্ঠ তাঁর দূর থেকে আসা মেঘের গম্ভীর ডাকের মত। 'আপনারা বাচ্চাদের মত চেঁচামেচি না করলে, বেশ, বলব আমার মতামত।'

কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। 'আমার মনে হয়েছে, মিস্টার ব্রায়ান ভুল ভাবছেন।'

ব্রায়ান ভাবলেন, তিনি গলা উঁচিয়ে কথা বলেছিলেন বলে খেপে গিয়ে বিপক্ষে চলে গেছেন আলিহা। কণ্ঠ সংযত করে বললেন, 'তাই? এর বাইরে আর কিছুই বলার নেই আপনার?'

'না, আরও কথা আছে,' বললেন রেড ইণ্ডিয়ান বিজ্ঞানী, 'মিস্টার ক্যালাগুও ভুল ভাবছেন। আপনারা দু'জন নেমেছেন সার্কাসে। কিন্তু চেঁচিয়ে কোনও কিছুই সমাধান করা যায় না। এত হৈ-চৈ করলে মগজ চলে না। আপনারা সময় নষ্ট করছেন অন্য দিকে মনোযোগ দিয়ে।'

ক্যাথিবা আলিহার দিকে চেয়ে আছেন ব্রায়ান।

কঠোর চোখে বিজ্ঞানীকে দেখছেন ক্যালাগু।

কাউকে পাত্তা দিলেন না রেড ইণ্ডিয়ান। 'আমার ধারণা: বুঝতে পেরেছি ঠিক কোথায় ভুল করেছেন আপনারা।'

'কোথায় ভুল করেছি?' তেড়া সুরে বললেন ক্যালাগু।

'আপনারা ভুলে গেছেন অতীতের মানুষ কী লিখে গেছেন।'

চুপ করে আছে সবাই।

কাঁধ ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী আলিহা। 'কারণ এবং তার প্রভাব গুলিয়ে ফেলেছেন আপনারা। হাজার বছর আগে যখন অতীতের মানুষ সিদ্ধান্ত নিলেন, কী কারণে কী করতে হবে, সব ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁরা এমনি এমনি নির্দিষ্ট সব জায়গায় স্ফটিক রাখেননি। আপনারা বাচ্চাদের মত ওগুলো নিয়ে খেলতে চাইবেন, সেটা তাঁদের ইচ্ছে ছিল না।'

সবার ওপর চোখ বোলালেন আলিহা। 'মানুষই তৈরি করে খারাপ দৃষ্টান্ত, এবং তা-ই করবে ধরে নিয়েই কাজে নেমেছেন প্রাচীন মায়ারা। যুদ্ধে জড়িয়ে নিজেদের সর্বনাশ করলে, সে দায় আমাদের। সেজন্যে দোষ পড়বে কেন এসব স্ফটিকের ওপর? আবার পৃথিবীকে স্বর্গ করে নিলে, সে-কৃতিত্বও আমাদের।'

'তার মানে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক রাখার বিষয়ে তেমন কিছুই করার নেই?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'তা বলছি না,' বললেন বিজ্ঞানী, 'বহু কিছুই করার আছে। এ পরিস্থিতি হবে ভেবেই অতীতে তৈরি করেছেন মায়ারা ওসব স্ফটিক। অদ্ভুত মেশিনও বলতে পারেন। এখন মানবজাতিকে ধ্বংস করবে, না রক্ষা করবে, সেটা অন্য প্রসঙ্গ।'

বড় করে দম নিলেন এনআরআই চিফ ব্রায়ান।

বিজ্ঞানীর কথা শুনে থমকে গেছেন সিআইএ চিফ ক্যালাগু।

'কিন্তু আপনার কথা থেকে তো কিছুই স্পষ্ট হলো না,' বললেন ব্রায়ান। 'আপনি তৈরি করেছেন মস্ত এক বৃত্ত।'

'জানি,' মাথা দুলিয়ে আঙুরের রসে চুমুক দিলেন আলিহা। 'এ কারণেই নিজের চিন্তা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলাম।'

একচল্লিশ

চার্চের বেঞ্চির হাতল ডানহাতে ধরে নিজেকে সামলে নিতে চাইলেন প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন। বনবন করে ঘুরছে মাথা। ভেবে পেলেন না অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন, না দুলছে মাটি।

'কী যেন বলছিলেন?' ফাদার ভাসকুয়েজকে বললেন তিনি।

সামনে বেড়ে বয়স্ক আর্কিওলজিস্টের কাঁধে হাত রাখলেন ফাদার। 'আপনি তো জানেন, মায়ান চিলাম বালামে কী লেখা। সেই অনুযায়ী: এ মাসের বাইশ তারিখে হয়তো ধ্বংস হতে শুরু করবে পৃথিবীর মানবজাতি।'

'আগেও নানান ধর্মের লোক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে: এবার শেষ হবে পৃথিবী, কিন্তু কিছুই হয়নি,' বলল মিতা।

'এবারের ব্যাপারটা আলাদা,' বললেন ফাদার।

'কোন্ দিক থেকে?' জানতে চাইল রানা।

'কারণ আপনারা এনেছেন অস্ত্র,' বললেন ভাসকুয়েজ।

'আমরা মাত্র কয়েকটা অস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে দেব মানব সভ্যতা?' মৃদু হাসল রানা।

গম্ভীর চোখে ওকে দেখলেন ফাদার ভাসকুয়েজ। 'না। অন্য কিছু এনেছেন। হারিয়ে যাওয়া পাহাড়ি জাগুয়ার রাজার মন্দিরে ওই স্ফটিক রাখতে চান আপনারা। উচিত ছিল না আগের জায়গা থেকে ওটা সরিয়ে ফেলা।'

'স্ফটিক সরিয়ে নিয়েছি গবেষণার জন্যে,' বলল মিতা।

'সেটা না করলেই ভাল হতো,' বললেন ফাদার ভাসকুয়েজ। 'আপনাদের একটা জিনিস দেখাব। ওটা থেকে অনেক কিছুই বুঝবেন।' ঘুরে ছোট একটা দরজার দিকে চললেন তিনি। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

বেদি পাশ কাটিয়ে ফাদারের পিছু নিয়ে সরু এক দরজা পেরোল ওরা। করিডোরের সামনেই পড়ল আরেকটা দরজা। এটা মজবুত। ঝুলছে আধুনিক প্যাডলক। তালা খুলে কড়ায় ওটা ঝুলিয়ে রাখলেন ফাদার। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজে খুললেন দরজা। পাঁচ ফুট যেতেই সামনে পড়ল নিচে যাওয়ার কাঠের সিঁড়ি।

ফাদার ইশারা করতে প্রফেসরকে দু'পাশ থেকে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল রানা ও মিতা। পিছু নিয়েছেন ফাদার। নিচে নেমে রানা দেখল, এটা বড়সড় ওয়াইন সেলার। ইঁট ও কাদার চার দেয়ালের পাশে বিশাল সব ওক কাঠের পিপে।

'আগে মিশনের দুর্গ ছিল এটা,' বললেন ফাদার ভাসকুয়েজ। 'পরে গোটা মেক্সিকো জয়ের পর এটাকে ব্যবহার করা হলো মঠ হিসেবে। উর্বর জমিতে ফলানো হলো আঙুর। ওই জিনিস দিয়ে ওয়াইন তৈরি করলেন সাধুরা। আজ রাতে যে অনুষ্ঠান হবে, তার জন্যে সমস্ত ওয়াইন সরবরাহ করা হবে এই সেলার থেকেই।'

এক পাশের মস্ত এক পিপের কাছে থামলেন ফাদার। তাক থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে চাড় দিয়ে খুললেন পিপের ঢাকনি। 'এই পিপের ওয়াইন সেরা।'

ঢাকনি সরিয়ে ওটার ভেতরের দিক থেকে চ্যাপ্টা এক বাক্স নিলেন ভাসকুয়েজ। পাশে থেকে পড়লেন প্রফেসর: 'ষোলো শ' আটানব্বুই সাল।'

'কোটি ডলারের ভিণ্টেজ,' বলল রানা।

'খুব রেয়ার,' মাথা দোলালেন ফাদার ভাসকুয়েজ। 'এর

মত দামি ও দুর্লভ ওয়াইন আর নেই।' রোযউড বাক্স থেকে নিলেন ছোট এক তোয়ালে। ওটার ভাঁজ খুলতেই বেরোল প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখা পাতলা ফায়ারপ্রুফ নোমেক্স ফ্যাব্রিক। সেটা খুলে সিল্কের বর্ডার দেয়া শুকনো, প্রাচীন পার্চমেন্ট নিলেন ভাসকুয়েজ। পাশের ছোট্ট টেবিলে সাবধানে রাখলেন গাছের পাতলা বাকল দিয়ে তৈরি জিনিসটা। প্রথম পাতার ওপরের অর্ধেকাংশ হলদেটে কাগজের মত। নীল কালিতে লেখা প্রাচীন স্প্যানিশ বক্তব্য। নিচে একের পর এক মায়ান হায়ারোগ্লিফ সিম্বল।

'জিনিসটা কী?' জানতে চাইলেন প্রফেসর হ্যারিসন।

মৃদু হাসলেন ফাদার ভাসকুয়েজ। 'সে আমলে খুবই নিষ্ঠুর ছিল চার্চের ভূমিকা। এই দেশ বিজয়ী স্প্যানিশ কনকুইস্টেডোরা এ এলাকায় এলে তাদের পিছু নিল চার্চ। কর্টেয এবং তার লোক যা ডাকাতি করেনি, বা পুড়িয়ে দেয়নি, সেসবই ধ্বংস করল যাজকরা। তাদের নির্দেশে খুন হয়ে গেল প্রভাবশালী ইণ্ডিয়ানরা। নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো তাদের সংস্কৃতি। প্রায় মূর্খ সব যাজকের আদেশে প্রকাণ্ড সব আগুন জ্বেলে হাজারো বছরের মায়ানদের অর্জিত জ্ঞানের লাখো বই ছাই করে দিল সৈনিকরা। যদি পারত, ভারী পাথরের মনুমেণ্টও সাগরে ফেলত স্প্যানিশ দখলদাররা।'

আফসোস নিয়ে মাথা দোলালেন প্রফেসর হ্যারিসন। 'শেষে থাকল মাত্র কয়েকটা মায়ান বই। এখন যেগুলোকে আমরা বলি কোডেক্স।'

'সে আমলের যাজকরা যে মহাপাপ করেছে, সেজন্যে স্রষ্টার কাছে চরম শাস্তি পেতে হবে তাদেরকে,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফাদার ভাসকুয়েজ।

পার্চমেন্ট কয়েক পাতার, তা দেখে জানতে চাইলেন হ্যারিসন, 'কিন্তু এই কোডেক্স রয়ে গেল কী করে?'

'বেশিরভাগ যাজকের লজ্জাজনক আচরণ ভাল লাগেনি এক হৃদয়বান মিশনারি যাজকের। তাঁর নাম ছিল ফারেন ডি সিলভা। সবার আগে এসেছিলেন এই এলাকায়। দেখলেন খ্রিস্টান ধর্মের যাজকদের ছাড়াই ভাল আছে এদিকের মানুষ। তাদেরকে মস্ত বিপদে ফেলতে মন চাইল না সিলভার। মিথ্যা রিপোর্ট পাঠালেন বিশপের কাছে। হাজারো কোটি মশা ভরা জলাভূমি ও অনুর্বর জমি এতই জঘন্য, এই নরকে এলে বেশুমার মরবে স্প্যানিশ যোদ্ধা ও যাজকরা।'

'এই কোডেক্স কোথায় পান ফারেন ডি সিলভা?' জানতে চাইলেন প্রফেসর হ্যারিসন।

'উনি পাননি,' মাথা নাড়লেন ফাদার। 'গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটা মৃত্যুর আগে ডেকে নিলেন সিলভাকে। বললেন, আগে কয়েকটি গ্রামে ছিলেন তিনি, কিন্তু অন্য সবার সঙ্গে পালাতে হয়েছিল পাহাড়ে। খুন হয়েছে তাঁদের ব্রাদারহুডের প্রায় সবাই, রয়ে গেছেন শুধু তিনি। চলে এলেন এ গ্রামে। তারপর যখন এখানে হাজির হলেন সিলভা, নতুন শাসকদের মধ্যে শুধু তাঁকে ভাল মানুষ বলে মনে হয়েছে তাঁর। কথা দিলেন, গ্রামের সবাইকে বলে দেবেন, তারা যেন গ্রহণ করে যিশুর ধর্ম। তবে আছে একটা শর্ত। সিলভা রক্ষা করবেন তাঁদের শেষ লিখিত মায়ান ইতিহাসের বইটি।'

'আর এই কোডেক্সেই আছে সেসব হায়ারোগ্লিফ,' বললেন হ্যারিসন।

মাথা দোলালেন ফাদার ভাসকুয়েজ। 'ধর্ম বদল বলতে কী জানেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন সিলভা। ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধ বলেছিলেন, আমরা জানি, বলি দেয়া বা রক্তক্ষরণের কারণে এক সময়ে এতই পাপ হবে, পচে দুর্গন্ধ বেরোবে আমাদের ধর্ম থেকে। তাই উচিত যিশুর পবিত্র পথে হাঁটতে শুরু করা।' একটু চুপ থেকে আবার বললেন ফাদার, 'আসলে নির্মম সব রাজা বা

লোভী পুরোহিতদের বলি বা রক্তক্ষরণের জন্যে চরম বিরক্তি ছিল সাধারণ মানুষের মনে। কাজেই তারা যখন দেখল চার্চ এসব করছে না, অনেকেই আগ্রহ নিয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।'

'তা হলে ধর্মান্তরিত হয়েছিল মায়ান ব্রাদারহুডের ওই ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধ, সঙ্গে গ্রামের সবাই,' আন্দাজ করল মিতা। 'ফাদার সিলভার হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল শেষ পার্চমেণ্ট।'

'সিলভা কথা দিয়েছিলেন, প্রাণ থাকতে নষ্ট হতে দেবেন না ওটা,' বললেন ভাসকুয়েজ, 'ওটার লেখা স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করেন।' এবার গড়গড় করে বলে গেলেন তিনি: 'তারা হবে দলে চারজন। আসবে এক বয়স্ক কালো লোক, এক রূপসী যুবতী, এক ছোট্ট বাচ্চা আর পবিত্র হৃদয়ের বাদামি রঙের এক নিষ্ঠুর চেহারার লোক। বাদামি লোকটাই সিদ্ধান্ত নেবে রক্ষা পাবে কি না এই গোটা পৃথিবী।'

ফাদার ভাসকুয়েজের কথা শুনে অবাক চোখে রানার দিকে তাকালেন প্রফেসর হ্যারিসন।

যথেষ্ট ভাল স্প্যানিশ জানে মিতা, কাজেই বিস্মিত।

রানার বাহুতে হাত রাখলেন ফাদার ভাসকুয়েজ। 'কাজেই, রানা, আশা করি বুঝতে পারছেন, আপনার ওপর বর্তে গেছে খুব কঠিন কাজ। হয়তো সফল হবেন, অথবা অসফল। তবে মনে রাখবেন, আপনার একার ওপর নির্ভর করবে মানবজাতির গোটা ভবিষ্যৎ। সুতরাং, যা করার করবেন খুব ভেবেচিন্তে।'

গম্ভীর চোখে যাজককে দেখছে নীরব রানা।

অবিশ্বাস্যভাবে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মিলে গেছে প্রাচীন পার্চমেণ্টের লেখা।

'এটা কাকতালীয় হতে পারে না?' বলল মিতা।

'কাকতালীয় মনে হয় না।' মৃদু হাসলেন ফাদার ভাসকুয়েজ। 'আগেও পড়েছি কোডেক্সের অনুবাদ করা অংশ। ধারণা করেছি, ওটাতে মিথ্যা লিখেছে মায়ানরা। কিন্তু সে ভুল

ভেঙেছে আমার। ভুললে চলবে না, কোডেক্স লেখা হয়েছে হাজারো বছর আগে। যে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে চারজনের, তা আঁৎকে ওঠার মতই।'

পার্চমেন্ট থেকে অনূদিত স্প্যানিশ ভাষার অংশ পড়ে নিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল রানা।

প্রায় অন্ধকার সেলারে মায়ান হায়ারোগ্লিফ পড়তে লাগলেন প্রফেসর হ্যারিসন। চকচক করছে চোখ। বিড়বিড় করলেন, 'তা হলে সত্যি? নিয়তি এনেছে আমাদেরকে এখানে শেষ স্ফটিকের কাছে?'

বাস্তবে নিয়তি বলে কিছু আছে? ভাবছে রানা। নিজ চোখে দেখেছে ধর্ম বা স্রষ্টার নামে অবলীলায় কত ভয়ঙ্কর পৈশাচিক কাজ করে আপাতনিরীহ মানুষ। অনেকেই তারা শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষ। নানান স্বার্থের জন্যে দেরি হয় না তাদের পাগলা কুকুরের মত অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে।

নীরবে ওকে দেখছে মিতা, চোখে অনুরোধ।

একবার ওকে দেখে নিয়ে ফাদারের দিকে ফিরল রানা। 'আপনি পুরো কোডেক্সের স্প্যানিশ অনুবাদ পেয়েছেন? জানেন কীভাবে রক্ষা করতে হবে মানবসভ্যতা?'

'না, জানি না, তবে ধৈর্য ধরুন,' বললেন ফাদার ভাসকুয়েজ। 'স্রষ্টা ভালবাসেন ধৈর্যশীলদের।'

বিয়াল্লিশ

স্যাটেলাইট ফোনের কল রিসিভ করতেই এনআরআই চিফ

জেমস ব্রায়ানের দুশ্চিন্তা ভরা আংশিক বিকৃত কণ্ঠ শুনল রানা। ওর পাশেই আছে মিতা। যাতে শুনতে পায়, তাই স্পিকার চালু করল রানা।

‘মিস্টার রানা, একটু আগে সিআইএ চিফ মিস্টার ক্যালাগু আর আমার এক লোকের মাধ্যমে পেলাম পাবলো সম্বন্ধে নতুন তথ্য। যে এসব জানাল, সে রাশান সায়েন্স ডিরেক্টোরেটের উঁচু পদে আছে। এসব ইনফর্মেশন মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।’

‘বলুন,’ বলল রানা। কু ডাকছে ওর মন।

‘ফোনের ডেটা স্ক্রিনে পাঠিয়ে দেব সব ইনফর্মেশন। তবে সংক্ষেপে বলছিঃ চের্নোবিলের রেডিয়েশন আক্রান্ত এলাকায় জন্ম নিয়েছিল পাবলো। জেনারেটিভ নার্ভ ডিযিয আছে বলে দু'চার দিনের ভেতর ওর বাবা-মা বুঝে যান, অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারবেন না ছেলের। পাবলো মরে যাবে বুঝে যোগাযোগ করলেন তাঁরা সায়েন্স ডিরেক্টোরেট-এ। বিজ্ঞানীরা নিয়ে গেল ওকে। এরপর কী ধরনের গবেষণা করা হয়েছে, তা অজানা। সাধারণত এ ধরনের রোগে প্রথমে শুরু হয় দেহ জুড়ে কম্পন। দ্বিতীয় স্টেজে মানুষ হারিয়ে ফেলে চেতনা। তৃতীয় স্টেজে নষ্ট হয় রোগীর মোটর কন্ট্রোল। চতুর্থ স্টেজে খিঁচ ধরে বন্ধ হয় হৃৎপিণ্ডের পেশি। ফলাফল আকস্মিক মৃত্যু।’

‘পাবলো কোন্ স্টেজে আছে?’ জানতে চাইল রানা।

‘ওর বয়স পাঁচ বছর। পেরিয়ে যাওয়ার কথা স্টেজ থ্রি। বাঁচবে বড়জোর আর পাঁচ বছর।’

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মিতা। বেসুরো কণ্ঠে জানতে চাইল, ‘ভুল হচ্ছে না তো? আমি তো ওর ভেতর কোনও সিম্পটম দেখছি না। হয়তো ভুল হয়েছে ডাক্তারদের?’

‘কোনও ভুল হয়নি, আমি দুঃখিত, মিতা,’ নরম সুরে বললেন এনআরআই চিফ। ‘পাবলো বেঁচে আছে কারণ, অস্বাভাবিক চিকিৎসা করেছে রাশান বিজ্ঞানীরা। তাতে দেখা

গেছে ইলেকট্রো-স্টিমুলেশন দিয়ে নার্ভের তন্তু, মেরুদণ্ড বা সেরেব্রাল কর্টেক্সের রোগের আক্রমণ অনেক ধীর করে দেয়া যায়।'

'পাবলোর কর্টেক্সে একটা জিনিস আছে,' বলল মিতা। 'ওটা রাশানদের প্ল্যান্ট করা।'

'এক্সপেরিমেন্ট,' বললেন ব্রায়ান, 'ওটার কারণেই পাবলো টের পায় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ডিস্টার্বেন্স।'

বাচ্চা ছেলেটার ওপর রাশানরা নিষ্ঠুর গবেষণা করেছে ভেবে আগে রাগ ছিল মিতার মনে, এখন বুঝে গেল, এ ছাড়া উপায় ছিল না ওকে বাঁচানোর। 'পরীক্ষা সফল, অন্তত দৈহিকভাবে সুস্থ আছে পাবলো।'

'তাতে তেমন খুশি হওয়ার কিছু নেই।'

'কেন?'

'কারণ, আধুনিক কোনও ডিভাইস নয় ওর মগজের জিনিস। ওটা রাশানদের খুঁজে পাওয়া স্ফটিকের অংশ। পঞ্চাশ দশকে পেয়েছিল রাশান সায়েন্স ডিরেক্টোরেট।'

বিস্মিত হয়ে রানার দিকে তাকাল মিতা। 'কী জিনিস?'

চুপ করে শুনছে রানা।

'ব্রাযিল স্টোনের মতই আরেকটা ছিল রাশায়,' তিক্ত স্বরে বললেন ব্রায়ান, 'আগের মিটিঙে বেকুব করেছে আমাকে সিআইএ চিফ ক্যালাগু। তাদের বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করেছে, এসব স্ফটিকের কারণে অনেক হ্রাস পেয়েছে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আমরা প্রতিবার একটা করে ওই স্ফটিক পেয়ে সরিয়ে নিলেই সরে যাচ্ছে উত্তর মেরুর ম্যাগনেটিক পোল।'

হঠাৎ রানার মনে পড়ল হংকং-এ মিতাকে কারাগার থেকে উদ্ধারের পর ওর কাছে শুনেছিল, কী হয়েছিল দিমিতভের ট্রলারে। পথ হারিয়ে ফেলে লোকটা। আগে থেকেই নষ্ট

হয়েছিল জিপিএস, তাই চৌম্বক কমপাস দেখে পথ চলছিল। কিন্তু দক্ষিণের বদলে চলে গেল উত্তর মেরুর দিকে। কিছুই টের পায়নি। অনুসরণ করছিল হাঙর ও কিলার ওয়েইল। এখন রানা বুঝতে পারছে এর কারণ। পাবলোর মগজের স্ফটিক থেকেই ছোট বিচ্ছুরণ ঘটেছিল বেয়ারিং সাগরে নভেম্বর মাসের বাইশ তারিখে।

'একইভাবে উনিশ শ' আট সালে হ্রাস পায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড,' বললেন ব্রায়ান, 'এটা বুঝতে সময় লেগেছে আমার।'

'অত আগে স্ফটিক পেয়ে গিয়েছিল রাশানরা?' জানতে চাইল মিতা।

'না, পায়নি,' বললেন এনআরআই চিফ, 'যে কারণেই হোক, রাশায় ওই বছরের জুন মাসে বিস্ফোরিত হয়েছিল ওই স্ফটিক।'

জুন মাস, উনিশ শ' আট সাল, ভাবছে রানা। নিচু স্বরে বলল, 'দ্য তুঙগুসকা ব্লাস্ট।'

'জানেন আপনি ওই ঘটনা সম্বন্ধে?'

'সামান্য,' বলল রানা। 'উনিশ শ' আট সালের জুনের গোটা রাশার তুন্দ্রা এলাকা কেঁপে গিয়েছিল ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণে। তিন শ' মাইল দূর থেকেও দেখা গিয়েছিল আকাশে আগুন। ওই শক ওয়েভে বিশ মাইল বৃত্তের ভেতর পুড়ে যায় সব গাছ। অনেকে ভেবেছে, ছোট কোনও গ্রহানুর জন্যে হয়েছিল ওই বিস্ফোরণ। ওটার অবশিষ্ট অংশ খুঁজতে গিয়েছিল অভিযাত্রীরা। পাওয়া যায়নি কিছুই। বইয়ে পড়েছি, ওই বিস্ফোরণ ছিল ত্রিশ মেগাটন আণবিক বোমা ফাটার মতই প্রচণ্ড।'

'রাশানদের হিসেব অনুযায়ী ওই বিস্ফোরণ ছিল পঞ্চাশ মেগাটন আণবিক বোমার সমান,' বললেন ব্রায়ান, 'হিরোশিমার ওই বোমার চেয়ে দু'হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী।'

'আপনি বলছেন ওটা ছিল এসব স্ফটিকের একটা?' অবাক হয়ে গেছে মিতা।

'এ ছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা তো পাওয়া যায় না,' বললেন ব্রায়ান। 'ওই একইসময়ে কমে যায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড। পরে ওই এলাকায় পাওয়া যায়নি গভীর কোনও গর্ত। কোথাও ছিল না রেডিয়েশন। তবে একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছিল রাশানরা।'

'ওই স্ফটিকের একটা টুকরো,' প্রায় ফিসফিস করল মিতা।

'আমাদের কাছে তথ্য আছে, উনিশ শ' সাতান্ন সালে কোল্ড ওঅরের সময় এক্সপিডিশন করে রাশানরা,' বললেন ব্রায়ান। 'তবে কখনও স্বীকার করেনি। সে সময়ের আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে পেয়ে গিয়েছিল ওই জিনিস। হাইলি ডিসটর্টেড ম্যাগনেটিক রিডিং থেকে ধরে নিয়েছিল, তুন্দ্রার ওখানে পড়েছিল উল্কা। কিন্তু সে সময়ে হঠাৎ করেই ম্যাগনেটিক শক্তির কারণে নষ্ট হলো তাদের প্রধান ড্রেজিঙের বোটের সব ইলেকট্রনিক সিস্টেম। নতুন করে মেশিন চালু করার আগেই একটা ম্যাগনেটোমিটার দেখিয়ে দিল ছোট্ট এক টুকরো স্ফটিক।'

'তখন থেকে রাশানরা লুকিয়ে রেখেছে ওই জিনিস,' বলল মিতা।

'সায়েন্স ডিরেক্টোরেটের সেরা জিনিস।'

'ব্যবহার করেছে পাবলোর মগজে,' বলল রানা। 'স্বাভাবিক কারণেই ওকে দেশে ফিরিয়ে নিতে চাইছে এফএসবি।'

'পাবলোকে চায় না, ওদের দরকার ওই স্ফটিকের টুকরো,' বললেন ব্রায়ান, 'গোটা দুনিয়া থেকে গোপন করতে চায় ওই এক্সপেরিমেন্ট।'

'আর এক্সপেরিমেন্ট শেষ হলে?' জানতে চাইল মিতা।

'পাবলোর মগজ থেকে সরিয়ে নেবে স্ফটিকের টুকরো,'

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ব্রায়ান, 'ফলে মারা পড়বে ছেলেটা।'

শিউরে উঠল মিতা।

ওর কাঁধে আলতো করে হাত রাখল রানা, চোখে সহানুভূতি।

'ল্যাং কী করে ওর খোঁজ পেল?' চাপা স্বরে বলল মিতা।

'রাশান সায়েন্স ডিরেক্টোরেটের নরম মনের কয়েকজন ভেবেছিলেন, স্ফটিকের টুকরো পাবলোর মগজ থেকে সরিয়ে নেয়া হবে অমানবিক কাজ। তাঁরাই কিডন্যাপ করে তুলে দেন এক কণ্ট্যাক্টের হাতে। বিক্রি হয়ে গেল পাবলো। কিন্তু তার আগে ল্যাংকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন তাঁরা, যাতে পাবলোর ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করে চাইনিজ বিলিয়নেয়ার। আমার ধারণা, পাবলো হারিয়ে যাওয়ায় এফএসবির হাতে খুন হয়েছেন সেই মানুষগুলো।'

'পাবলোকে কেন চাইল ল্যাং?' জানতে চাইল মিতা।

'কয়েক বছর ধরেই চোখের আড়ালে আছে সে, পাবলোর মত একই রোগে ভুগছে,' বললেন এনআরআই চিফ, 'গুজব ঠিক হলে আর দু'এক বছরের ভেতর মারা পড়বে।'

'সেক্ষেত্রে ল্যাং তো নিজের ডাক্তার দিয়ে পাবলোর মগজের স্ফটিকের টুকরো সরিয়ে ফেলতে পারত,' বলল মিতা।

'ওটা চাই না তার, ভেবেছে পাবলোর মাধ্যমে খুঁজে পাবে আস্ত কোনও স্ফটিক,' বললেন ব্রায়ান। 'তার ধারণা, ওই জিনিস পেলে পুরো আরোগ্য পাবে সে।'

'তার মানে এখন আর চতুর্থ স্ফটিক নেই,' বলল মিতা।

রানা ভাবছে, তা হলে মায়ানদের ওই ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হবে কি না। আরেকটা বিষয়: এসব স্ফটিক রাখা হয়েছিল পৃথিবী রক্ষার জন্যে। সেক্ষেত্রে চারটের বদলে মাত্র তিনটে স্ফটিক কী পারবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড টিকিয়ে রাখতে? কে জানে, সত্যিই হয়তো এসব স্ফটিক প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র। তাদেরটা

বিস্ফোরিত হওয়ায় বেঁচে গেছে আধুনিক রাশা। কিন্তু মধ্য আমেরিকা বা উত্তর আমেরিকার বুকে নেমে আসতে পারে সত্যিকারের প্রলয়।

'একটা কথা, আঙ্কেল ব্রায়ান, এসব স্ফটিক মিশন শেষ করলে তারপর কী হবে ওগুলোর?' জানতে চাইল মিতা।

'জানি না,' সরল স্বীকারোক্তি দিলেন ব্রায়ান, 'মিতা, তুমি তো ফিযিসিস্ট, আমার চেয়ে এসব ভাল বুঝবে।'

'সব শেষে পাবলোর কী হবে?' জানতে চাইল উদ্বিগ্ন মিতা।

'আমাদের ধারণা, এরপরের বিচ্ছুরণ আসছে অনেক বেশি শক্তি নিয়ে,' বললেন ব্রায়ান। 'আগের চেয়ে এক শ' গুণ। বা হাজার গুণ। হয়তো ওটার কারণে মারাত্মক ক্ষতি হবে পাবলোর। কাজেই...'

তাঁর বক্তব্য বুঝে গেছে মিতা। ধরা গলায় এনআরআই চিফের কথাটা শেষ করল ও, 'মরে যাবে ও!'

রানা দেখল, ভিজে গেছে মিতার চোখের কোণ।

চুপ করে থাকলেন এনআরআই চিফ।

পুত্র হারাতে হবে জেনে, স্নেহময়ী মা-র অভিমান উথলে উঠেছে আবেগপ্রবণ মিতার হৃদয়ে। ছলছলে চোখে তাকাল রানার চোখে। নীরবে যেন বলছে: রানা, তুমি না আছ আমাদের পাশে? পারবে না পাবলোকে বাঁচাতে? মরে যেতে হবে কেন অসহায় বাচ্চাটাকে?

'মন শক্ত করো, মিতা,' কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন ব্রায়ান। 'এসব স্ফটিক নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কোনও ভুল হলে মরবে বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ। তাদের ভেতর রয়েছে পাবলোর মত শত কোটি শিশু।'

দূরের সবুজ টিলা থেকে চোখ সরিয়ে কালচে মেঝে দেখল মিতা।

'মিস্টার রানা, প্লিয, ঘড়িতে ঠিক করে নিন কাউণ্টডাউন,'

বললেন ব্রায়ান, 'ট্রিপল যিরোর আগেই আমি যোগাযোগ করলে, দেরি না করে ধ্বংস করে দেবেন ওই দুই স্ফটিক। গভীর কোনও গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দেবেন ওসব গুঁড়ো।'

'বুঝলাম,' জানাল রানা। 'এর পরের কাজ কী?'

'জানি না,' দুর্বল স্বরে বললেন ব্রায়ান, 'সিআইএ মন্দ দৃষ্টিতে দেখছে এসব স্ফটিক। অথচ আমার ধারণা, ওগুলো রক্ষা করবে এই পৃথিবী। তবুও যদি ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে ফোন করি; প্লিয, কোথাও রাখবেন না ওগুলোর কোনও চিহ্ন।'

ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনুরোধ করতে গিয়ে বুকে পাষাণ বেঁধেছেন ভদ্রলোক, বুঝতে পারছে রানা।

'দয়া করে নিজের বিবেক বুঝে কাজ করবেন, মিস্টার রানা,' চাপা কণ্ঠে বললেন এনআরআই চিফ। 'আর, প্লিয, ক্ষতি হতে দেবেন না মিতার। ওর বাবা হিসেবে এটা আপনার কাছে আমার কাতর অনুরোধ।'

রানা দেখল, জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে মিতা।

ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা।

সামনেই ক্রিসমাস, তাই ছুটি চলছে শহরে।

স্যান ইগন্যাসিয়োর বাসিন্দারা বেরোচ্ছে পার্টির জন্যে।

প্রাণভরে ছুটোছুটি করছে দামাল শিশুরা।

রানা বুঝে গেল, পাবলোর কাছে যাওয়ার জন্যে মন কাঁদছে মিতার।

'আমার সাধ্যমত করব,' অন্তর থেকে ব্রায়ানকে বলল রানা।

'কথাটা বলেছেন, সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার রানা,' বললেন ব্রায়ান। 'ভাল থাকুন।'

'আপনিও ভাল থাকুন।'

ফোন কল কেটে দিলেন এনআরআই চিফ।

অসহায় পিচ্চি পাবলোর করুণ পরিণতির কথা ভেবে নীরবে

কাঁদছে উদ্‌ভ্রান্ত মিতা। ভরসা পেতে আকুল হয়ে তাকাল রানার চোখে।

কিন্তু আশ্বাস দেয়ার মত কিছুই খুঁজে পেল না রানা।

তেতাল্লিশ

স্যান ইগন্যাসিয়ো থেকে তিন শ' মাইল দূরে ল্যাং-এর কমাণ্ড সেন্টার। ওয়্যারহাউসে বসে ডেটা প্রসেস করছে বিলিয়নেয়ারের টেকনিশিয়ান। পথে পথে ক্যামেরা হাতে মানুষের ছবি তুলছে ল্যাং-এর কর্মীরা। এরই ভেতর স্ক্যান হয়েছে দু'লাখ মানুষের চেহারা। এখনও পাওয়া যায়নি রানার দলের কাউকে। আকাশে ঘুরছে ল্যাং-এর এরিয়াল ড্রোন। ইনফ্রারেড ক্যামেরা ব্যবহার করে তন্নতন্ন করে খুঁজছে জঙ্গল ও পাহাড়। ব্যবহার করা হচ্ছে ম্যাগনেটোমিটার। আছে বিশেষ একটা রিসেপ্টর, অনায়াসেই ধরবে মেডিকেল গ্রেড রেডিয়োঅ্যাকটিভ মেটারিয়াল।

এর ভেতর জঙ্গলে পাওয়া গেছে কয়েক দল ট্র্যাকারকে। ছিল মিলিটারির ভাঙাচোরা ট্রেনিং বিমান। বহু আগে বিধ্বস্ত হয়েছিল জঙ্গলে। ধারণা করা হচ্ছে, ওই এলাকায় রয়ে গেছে কয়েকটা মায়ান সাইট। কিন্তু দেখা নেই মাসুদ রানা, মিতা দত্ত, পাবলো বা বুড়ো প্রফেসরের।

কমাণ্ড সেন্টারে চুপচাপ যে যার কাজ করছে টেকনিশিয়ানরা।

ওদিকে ক্যামপেচে শহরে বসে ড্রোন নিয়ন্ত্রণ করছে এক পাইলট। টয়লেটে যাবে বলে সিট ছাড়বে, এমনসময় অ্যালার্ম

বাজিয়ে সতর্ক করল তার দুই কমপিউটার। সেন্সর ধরেছে ড্রোনের টেলিমেট্রি। হালকা ওই বিমান পৌঁছে গেছে নিজের রেঞ্জের শেষপ্রান্তে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মিলিয়ে গেল টেলিমেট্রি।

বেদম বেগ চেপে ওদিকের পাহাড়-জঙ্গল আরেকবার ঘুরে আসতে চাইল পাইলট। ভাল করেই জানে, মিলিয়ন ডলারের মেশিন বিধ্বস্ত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে তার বিরুদ্ধে।

একটু পর এল জোরালো সিগনাল।

দেরি না করে নাক-মুখ কুঁচকে ল্যাং-এর অফিসে ফোন করল পাইলট। টেকনিশিয়ান কল রিসিভ করতেই বলল, 'পাঁচ নম্বর ড্রোন থেকে কণ্ট্যাক্ট রিপোর্ট পেয়েছি। এখন দেখব ওদিকের এলাকা।'

ফোন রেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে।

এদিকে ল্যাং-এর ওয়্যারহাউসে টেকনিশিয়ান কোঅর্ডিনেট স্ক্রিনে তুলে দিতেই সেন্সর অ্যানালাইয করল কমপিউটার। তিন সেকেণ্ড পর কনফার্ম করল সিগনাল।

হুয়াং লি ল্যাং-এর দিকে ফিরল টেকনিশিয়ান। 'স্যর, স্যান ইগন্যাসিয়ো। ওরা লুকিয়ে আছে ওই শহরে।'

গেস্ট হাউসের সামনের সিঁড়িতে বসে আছে মাসুদ রানা, দেখছে শহরের প্রধান রাস্তায় ফুর্তি করছে শহরবাসীরা।

বাচ্চাদের জন্যে নাটক লিখে দিয়েছেন ফাদার ভাসকুয়েজ।

একজোড়া কিশোরী ও কিশোর সেজেছে মাতা মেরি ও তাঁর স্বামী জোসেফ। ছেলেটির পরনে নীল আলখেল্লা। পাশেই গাধার পিঠে সাদা-হলদে পোশাকে স্ত্রী মেরি। পিছু পিছু হাঁটছে ছোট বাচ্চারা। তাদের ভেতর পাবলোকেও দেখল রানা।

স্ত্রীকে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরছে কিশোর জোসেফ, ভদ্রতা বজায় রেখে বলছে: 'বলতে পারেন, খালি আছে এই

সরাইখানায় কোনও কামরা?'

এরই ভেতর সব কামরা ভাড়া হয়ে গেছে বলে, মনে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মাথা নাড়ছে সরাইখানার মালিকরা। অবশ্য, কয়েকটা সরাইখানায় ব্যর্থ হয়ে চার্চের একটু দূরের এক দরজায় টোকা দিল জোসেফ।

দরজা খুলে কিশোরী মেরি ও কিশোর জোসেফকে দেখলেন এক মহিলা। ঠোঁটে ফুটে উঠল মিষ্টি হাসি। 'হ্যাঁ, কামরা আছে।'

এই ঘটনায় খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল বাচ্চারা।

নাটক শেষ হতেই শুরু হলো মূল অনুষ্ঠান। নানান বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে সবাইকে মাতিয়ে তুলল শিল্পীরা। পিনাটা নিয়ে হৈ-চৈ শুরু করল বাচ্চারা। সবার জন্যেই আছে খেলনা ও চকলেট। মস্ত কয়েক টেবিল থেকে হাতে হাতে সরবরাহ করা হবে খাবার ও ওয়াইন। ক্রিসমাসের কয়েক দিন আগে থেকেই মেক্সিকোর প্রতিটি শহর ও গ্রামে চলে এসব অনুষ্ঠান।

এই ক'দিন মনে দুঃখ রাখবে না কেউ। দূর থেকে রানাকে দেখে হাসল পাবলো। জবাবে হাত নাড়ল রানা। একটু পর অন্য সাধারণ শিশুর মতই খেলায় মেতে উঠল পাবলো।

এ ধরনের ছোট শহরে আগেও থেকেছে রানা। ওর জানা আছে, এসব জায়গা বাচ্চাদের জন্যে স্বর্গ। বিদ্যুৎ সংযোগ আছে শহরে, পথে পথে জ্বলছে স্বল্প ওয়াটের বাতি। বেশিরভাগ বাড়িতে রেডিয়ো, টিভি বা ফোন নেই, তবে তাতে বয়েই গেছে দরিদ্র কিন্তু সুখী মানুষগুলোর!

ঘনিয়ে আসা বিপদ থেকে অন্যদিকে মন সরিয়ে নিল রানা। সব ঠিক থাকলে, হয়তো এই শহরে কোনও পরিবারে পাবলোকে রেখে যেতে পারবে ওরা। তাতে হয়তো স্বাভাবিক জীবন পাবে ছেলেটা।

রাস্তা পেরিয়ে চার্চে ঢুকে একটু অবাক হলো ও। বেদির

সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিতা। দেখাচ্ছে পবিত্র কোনও অপরূপা দেবীর মত। এইমাত্র উৎসর্গ করেছে মাতা মেরির কাছে জ্বলন্ত মোমবাতি। সাদা-লাল-কালো ফুল তোলা সুতির গাউন পরনে। কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে দীর্ঘ, কালো এলো কেশ।

মিতা সুন্দরী, কিন্তু আগে কখনও এভাবে খেয়াল করেনি রানা। টের পেল, রূপের ওই ঝলক শুকিয়ে দিয়েছে ওর গলা। কী করে এত সুন্দরী হয় কোনও মেয়ে?

খুক-খুক করে কেশে নিয়ে ডাকল রানা, 'মিতা?'

ঘুরে তাকাল মেয়েটা। অদ্ভুত মিষ্টি হাসল। 'মা চলে যাওয়ার পর কখনও কোনও চার্চে ঢুকিনি। আর বাবার মৃত্যুর পর যাওয়া হয়নি কোনও মন্দিরেও।'

'বিশেষ কোনও ধর্মে আস্থা নেই তোমার,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল মিতা। 'ভগবান, গড বা আল্লা যা-ই বলো, তাঁর নানান ভেদ তৈরি করেছে স্বার্থপর একদল মানুষ। আমার মনে হয় না এসবে কিছুই যায় আসে সত্যিকারের স্রষ্টার।'

'অর্থাৎ ডারউইনের থিয়োরি থেকে একতিল সরবে না।'

'ধর্মান্ধ তো নই।'

'অদ্ভুত রূপসী লাগছে তোমাকে,' বলল রানা।

হঠাৎ লাল গোলাপের মত লজ্জায় রক্তিম হলো মিতা। বাইরে পটকা ফাটতেই একটু চমকে গিয়ে তাকাল রানার চোখে। দৃষ্টি নামিয়ে নিল। 'এই পোশাক তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আগে কখনও তোমাকে এভাবে দেখিনি।' মৃদু হাসল রানা। 'চমকে গেছি।'

'পাবলোকে রেখেছে যে মহিলা, তার কাছ থেকে ধার নিয়েছি।'

'একটু আগে দেখলাম পাবলোকে,' বলল রানা। 'মজায় আছে।'

বিষাদের ছাপ পড়ল মিতার চোখে। নিচু স্বরে বলল, 'আপাতত। ওর হয়তো শেষে মরতে হলো না?'

'হয়তো,' কেন যেন নিজের ওপর রাগ হলো রানার। মনে পড়ল, আমাযন জঙ্গল বা সাগরের মন্দিরে বহু নিচে ছিল স্ফটিক। 'নিচের সেলারে রাখব ওকে, আশা করি তাতে কমবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ।'

ওর মনে হলো, যে-কোনও সময়ে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হু-হু করে কাঁদতে শুরু করবে মেয়েটা।

'কোনও আশা নেই ওর,' বিড়বিড় করল মিতা, 'মেনে নিয়েছি নিয়তি।' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল, 'তবে তুমি পাশে থাকলে ভয় থাকে না।'

প্রসঙ্গ পাল্টে নিল রানাঃ 'চলো, দেখে আসি সেলারে কী করছেন প্রফেসর।'

'একটু আগে গিয়েছিলাম,' বলল মিতা, 'হায়ারোগ্লিফ থেকে নতুন কিছু পাননি। ফাদার ভাসকুয়েজ বলেছিলেন, আমাদের কথা লিখে গেছেন মায়ান কোনও জ্ঞানী। কিন্তু তাতে তৃতীয় স্ফটিক পাব না আমরা।'

'আশা করতে দোষ নেই,' বলল রানা, 'তবে এসব স্ফটিকের কারণে তোমার, প্যাবলো বা অন্য কারও ক্ষতি হবে বুঝলে দেরি করব না হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়ো করে দিতে। তারপর যা খুশি হোক।'

নীরবে রানার চোখে চেয়ে রইল মিতা।

চার্চের প্রকাণ্ড ঘরের চারপাশে ঘুরল রানার চোখ। 'এবার বাইরে গিয়ে দেখব ওদের অনুষ্ঠান।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' বলল মিতা।

বাইরের শীতল হাওয়ায় বেরিয়ে এল ওরা।

এক সেকেণ্ডের জন্যে ছোট কোনও বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ পেয়েছে বলে মনে হলো রানার। সতর্ক হয়ে কান পাতল। কিন্তু

কোথাও যান্ত্রিক আওয়াজ নেই। তিন সেকেণ্ড পর রাস্তার মঞ্চে শুরু হলো গান-বাজনা।

মিতার ডানহাত মুঠোয় নিয়ে নাচের মঞ্চ লক্ষ্য করে পা বাড়াল রানা।

চুয়াল্লিশ

গভীর রাত। ইয়াকা মাউন্টেনের গভীর সুড়ঙ্গে রয়ে গেছেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান। বিশেষ একটি প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত তাঁর টেকনিশিয়ানরা। মার্ল ক্যালাগুর সংগৃহীত থিয়োরিই ঠিক। ম্যাগনেটিক ফিল্ড হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে জড়িত রহস্যময় স্ফটিক। তবে ভেরিয়েবলের সব সংখ্যা মিলছে না। রয়ে গেছে কোথায় যেন ত্রুটি।

এনআরআই বিশেষজ্ঞদের ইনপুট বেশ কয়েকবার বদল করেছেন ব্রায়ান। সংখ্যা একটু বেশি দেখাচ্ছে।

আবারও সংখ্যা পাল্টে নিলেন তিনি।

ম্যাগনেটিক ফিল্ড কমে যাওয়ার অঙ্কের সঙ্গে এখনও মিলল না এবারের সব সংখ্যা।

বিরক্ত হয়ে সিমুলেশনের জন্যে রিভার্স অ্যানালাইয করতে নির্দেশ দিলেন ব্রায়ান। সত্যিকারের ডেটা কী হওয়া উচিত, আর কী আছে, তার তফাৎ জানতে চান।

অপেক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ পর স্ক্রিনে এল: Operational parameter invalid.

কী যেন বাধা দিচ্ছে সমীকরণ করতে।

ব্রায়ান টাইপ করলেন:

Suggested parameter adjustment?

কয়েক ধরনের হিসাব কষল কমপিউটার, তারপর সবচেয়ে ভাল আন্দাজ জানিয়ে দিল:

Parameter with highest likelihood of successful adjustment: Number of Magnetic Fields.

কার্সারের দিকে চেয়ে রইলেন জেমস ব্রায়ান।

বলে কী কমপিউটার?

তা হলে কি আরও আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড?

এর মানেটা কী?

ঠিকভাবে নাকের ওপর চশমা বসিয়ে নিলেন। ক্লিক করলেন ইনপুট পেজ-এ। স্ক্রল করে দেখলেন প্রতিটি বর্তমান প্যারামিটার। সেসবের ভেতরেই পেলেন ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইনপুট সংখ্যা। কমপিউটারে সেট করা: One.

নিজেকে বোকা মনে হলো ব্রায়ানের। একটার বেশি ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকতে পারে?

এই প্রোগ্রাম এসেছে নর্থ পোল সার্ভে গ্রুপের তরফ থেকে। ওটার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে মেরুর গতি ও ভবিষ্যৎ পরিবর্তন। এসব হিসেবে রেখে এনআরআই বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করেছে স্ফটিকের প্রভাব।

চিন্তা আরও বাড়ল ব্রায়ানের।

নিজেরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করছে ওইসব স্ফটিক?

চশমার ওপর দিয়ে স্ক্রিন দেখে নিয়ে সংখ্যা বদল করলেন। এবার কি বোর্ডে লিখলেন: Two। দ্বিতীয় ফিল্ডের আউটপুট চান তিনি। মিলিয়ে দেখবেন স্ফটিকের পাওয়ার লেভেল। টিপে দিলেন এন্টার।

লেখা উঠল স্ক্রিনে: Operational parameter invalid.

'বুঝলাম,' বিড়বিড় করলেন ব্রায়ান।

এবার পাল্টে নিলেন সংখ্যা। নতুন ফিল্ডের শক্তির জন্যে সংখ্যা চাইল কমপিউটার। কিন্তু তেমন কোনও তথ্য তাঁর কাছে নেই। টাইপ করলেন X. এবার টিপলেন এণ্টার।

এনআরআই-এর তৈরি অত্যাধুনিক সিস্টেম ব্যবহার করে ভাবতে শুরু করেছে কমপিউটার। প্রয়োজনে সাহায্য নেবে সংযুক্ত অন্তত এক শ'টা মেইনফ্রেম কমপিউটারের। সবাই মিলে কাজ করবে সুপার কমপিউটারের মত করে।

ব্রায়ানের দেয়া জটিল X হিসাব কষতে কমপিউটারের লাগবে প্রচণ্ড ক্যালকুলেটিং ক্ষমতা।

থম মেরে গেছে কমপিউটারের স্ক্রিন।

ওটার দিকে চুপ করে চেয়ে রইলেন ব্রায়ান। ভয় পাচ্ছেন, যে-কোনও সময়ে ক্র্যাশ করবে সিস্টেম।

কয়েক মিনিট পর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আগের নির্দেশ বাতিল করে দেবেন, এমনসময় স্ক্রিনে এল মেরুর শক্তি বিষয়ে একের পর এক সংখ্যা। সবই ম্যাগনেটিক ফিল্ড সংশ্লিষ্ট।

সংখ্যাগুলো দেখলেন ব্রায়ান।

পেয়ে গেছেন নিখুঁত সব সংখ্যা।

সঠিক তথ্য দিয়েছে কমপিউটার: পৃথিবীতে একটি নয়, সব মিলে রয়েছে পুরো তিনটে ম্যাগনেটিক ফিল্ড!

পঁয়তাল্লিশ

ছাত থেকে ঝুলন্ত ন্যাংটো বাল্‌ব্‌ ছড়াচ্ছে হলদে আলো। চার্চের

ভূগর্ভস্থ সেলারে বসে আছেন প্রফেসর হ্যারিসন। আবারও ঘুরছে তাঁর মাথা। চোখের সামনে ঝাপসা লাগছে পার্চমেন্ট।

মায়াদের হায়ারোগ্লিফ ব্যবহার করেছে স্ক্রলের লেখক।

নিজের করা নোট দেখতে চাইলেন তিনি।

'আমি ব্রাদারহুডের মৃতপ্রায় এক জাগুয়ার। এসব লিখছি এমন এক ভাষায়, যেটা আজ আর ব্যবহার করে না কেউ।'

নোট করা লেখার পরের লাইনে চোখ রাখলেন হ্যারিসন। কেঁপে গেছে হাত, তাই আঁকাবাঁকা হয়েছে ইংরেজি অক্ষর।

ডানহাতের দিকে তাকালেন প্রফেসর।

ও, আগে থেকেই তিরতির করে কাঁপছে বাহু!

আবার পড়লেন: *প্রথমে ছিল চারটি স্ফটিক। সেগুলোকে ঠিক জায়গায় সরিয়ে দিয়েছে ব্রাদারহুডের সদস্যরা। তাদের কাছেই রয়ে গেছে ওই রহস্য।*

এসব লেখা মায়াদের সৃষ্টির বিষয়ে, ভাবলেন প্রফেসর। দেবতারা প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন মায়াদের তৈরি করতে। কিন্তু তাঁরা পারলেন না বলেই সৃষ্টি হলো কাঠের মানুষ। দেখতে তারা অনেকটা মানুষের মতই। তাদের চেহারা ছিল বিকৃত।

স্কলাররা বলেন, এসব লেখা হয়েছে বাঁদরের বিষয়ে। তারা ছিল গাছে গাছে।

কিন্তু এ থিয়োরি মানেন না প্রফেসর হ্যারিসন।

কাঠের মানুষের রোম ছিল না। কোথাও পাওয়া যায় না তাদের লেজের কথা। দৌড়ঝাঁপ সম্পর্কে কিছুই নেই হায়ারোগ্লিফে। লেখা আছে, তারা ছিল আড়ষ্ট ও দুর্বল।

প্রচণ্ড এক ঝড় ও বন্যায় মরে সাফ হলো কাঠের মানুষ। বদলে পৃথিবীতে এল সত্যিকারের মানুষ। তবে প্রাণের ভয়ে আমাযন ছেড়ে উত্তরদিকে গেল তারা। সবাই নয়, ব্রাদারহুডের একদল যাজক জানতেন কী করতে হবে। দেবতাদের নির্দেশ অনুযায়ী স্ফটিক নিয়ে দীর্ঘ এক অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন

তাঁরা। কিন্তু আগের মন্দিরে রয়ে গেল ব্রাযিলের ওই স্ফটিক।

হ্যারিসনের মনে পড়ল, এক বছর আগে ওটাই আবিষ্কার করেছিল রানা ও মিতা।

এবারের অভিযানে মিতা আর তিনি খুঁজতে বেরোন পরের তিনটে স্ফটিক। ওগুলো: মন উৎসর্গের আয়না, দূর সাগরের আত্মা উৎসর্গের আয়না, আর শেষেরটা দেহ উৎসর্গের আয়না।

মেক্সিকো উপসাগরের মন্দিরে পেয়েছেন তাঁরা মন উৎসর্গের স্ফটিক।

দূর সাগরের আত্মা উৎসর্গের আয়না বা স্ফটিক বোধহয় রয়ে গেছে রাশায়। ওটা খুঁজে বের করতে হবে।

আর শেষের স্ফটিকটা দেহ উৎসর্গের আয়না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রয়ে গেছে পাহাড়ি জাগুয়ার রাজার কোনও মন্দিরে।

মানবজাতি দুর্বল হলে তাদেরকে নতুন করে উৎসাহিত করত এসব স্ফটিক।

ওগুলোর ব্যবহার জানত মায়ান ব্রাদারহুডের সদস্যরা।

আবারও নিজের নোটে ডুব দিলেন প্রফেসর। কিছুক্ষণ পর বুঝলেন, প্রায় অসম্ভব ওই স্ফটিক খুঁজে বের করা।

বড্ড ঘুরছে প্রফেসরের মাথা। তবুও হায়ারোগ্লিফের বইয়ের ওপর ঝুঁকলেন অনুবাদ করতে। হঠাৎ তাঁর কপাল থেকে একফোঁটা ঘাম পড়ল পার্চমেন্টের ওপর। চট্ করে তোয়ালে দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখ মুছলেন। আবারও মন দিলেন পরের হায়ারোগ্লিফের ওপর।

একটু পর চেনা কয়েকটা মায়ান অক্ষর দেখে ভাবলেন, ভুল না হলে, এসব স্ফটিক রক্ষা করবে এই পৃথিবী।

কিন্তু রক্ষা করবে কী থেকে?

আরও কিছুক্ষণ অনুবাদের পর পেয়ে গেলেন উপযুক্ত মায়ান বাক্য।

হ্যাঁ, মানবজাতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবে এসব

স্ফটিক। যদি না পারে, মানবজাতিকে ধ্বংস করবে স্বয়ং প্রকৃতি।

জ্বরের ঘোরে মাথা ঘুরছে বলে নিজের ওপর রেগে গেলেন প্রফেসর। কাজ করছে না মগজ। এখন ডেটা বেস পেলে কাজে আসত। ঘাঁটতে হতো না পুরনো স্মৃতি। তাঁর আগের নোট বুকটা পেলেও চলত।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন হ্যারিসন। গরম সেলারে লাগছে শীত। আজকাল এমনই হচ্ছে। একবার গরম লাগে, আবার মনে হয় বরফের মত জমে যাবেন।

তোয়ালে দিয়ে আবারও মুখ মুছলেন তিনি। বমি এলেও পেট থেকে বেরোতে চাইল না কিছুই। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। তারপর স্পর্শ করলেন পায়ে বুলেটের ক্ষত। গর্তের চারপাশে শক্ত হয়ে উঠেছে মাংস। গরম লাগছে।

নতুন করে শুরু হয়েছে ইনফেকশন। বাড়ছে ব্যথা।

আনমনে স্ত্রীর কথা ভাবলেন প্রফেসর হ্যারিসন।

কই, শুনছেন না হান্নার কথা!

কোথায় গেল মেয়েটা?

ওর কথা শুনবেন আর গল্প করবেন বলেই বন্ধ করেছিলেন অ্যান্টিবায়োটিক।

এখন দেখা যাচ্ছে, ভাল করেননি কাজটা!

রাত বারোটার দিকে থিতিয়ে এল স্যান ইগন্যাসিয়ো শহরের অনুষ্ঠান। বাড়ি ফিরতে লাগল যে যার মত।

বিশ মিনিট পর ফাঁকা হয়ে গেল প্রধান সড়ক।

সবার কাছ থেকে আগেই বিদায় নিয়েছে রানা ও মিতা। সরু গলির মুখে গেস্টহাউসের সামনে, বেঞ্চিতে মুখোমুখি বসল ওরা।

চুপ করে আছে।

একটু পর জিজ্ঞেস করল মিতা, ‘কী ভাবছ?’

সরল স্বীকারোক্তি দিল রানা, ‘নিয়তি বিশ্বাস করি না।’

‘আমি বিশ্বাস করি,’ বলল মিতা, ‘নইলে আমার জীবনে আসতে না তুমি। এতক্ষণে খুন হতাম ল্যাং-এর জেলখানায়।’

ওকে দেখল রানা, গম্ভীর।

মিতার চোখে পড়েছে কয়েকটা চুল। হাত বাড়িয়ে ওগুলো ওর কানের পেছনে গুঁজে দিল রানা।

‘বলতে পারো এটা কেন, রানা?’ হঠাৎ করেই জানতে চাইল মিতা।

বেঞ্চিতে পিঠ ঠেকিয়ে উল্টো জিজ্ঞেস করল রানা, ‘কেনটা কীসের?’

‘অনেক ভেবেও বুঝিনি, কেন এত আগলে রেখেছ। না আমি আত্মীয়, না বাংলাদেশের কেউ। তবু আমার জন্যে বারবার এত ঝুঁকি কেন নিলে?’

মৃদু হাসল রানা। ‘জানতেই হবে?’

‘হ্যাঁ।’ মাথা দোলাল মিতা।

‘বেশ, শোনো, আমার সাধ্যমত করছি— কারণ ভুলে যাইনি, তুমি বাংলাদেশি এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর মেয়ে। তুমি মুসলিম, হিন্দু বা খ্রিস্টান তা কখনও বিবেচনার বিষয় ছিল না। আর... হ্যাঁ, তোমাকে সাহায্য করার আরও একটা জরুরি কারণও আছে।’

‘সেটা কী?’ ধনুক ভুরু ওপরে তুলল মিতা।

মুচকি হাসল রানা। ‘এত দুর্দান্ত সুন্দরীর পাশে নিজেকে মস্ত কিছু মনে হয়।’

কিল তুলল মিতা, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। রানার হাতটা আলতো করে নিয়ে গালের পাশে চেপে ধরল ও। চোখ স্থির হলো সঙ্গীর চোখে। নীরবে কী যেন বলছে ওর দৃষ্টি।

ওই অলঙ্ঘ্য আহ্বান এড়াতে পারবে না কোনও পুরুষ।

মিতার কমলালেবুর কোয়ার মত ঠোঁট স্পর্শ করল রানার নিষ্ঠুর ঠোঁট। পরক্ষণে টের পেল রানা, সাড়া দিচ্ছে মিতা।

এক হয়ে গেল দু'জনের তপ্ত শ্বাস।

একটু থেমে পরস্পরের চোখে তাকাল ওরা।

চলে গেছে অদ্ভুত এক ঘোরের মাঝে। জড়িয়ে ধরল ওরা দু'জন দু'জনকে।

রানার অবাধ্য হাত চলে গেল মিতার পিঠ পেরিয়ে কোমরের বাঁকে।

ওর কানের কাছে ফিসফিস করল মিতা, 'রানা! আমার ঘরে?'

গাউনের ভেতর থেকে হাত বের করে নিয়ে একটু পিছিয়ে বসল রানা।

'কী হলো?' সব হারিয়ে বসার সুর মিতার কণ্ঠে। চোখে অবহেলিত যুবতীর দৃষ্টি।

এবার ওর ব্রা-র স্ট্র্যাপ খুলল রানা।

কিন্তু ওর হাত প্রেমিকের নয়। কী যেন খুঁজছে আঙুল।

বিস্মিত হয়েছে মিতা। 'কী হয়েছে, রানা? এমন করছ কেন?'

'গত কিছু দিনের ভেতর সার্জারি হয়েছে তোমার?' জানতে চাইল রানা।

'না তো!' অবাক কণ্ঠে বলল মিতা। 'কেন?'

'কারণ তোমার দুই শোল্ডার ব্লেড ও মেরুদণ্ডের মাঝে তাজা ক্ষতের দাগ। ত্বকের নিচে শক্ত কিছু।'

চমকে গেল মিতা। 'চলো তো, বেডরুমে গিয়ে দেখব ওটা কী।'

কয়েক মুহূর্ত পর মিতার বেডরুমে চলে এল ওরা।

'এবার দেখি তোমার ক্ষতটা?' বলল রানা।

লজ্জায় লাল হলো মিতা। তবে খুলে ফেলল সুতির গাউন।

বেয়াড়া চোখকে ফর্সা, সুডৌল কোমরের দিকে যেতে দিল না রানা, দৃষ্টি স্থির হলো ক্ষতের ওপর।

ওদিকে মিতার মনে পড়ল, জ্ঞান ফেরার পর হংকঙে ব্যথা ছিল পিঠে। খুব উজ্জ্বল সাদা বাতির একটা ঘরে নেয়া হয়েছিল ওকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।

তা হলে ওটা কি অপারেশন থিয়েটার ছিল?

ওর পিঠে অস্ত্রোপচার করেছে ল্যাং-এর লোক?

'জিনিসটা কী, রানা?' শুকনো গলায় জানতে চাইল মিতা।

'আমার ধারণা, কোনও ট্র্যাকিং ডিভাইস,' বলল রানা। 'সম্ভবত শর্ট রেঞ্জের। তবে দূর থেকে জানবে রিমোট সেন্সর। লোজ্যাকের মত।'

মিতার মনে পড়ল, ফেরত দিয়েছিল ওর জুতো। যাতে পালাতে পারে! ল্যাং ভাল করেই জানত, কী খুঁজছে ও। এ-ও বুঝেছে, অন্য কারও চেয়ে অনেক আগেই ও পৌঁছুবে স্ফটিকের কাছে। জেনেবুঝেই মুক্তি দিয়েছিল। হয়তো চেয়েছিল ওর সঙ্গে থাকুক পাবলো। তাতে সুবিধা হবে মিতার।

কী ঘটেছে, সংক্ষেপে রানাকে জানাল মিতা। তারপর বলল, 'এখন জানি, কীভাবে সাগরে খুঁজে নিয়েছিল ল্যাং-এর লোক!'

মৃদু মাথা দোলাল রানা।

'তুমি না সন্ধ্যার দিকে বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়েছ?' বলল মিতা।

'শুনতে ভুল হয়েছে হয়তো,' মিতার শঙ্কা দূর করতে চাইল রানা।

'কিন্তু অন্তরে জানো, কেউ না কেউ আসছে,' বলল মিতা। উঠে গাউন দিয়ে বুক ঢাকল। ঘুরে আয়নায় দেখল পিঠের ক্ষত। ওটা এমন এক জায়গায়, দেখা প্রায় অসম্ভব। হাত যেতে চায় না ওখানে। বুঝে শুনেই ওখানে রাখা হয়েছে ট্র্যাকিং ডিভাইস। রানা পিঠে হাত না দিলে কিছুই জানত না কেউ।

‘কতটা গভীরে?’ কাঁপা কণ্ঠে জানতে চাইল মিতা। ভয় পেয়েছে, ওটা আছে পেশির নিচে।

ডিভাইসের কিনারা স্পর্শ করল রানা। ‘ত্বকের ঠিক নিচেই।’

চেহারা মড়ার মত ফ্যাকাসে হলেও বিড়বিড় করল মিতা, ‘চামড়া কেটে ওটা বের করো।’

‘অপারেশনটা ছোট হলেও এটা উপযুক্ত জায়গা নয়,’ বলল রানা। ‘আপাতত থাক, পরে ভাল কোনও হাসপাতালে...’

বারকয়েক মাথা নাড়ল মিতা। ‘আমার ভয় কী, আমাদের কাছে আছে কড়া অ্যান্টিবায়োটিক।’

একটু দ্বিধা নিয়ে বলল রানা, ‘বেশ। তা হলে উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ো।’

‘আমার পেছনের দিকে তাকাবে না তো?’

‘নাহ্, তোমার তো পেছন বলতে কিছুই নেই, সবই সামনের দিক!’ জানিয়ে দিল গম্ভীর রানা।

শুয়ে পড়ে ঘাড় কাত করে করুণ হাসল অসহায় মিতা।

রানার মনে হলো, জবাই হবে বলে তৈরি হয়ে গেছে বেচারি।

‘একটু ব্যথা, ওটা কিছুই নয়,’ নিষ্ঠুর দাঁতের ডাক্তারদের মত বলবে কি না ভাবল রানা। পরক্ষণে সিদ্ধান্ত নিল: না, অত পাষণ্ড হতে পারবে না। ফার্স্ট এইড কিট থেকে রাবিং অ্যালকোহল নিয়ে ভালমত ঢালল ক্ষতের ওপর। একহাতে ডলছে। অন্য হাতে মিতার হাতে দিল দুটো যিথ্রোম্যাক্স বড়ি।

গ্লাস ভরা পানি দিয়ে ওগুলো গিলে জানতে চাইল মিতা, ‘খুব ব্যথা লাগবে?’

জবাবে নীরবে অ্যালকোহল দিয়ে স্ক্যালপেল ধুয়ে নিল রানা।

ভয়ঙ্কর নীরব জবাব পেয়ে গেছে মিতা। মুখ চেপে ধরল

বালিশে। কোমরে চাপল অনেক ভারী কিছু। পরক্ষণে স্পর্শ পেল রানার তপ্ত আঙুলের।

'আচ্ছা, রানা, তোমার কি উঠতেই হবে আমার... ওহ্! রানা! ...মরে গেলাম!'

ভীষণ ব্যথা পেয়ে দম আটকে ফেলেছে মিতা।

ওর পিঠের ত্বক থেকে সরে গেল শীতল কী যেন। পাঁজর বেয়ে নামল উষ্ণ রক্ত।

একটু আগে মিতা ভাবছিলঃ রানা খুব কাছে, ঘুরে ওকে বুকে টানলে কেমন হয়? খুশি মনে দেবে কুমারীত্ব! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, মরেই যাবে ব্যথায়! আর এই নচ্ছার, আনাড়ি ব্যাটার কারণেই ওর এত কষ্ট!

কোমর থেকে নেমে জানিয়ে দিল রানা, 'তোমার অপারেশন শেষ, এবার ব্যাণ্ডেজ করে দেব।'

'তুমি ভাল মানুষ হতে পার, কিন্তু পচা ডাক্তার!' ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল মিতা। 'খবরদার! আমার দিকে তাকাবে না!' কাত হয়ে তোয়ালে দিয়ে ঢাকল শরীর। জানা নেই, প্যাণ্টি নেই বলে সবই দেখা শেষ নিশ্চুপ মাসুদ রানার!

ছেচল্লিশ

একটু আগে ঢাকায় বিসিআই-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটার, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রিগেডিয়ার (অব.) সোহেল আহমেদের সঙ্গে জরুরি আলাপ সেরেছে রানা।

এই সুযোগে নতুন পোশাক পরে নিয়েছে মিতা। এখন

রানার পাশে হেঁটে চলেছে চার্চের দিকে। নতুন ক্ষত থেকে একটু একটু করে রক্ত পড়ে ভিজে গেছে ব্যাণ্ডেজ।

দ্বিতীয় পাথর সঙ্গে নিয়েছে রানা। বামহাতে ফার্স্ট-এইড কিটে প্রফেসর জর্জ হ্যারিসনের জন্যে অ্যাণ্টিবায়োটিক।

মিতার পিঠের ওই রেডিয়োঅ্যাকটিভ পেলেট ছিল দূর থেকে অনুসরণ করার আইসোটোপ ইকুইপমেন্ট, কাজেই আগের চেয়েও সতর্ক রানা। ল্যাং ভেবেচিন্তেই মাইক্রোট্র্যান্সমিটার রাখেনি। দূরে সিগনাল দিত না ওটা। সহজ উপায় ব্যবহার করেছে সে। এখন জিনিসটা লো-গ্রেড আইসোটোপ হলেই ভাল, তা হলে কম ক্ষতি হবে মেয়েটার।

স্ফটিক রাখার সীসার পাত দিয়ে মোড়া কেসে পেলেট রেখেছে রানা। ওই টোপ ফেলে এই শহর থেকে সরাতে হবে ল্যাং-এর লোককে। রানা যত দূরে যাবে, ততই সম্ভাবনা কমবে শহরে হামলা হবার।

চার্চে ঢুকে সরাসরি ওয়াইন সেলারে নামল রানা ও মিতা। সিঁড়ির শেষ ধাপ পেরিয়ে ডাকল রানা, 'প্রফেসর?'

তখনই ভারী কিছু পড়ল ধুপ-খটাং শব্দে!

ঘরের কোনায় চেয়ারসহ কাত হয়ে পড়ে আছেন প্রফেসর হ্যারিসন। প্রায় ছুটে গিয়ে তাঁকে টেনে তুলল রানা। ওকে সাহায্য করল মিতা।

ঘামে জবজব করছে আর্কিওলজিস্টের মুখ-গাল-বুক।

'কী হয়েছে, প্রফেসর?' একটা চেয়ারে হ্যারিসনকে বসিয়ে দিল রানা।

'বুঝতে... বুঝলাম না...' বিড়বিড় করলেন হ্যারিসন।

তাঁর কপালে হাত রেখে বলল মিতা, 'জ্বর অন্তত এক শ' পাঁচ ডিগ্রি! পুড়ে যাচ্ছে গা!'

রানা কিছু বলার আগেই প্যাণ্টের পকেট থেকে গত পাঁচ দিনের অ্যাণ্টিবায়োটিক বড়ি বের করলেন হ্যারিসন। এত দিন

ভঙ্গি করেছেন, ওগুলো নিয়মিত খেয়েছেন।

'দু-দু-দু... দুঃখিত,' বললেন লজ্জিত স্বরে। 'হান্নাকে দেখতে চেয়েছি। মনে হয়েছিল ওকে এনে দেবে ওই স্ফটিক। এখন বুঝছি...' চুপ হয়ে গেলেন।

'আপনাকে ওপরে নিয়ে যেতে হবে,' বলল মিতা।

'ভারবাহী গাধা তো আছেই,' বলল বিরক্ত রানা। প্রফেসরের দু'বগলে হাত ভরে টান দিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলল তাঁকে, পরক্ষণে ডান কাঁধে তুলল। রওনা হয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

'হায়ারোগ্লিফ বুঝতে চাইছিলাম, কিন্তু মাথা চলছিল না,' দুর্বল স্বরে বললেন হ্যারিসন।

'তারপর চলল আপনার মাথা নরকে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। তবে এসব স্ফটিক রক্ষা করে পৃথিবীকে।'

'তাই?' সিঁড়ি বেয়ে উঠছে রানা। পেছনে মিতা।

'মাটি রক্ষা করে,' অপরাধী কণ্ঠে বললেন হ্যারিসন, 'দুঃখিত, আমি হান্নাকে আবার পাশে চেয়েছি।'

'চিকিৎসা না পেলে বাঁদরের মত মস্ত এক লাফে পৌঁছে যাবেন তাঁর পাশে,' বলল রানা। হাঁফ লেগে গেছে সেলার থেকে সোয়া দুই শ' পাউণ্ডের লাশ চার্চে তুলে এনে।

নিচু স্বরে বলল মিতা, 'বাইরের ঠাণ্ডা পরিবেশে তাপ কমবে ওঁর।'

দরজা পেরিয়ে মাটির ওপর প্রফেসর হ্যারিসনকে শুইয়ে দিল রানা। টনটনে ব্যথাভরা কোমর সোজা করে মিতাকে বলল, 'দাও ওঁকে অ্যান্টিবায়োটিক। যদি ঝামেলা করতে চান, চোয়ালে কষে এক ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে নেব।'

'না-না, ঘুষি লাগবে না,' চিঁচিঁ করে বললেন হ্যারিসন।

'লাগবে কি না, সেটা আমি বুঝব,' ধমকের সুরে বলল রানা।

‘তা হলে আপনার ক্ষত পরিষ্কার করতে দেবেন তো?’ সুযোগ পেয়ে দাবি জানাল মিতা। ‘নাকি রানা আরেক ঘুষিতে...’

‘না-না, দেব-দেব! দেব!’

‘ঠিক আছে, তো চুপ করে শুয়ে থাকুন।’ বেচারা প্রফেসরের প্যান্টের বোতাম খুলতে লাগল মিতা।

অপমান গিলে বললেন প্রফেসর, ‘আরে, জরুরি কথা তো বলিইনি!’

তাঁর চোখে ফ্ল্যাশলাইটের কড়া আলো ফেলল রানা। ‘কী সেই জরুরি কথা? জ্বর আরও বাড়ল যে প্রলাপ বকছেন?’

উজ্জ্বল আলোয় চোখ পিটপিট করলেন হ্যারিসন। হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন দু’চোখ। তারই ভেতর হঠাৎ তাঁর মনে এল গভীর এক সন্দেহ: দুর্দান্ত হ্যাণ্ডসাম ছোকরা ওই অপ্সরার মত সুন্দরী মিতাকে পটিয়ে রাত-বিরাতে...

‘কী হলো, বলে ফেলুন,’ বলল রানা।

মিনমিন করে বললেন প্রফেসর, ‘ইয়ে... হায়ারোগ্লিফ থেকে সবই জেনে গেছি কোথায় আছে পরের স্ফটিক।’

‘তাই?’ একটু ঝুঁকল রানা প্রফেসরের দিকে। ‘জ্বরের ঘোরে যা খুশি বকছেন না তো?’

মাথা নাড়লেন হ্যারিসন। হাওয়ায় এসে ভাল লাগছে এখন। দুর্বল স্বরে বললেন, ‘হ্যাঁ। পাহাড় পাড়ি দিয়ে ফিরতে হবে ওই লেকে।’

‘তারপর?’

‘দক্ষিণে পড়বে কয়েক সারি টিলা। তৃতীয় ও চার নম্বর টিলার মাঝে ওই সিঙ্কহোল। অনেকটা নিচু জমির সেনোটের মত। বর্ষার এ সময়ে জেগে ওঠে ছোট কামরার সমান ওই দ্বীপ। পানি থাকে কূপের ভেতর।’

‘ওটা মন্দির?’ অবাক হয়েছে রানা।

'ওই দ্বীপ সত্যিই মন্দির, পাহাড়ি জাগুয়ার রাজার মন্দির। আর তার আয়না হচ্ছে ওই সেনোট।'

'আয়না নাম হলো কেন?'

'কূপ বা চারপাশের পানি কাঁচের মত পরিষ্কার, নিজের চেহারা দেখা যায়,' বললেন আর্কিওলজিস্ট।

'কোথায় আছে ওই স্ফটিক?' জানতে চাইল রানা।

চুপ করে থাকলেন প্রফেসর। অপেক্ষা করছে রানা। কিছুক্ষণ পর মুখ খুললেন হ্যারিসন, 'দ্বীপে উঠলে পাবে সাধারণ কূপের মত ওই সেনোট। কিন্তু অন্যদিক থেকে ওটা আলাদা। নিচে ফেলতে হবে না বালতি, টেনেও তুলতে হবে না দড়ি। ব্যবস্থা করে রেখেছে প্রাচীন মায়ারা। একটা লিভার খুলে দিলেই নেমে যাবে পাথরের স্তূপ, বদলে শেকলের টানে উঠে আসবে ওই স্ফটিক।'

'তার মানে, কয়েক শ' বছর আগেও ছিল মায়ান ব্রাদারহুডের লোক,' বলল মিতা।

'শেষজন কোডেক্স ফাদার সিলভার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, নইলে হারিয়ে যেত ওই দ্বীপ ও স্ফটিক।' রানার চোখে চোখ রাখলেন হ্যারিসন। 'বিশ্বাস করো, স্ফটিক আছে ওখানে।'

'ঘুরে এসে হয়তো ধন্যবাদ দেব; একটু পর রওনা হব,' বলল রানা। ঠিক করেছে, স্যান ইগন্যাসিয়ো ত্যাগ করে বহু দূরে চলে যাবে। এমন ব্যবস্থা নেবে, যাতে প্রথম সুযোগে ওর পিছু নেয় শত্রুরা।

'মায়ারা ভাবতে ভালবাসত, আগামীকালের ওই বিশেষ ভোরে ধ্বংসের দিকে যাত্রা করবে না বিশ্ব,' বললেন হ্যারিসন, 'আরও আসবে লক্ষ লক্ষ স্বাভাবিক ভোর।'

'খুঁজতে যাব পাহাড়ি জাগুয়ার রাজার মন্দির,' বলল রানা, 'আপনারা থাকছেন এ শহরে।'

আর্কিওলজিস্ট নিচু স্বরে বললেন, 'বাছা, প্রার্থনা করি, যাতে তোমার মঙ্গল হয়। ভায়া কন ডিয়োস।'

শুশ্রূষা দরকার প্রফেসরের। তাঁকে ফেলে কোথাও যাবে না মিতা। ভেজা কণ্ঠে রানাকে বলল, 'সাবধান থেকো।'

পাঁচ মিনিট পর স্যান ইগন্যাসিয়ো ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। ভোর হতে এখনও দু'ঘণ্টা। ওর পিঠে ব্যাকপ্যাকে সাগরের মন্দির থেকে পাওয়া স্ফটিক এবং ল্যাং-এর সেই আইসোটোপ।

শহরের ছোট একটি বাড়িতে আঁধারে ঘুম ভাঙল পাবলোর। শুনল কী এক আওয়াজ। চিৎকার করল কেউ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও। এল না আর কোনও আওয়াজ। বাতি নেই কোথাও। ঘুমিয়ে পড়েছে অন্য বাচ্চারা। নড়ছে না কেউ।

অথচ, বুকের মাঝে পাবলো বুঝল, কী একটা দূরে চলে যাওয়ার অনুভূতি।

বিছানায় উঠে বসে চারপাশ দেখল ও।

মগজের ভেতর কেউ বলল, সত্যিই দূরে চলে যাচ্ছে ওটা!

শুনল কিট-কিট আওয়াজ।

বিছানা ছেড়ে নেমে নিঃশব্দে জানালার পাশে গেল পাবলো। কোথাও আলো নেই। কিন্তু রঙিন আলো দেখছে চারপাশে। ওই যে শহরের বাইরের টিলা, ওখানে নড়ছে সাইরেন।

হাতড়ে পোশাক পেয়ে পরে নিল পাবলো। পায়ে জুতো গলিয়ে নিয়ে নীরবে বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

ওই সাইরেনের পিছু নিতে হবে ওকে!

সাতচল্লিশ

ক্যামপেচের নির্জন এক হেলিপ্যাডে প্রকাণ্ড স্কাইক্রেন হেলিকপ্টারে উঠছে একদল সশস্ত্র চাইনিজ লোক। তিন মিনিটের মধ্যেই অস্ত্র রেখে সিটে বসে পড়ল তারা। সব মিলে বিশজন। সবার পর র‍্যাম্প বেয়ে উঠল তাদের নেতা। যে-কেউ ভাববে তার দেহ জুড়ে রয়েছে নতুন ধরনের কোনও কেভলার আর্মার।

বিশেষ সিটে বসে দলের লোকদের দেখল হুয়াং লি ল্যাং। নিজে বেছে নিয়েছে এই যোদ্ধাদেরকে। বুকে ভয় বলতে এদের কিছুই নেই। আড়চোখে দেখছে আর ভাবছে, নেতা পুরোপুরি মানুষ নন, মেশিনের অংশ। অথবা নেতার অংশ ওই ভয়ঙ্কর মেশিন।

নার্ভের ইনপুট অনুযায়ী নির্দিষ্ট গতি তুলে ককপিটের দিকে তাকাল হুয়াং লি ল্যাং। প্রথমে তার মনে হচ্ছিল, বড় বেশি দ্রুত নড়ছে সে। কিন্তু এখন মানিয়ে নিয়েছে মেশিনের সঙ্গে। নিজেকে মনে হচ্ছে টিভির সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যানের মত শক্তিশালী। ভালুকের চেয়েও বেশি শক্তি, গতি চিতার সমান। ঠিক করে ফেলেছে ল্যাং, স্ফটিক ব্যবহার করে পুরো সুস্থ হলেও, আরও আধুনিক করে তুলবে এই সুট। আসলে সব সময়ই ঠিক ভেবেছে সে: মেশিনই তাকে করে তুলবে পৃথিবীর

সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি।

'ওই ছেলে আর ওসব পাথর খুঁজে বের করব আমরা,' দলের উদ্দেশে বলল ল্যাং। 'কাজেই দয়া দেখাবে না কাউকে। কোনও বাধা এলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। কাজ শেষ হলে প্রত্যেকে পাবে বড় অঙ্কের বোনাস।'

খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল চাইনিজ মার্সেনারিরা। দরকার হলে যোগ্য নেতার সঙ্গে নরকে যেতেও আপত্তি নেই।

পাইলটের দিকে ইশারা করল হুয়াং লি ল্যাং।

দু'সেকেণ্ড পর গর্জে উঠল স্কাইক্রেন হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন।

সারারাত অক্লান্ত সেবা করেছে মিতা।

প্রফেসর জর্জ হ্যারিসনকে খাটে শুইয়ে আইভি দেয়ার পর পরিষ্কার করেছে ক্ষত, তারপর খাইয়ে দিয়েছে ওষুধ। রানা চলে যাওয়ার একটু পর এসেছেন ফাদার ভাসকুয়েজ। তিনি সাহায্য করেছেন রোগী শুশ্রূষায়। ভোরের দিকে ছেড়ে গেছে হ্যারিসনের জ্বর।

হাঁফ ছেড়েছে মিতা, এবারের মত প্রাণে বেঁচে গেছেন পাগলা প্রফেসর।

চলে গেছেন ফাদার। পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে মিতা।

তবে ওর ঘুম ভাঙল দু'ঘণ্টা পর চার্চের ঘণ্টির ঢং-ঢং আওয়াজে।

আনমনে ভাবল মিতা, আজ কী রবিবার?

কী জানি!

পাশের ঘরে গিয়ে রোগীকে দেখল, জেগে গেছেন প্রফেসর। চেতনা আছে পুরো।

'ঘুম ভেঙে গেল?' জানতে চাইল মিতা।

'এত আওয়াজ হলে ঘুমানো যায়?' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন

হ্যারিসন।

কথা ঠিক। বেজেই চলেছে চার্চের ঘণ্টি। মোটেও থামছে না।

হঠাৎ চমকে গেল মিতা। মস্ত কোনও বিপদ না হলে এভাবে বাজানো হয় না ঘণ্টি!

পাশের ঘরে এসে ব্যাকপ্যাক থেকে পিস্তল নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল মিতা। ওখানেই থামতে হলো ওকে। অস্ত্র হাতে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে দুই শ্বেতাঙ্গ লোক। শহরের কয়েকজনকে জিম্মি করেছে ওই দলের আরও দু'জন।

এই চারজনের নেতার বয়স চল্লিশ হবে। দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। কঠোর সুরে বলল সে, 'পিস্তলটা মাটিতে ফেলে দাও, মেয়ে!'

নির্দেশ পালন করল মিতা।

ওর দিকে এগিয়ে এল লোকটা। গম্ভীর চেহারায় বলল, 'আমার নাম ইগোর দিমিতভ। তোমার কাছে রয়ে গেছে আমাদের খুবই জরুরি কিছু।'

বিশ মাইল দূরে চতুর্থ টিলা বেয়ে উঠছে মাসুদ রানা।

রাতে পেছনে রেখে এসেছে ঘন জঙ্গল ও কয়েকটা টিলা। ছোট, সরু এক ক্যানিয়ন পেরোবার সময় ওটার ভেতর ফেলেছে রেডিওঅ্যাকটিভ পেলেট। কপাল ভাল হলে ওখানে খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করবে ল্যাং-এর লোক। গর্ত ও ফাটলের শেষ নেই, ভাবতে পারে, ওরা আছে ওখানেই।

এরপর নানান বাধা পার করে পুরো পাঁচ মাইল সরে এসেছে রানা, ক্লান্ত। এ মুহূর্তে হাঁটছে স্বাভাবিক গতিতে। কাঁটাগাছের অত্যাচারে ছড়ে গেছে শরীর। চট-চট করছে ঘাম মেশা ধুলো। পুরো মনোযোগ সামনের দিকে। আর সে কারণেই শুনতে পেল না ঘনিয়ে আসছে মহাবিপদ।

একটু পর কানে এল আওয়াজটা। বাতাসে গুনগুন গুঞ্জন তুলছে কিছু। বিমান বা হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না, আওয়াজটা অনেকটা লন মোয়ারের মত।

চট্ করে ঘন এক ঝোপে ঢুকল রানা। চোখ পেছনে ফেলে আসা আকাশে। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল, একমাইল দূরে ওটা। উড়ে আসছে এদিকে। রিমোটলি অপারেটেড ড্রোন।

তার মানে, ওকে খুঁজে পেয়ে গেছে ল্যাং!

ঝোপ ছেড়ে বেরিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল রানা। ওপর থেকে ওকে দেখবে ড্রোন। কাজেই চাই ভাল কোনও কাভার। হয়তো টিলার ওপরের দিকে আছে তেমন জায়গা।

ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়ে চলেছে রানা। কিন্তু মাত্র একমিনিট পর মাথার ওপর দিয়ে গুঞ্জন তুলে গেল ড্রোন। আরেকটু হলে ছিলে দিয়ে যেত চাঁদি।

ছুটতে ছুটতে ওপরে তাকাল রানা।

ভাগ্য ভাল, ওই ড্রোন নিরস্ত্র।

অবশ্য, তখনই শুনল আরেকটা গুঞ্জন।

ওটাও ড্রোন!

পরক্ষণে শুনল আনগাইডেড রকেটের তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল্!

ডানদিকের ঢালু জমিতে ঝাঁপ দিল রানা। মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে এক শ' ফুট দূরের জমিতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো রকেট। দু'সেকেণ্ড পর এল কংকাশন ওয়েভ ও আগুনের তাপ।

রানার দশ ফুট ওপর দিয়ে গেল দ্বিতীয় ড্রোন। ঘুরে এসে খতম করবে শিকারকে। লাফ দিয়ে উঠে হরিণের গতি তুলল রানা, পাঁই-পাঁই করে উঠে যাচ্ছে টিলা বেয়ে। কয়েক সেকেণ্ড পর চূড়ার কাছে পৌঁছে লুকিয়ে পড়ল বেশ কিছু বোল্ডারের মাঝে।

আপাতত নিরাপদ।

ড্রোনের খোঁজে আকাশে তাকাল রানা।

পাইলটহীন দুই বিমান অলস শকুনের মত ঘুরছে ওপরে। আটকে রাখবে ওকে, ওদিকে দূর থেকে এসে হাজির হবে সত্যিকারের শিকারীরা!

উদ্যত অস্ত্রের মুখে আবারও গেস্টহাউসে ঢুকতে হয়েছে মিতাকে। ওর পিছু নিয়ে ঢুকেছে ইগোর দিমিতভ। এ ছাড়া, এ বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসা হয়েছে ফাদার ভাসকুয়েজ এবং শহরের কয়েকজনকে। তাদের ভেতর লিনিয়াকে চিনল মিতা। ওই মহিলা রেখেছিল পাবলোকে। অনুষ্ঠানের জন্যে ওকে ধার দিয়েছিল গাউন। এখন হাঁটু গেড়ে সবাইকে বসিয়ে রেখেছে নিষ্ঠুর চেহারার রাশানরা।

'দয়া করে ওদের ক্ষতি করবেন না,' কাতর সুরে বলল মিতা। 'আমার সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

ঠোঁটে ভোদকার বোতল তুলল ইগোর দিমিতভ। এক ঢোক জ্বলন্ত তরল গিলে নিয়ে বলল, 'আমাদেরকে ফাঁকি দিয়েছ, মেয়ে। তোমার কারণেই ওরা এখানে। লুকিয়ে রেখেছো ছেলেটাকে। কাজেই প্রাণে বাঁচবে না কেউ।'

দিমিতভের লোকদেরকে দেখল মিতা। এ ধরনের লোকই গিয়েছিল সেই ফাইভ স্টার হোটেলে। এবার সঙ্গীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে রাগ ও ঘৃণা।

দিমিতভের দিকে তাকাল মিতা। লোকটার দৃষ্টি বলে দিল, আগেও মানুষ খুন করেছে সে।

জ্যৈষ্ঠের কাঠের মত শুকিয়ে গেল মিতার গলা। বাঁচবে না ওরা কেউ!

ফাদার ভাসকুয়েজের পাশে বসানো হয়েছে ওকে। সামনে এসে দাঁড়াল ইগোর দিমিতভ। 'ছেলেটা কোথায়?'

এই পাষণ্ডের হাতে বাচ্চা ছেলেটাকে তুলে দিতে হবে ভাবতে গিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হলো মিতার। কিন্তু উপায়ই বা কী?

নইলে এই শহরের সবাইকে মেরে ফেলবে রাশানরা।

'আমি জানি না ও কোথায়,' সত্য বলল মিতা।

'মিথ্যা বলছ!' রাগে গর্জে উঠল দিমিতভ। ঠেকিয়ে দিল মিতার মাথার পাশে ম্যাকারভ পিস্তল।

ওটার জোর গুঁতো খেয়ে মেঝেতে কাত হয়ে পড়ল মিতা। তাক করেই গুলি ছুঁড়ল লোকটা। প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল ঘর। চমকে গেছে সবাই। ফুটো হয়ে গেছে মিতার নাকের তিন ইঞ্চি দূরের মেঝে।

সাবধানে উঠে বসল মিতা। হাত মাথার ওপর।

এক পা পিছিয়ে বোতল ঠোঁটে তুলে আরেক ঢোক ভোদকা খেল ইগোর দিমিতভ। পরিষ্কার বোঝা গেল, কঠিন কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। এমন কিছু, যেটা পছন্দ নয় তার।

'চার্চ আর ওই মেয়েলোকের বাড়ি সার্চ করেছি, এই রাস্তার অন্য বাড়িও বাদ পড়েনি, কিন্তু আশপাশে নেই ওই ছেলে,' কঠোর সুরে বলল প্রাক্তন এফএসবি এজেন্ট।

'পালিয়ে গেছে,' কাঁপা গলায় বলল লিনিয়া, 'জানি না কোথায়।'

মহিলার পেছনে গিয়ে প্রফেসর হ্যারিসনের দিকে তাকাল দিমিতভ। আঙুল তাক করল আইভি লাইনের দিকে।

'আমি আপনাকে ভয় পাই না,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ আর্কিওলজিস্ট।

'অসুস্থ?' বলল দিমিতভ, 'তো সবার আগে কষ্ট দূর করব আপনার।'

শ্বাস আটকে ফেলল মিতা। বুঝে গেছে, লোকটাকে আরও রাগিয়ে দিলে খুন হবেন প্রফেসর। খুনিটার পায়ের আওয়াজ সরে আসছে শুনে একটু স্বস্তি পেল।

আবারও বন্দিদের সামনে এসে দাঁড়াল ইগোর দিমিতভ। আঙুল নাচিয়ে বলল, 'তোমরা একই কথা বলছ।' তার কণ্ঠ

শুনে মিতার মনে হলো, ওদের কথা বিশ্বাস করেছে সে। কিন্তু পরক্ষণে বলল লোকটা, 'কিন্তু ঝালাই করা মিথ্যা সবসময় জোরালো হয় সত্যির চেয়েও।'

সবাইকে নিয়ে কীভাবে মুক্তি পাবে, তাই মগজ খেলাতে শুরু করেছে মিতা। কয়েক সেকেণ্ডে বুঝল, কাজটা অসম্ভব। দরজার সামনেই নীরব চার রাশান, কিন্তু ওরা কেউ উঠে দাঁড়ালেই অস্ত্র তাক করবে ওদের দিকে। খাঁচায় বন্দি বাঘের মত পায়চারি করছে ইগোর দিমিতভ। মিতা দেখল, ধুপ্ ধুপ্ শব্দে কাঠের মেঝেতে পা ফেলছে সে। তার মানেই, ফুরিয়ে আসছে ধৈর্য।

মিতার সামনে থামল ইগোর দিমিতভ। 'ভাল করেই জানো, কীভাবে শেষ হবে খেলা। খুন করব সবাইকে। তবে অন্যদের মরতে দেখবে তুমি। ওদেরকে বাঁচাতে চাইলে, দেরি না করে বলো ছেলেটা কোথায়।'

মেঝের দিকে তাকাল মিতা। চোখে চোখ রাখার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। চোখের কোণে জমে গেল জল, তারপর টপটপ করে অশ্রু বিন্দু পড়ল শুকনো কাঠের মেঝের ওপর।

চোখ বুজে ফেলল মিতা। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর দু'হাতে মুছে ফেলল অশ্রু। রাগ হলো ওর রাশানদের ওপর। শহরের সব মানুষকে জিম্মি করেছে এরা। খুন করবে বলছে। অথচ ওদের কোনও দোষ নেই। ইগোর দিমিতভের চোখে চোখ রাখল মিতা।

'আমি ভাল করেই জানি তুমি কে, ইগোর দিমিতভ।'

'অবসর নেয়ার আগে পেশাদার ছিলাম,' বলল দিমিতভ, 'তখন সম্মান ছিল। এখন আমি আবর্জনাখেকো, ঘেয়ো কুকুর।'

'হয়তো আমাদেরকে খুন করবে, কিন্তু মনে রেখো, নিজেদের কবর খুঁড়ছ তোমরা,' বলল মিতা।

ইগোর দিমিতভের কঠোর চেহারায় কীসের এক রহস্যময়

অনুভূতি খেলে যেতে দেখল মিতা। কয়েক সেকেণ্ড পর লোকটার পেটের গভীর থেকে উঠে এল অসুস্থকর হাসি। আরেক চুমুক দিয়ে মিতার দিকে বাড়িয়ে দিল ভোদকার বোতল। নিচু স্বরে বলল, 'অনেক আগেই খোঁড়া হয়ে গেছে আমার কবর।'

মুহূর্তের জন্যে তাকে দুঃখী মনে হলো মিতার। আর তখনই মনে পড়ল সেই গোল মুখ। চ্যাপ্টা নাক। চোখের দৃষ্টি ধারালো ছোরার মত।

'আমি চিনতাম তোমার ভাইকে,' বলল মিতা। 'তোমার তুলনায় হাজারগুণ ভাল ছিল সে। ছেলেটার প্রতি মমতা ছিল।'

খুব ধীরে ম্যাকারভ পিস্তল ওপরে তুলল ইগোর দিমিতভ। মিতার মনে হলো, মাতাল হয়ে গেছে লোকটা। ভারী লাগছে তার কাছে অস্ত্রটা।

'তুমি আমার ভাইয়ের কথা বলছ?' বলল সে। 'ও কিডন্যাপ করেছিল পাবলোকে।'

'বাঁচাতে চেয়েছিল ছেলেটাকে,' বলল মিতা।

'তাই?' ঘৃণার সঙ্গে বলল ইগোর। 'এবং ব্যর্থ হয়েছে।'

'হয়নি! নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেছে বাচ্চাটাকে!'

ঘুরে ফাদার ভাসকুয়েজের মাথার পেছনে পিস্তল ঠেকাল সে।

'এ কাজ কোরো না,' অনুরোধ করল মিতা।

'সময় হয়ে এল,' থমথমে কণ্ঠে বলল ইগোর।

'স্রষ্টা মাফ করুন তোমাদের,' সরল কণ্ঠে বললেন ফাদার ভাসকুয়েজ।

'আশা ছাড়া আর কিছুই নেই মানুষের,' বলল ইগোর দিমিত্ভ। পিস্তল তুলেই ঘুরে ডানদিকের দুই রাশানের বুকে গুলি করল সে। লাশদুটো মেঝেতে পড়ার আগেই পরের দুই গুলি বুকে নিয়ে ছিটকে পড়ল বামদিকের দুই রাশান।

বদ্ধ ঘরে কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে চারটে গুলির আওয়াজ: গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

এখনও ছটফট করছে এক এফএসবি জুনিয়র এজেন্ট।

আবারও গুড়ুম করে উঠল ইগোর দিমিতভের পিস্তল।

খুন করতে এসে পৃথিবী ছেড়ে গেল মাথায় গুলি খেয়ে চার যুবক।

নানান দিকে ছিটকে পড়েছে ঘরের সবাই। উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় দিয়েছে লিনিয়া দরজার লক্ষ্য করে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দেখছে অবাক মিতা। বরফের মূর্তি হয়েছেন প্রফেসর হ্যারিসন। বিস্ফারিত চোখে দেখলেন মিতার ওপর স্থির হলো দিমিতভের পিস্তলের নল।

'ক্-কী হলো?' জানতে চাইল মিতা।

'বোঝা সহজ,' বলল দিমিতভ। 'আমার আপত্তি আছে আজ মরতে।'

'আমিও তো চাই না মরতে,' জানাল মিতা।

'মরতে হবে না তোমাকে,' পিস্তল নামিয়ে ফেলল ইগোর। 'অন্তত আমার হাতে মরবে না। আজ সবাইকে খুন করত এরা।' মৃত রাশানদের দেখাল সে।

মিতা মুখ খোলার আগেই ফাদার ভাসকুয়েজের দিকে ফিরল প্রাক্তন এফএসবি এজেন্ট। 'ফাদার, আপনি কী জানেন পাবলো কোথায়?'

মাথা নাড়লেন ভাসকুয়েজ।

'জানি না মিথ্যা বলছেন কি না, তবে আশা করি, ওকে ভাল কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন আপনারা,' বলল দিমিতভ। 'ভয় পাবেন না, ওকে রাশায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।'

'আমরা জানিই না ও কোথায়,' মাথা নাড়লেন ফাদার।

'তা হলে ওকে খুঁজে বের করুন,' বলল দিমিতভ। 'সরিয়ে ফেলবেন এই শহর থেকে। এমন কোথাও, যেখানে ওকে খুঁজে

পাবে না এফএসবি। যারা আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে বলব, গোলাগুলির সময় মারা গেছে পাবলো। লাশ নিয়ে পালিয়ে গেছে একদল লোক।'

চুপ করে আছে মিতা। দেখছে ইগোর দিমিতভকে। ভাবছে, একটু আগে কত খারাপ লোক ভেবেছিল একে!

'আসলে কী হলো, সত্যিই বুঝলাম না,' বলল মিতা।

'দিনের পর দিন ভেবেছি, আমার ভাই অসম্মান করেছে আমাদের বংশের,' বলল ইগোর দিমিতভ। 'কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, না বুঝে ওকে অসম্মান করে ফেলেছি আমি। যা উচিত, তাই করতে চেয়েছিল ও।'

'এখন কী করবেন ভাবছেন?' জানতে চাইল মিতা।

'কী করব?' বলল এফএসবির প্রাক্তন তুখোড় এজেন্ট, 'এখন একদল চিনা সশস্ত্র লোক এবং প্রায় মেশিনের মত একদল দানব যাচ্ছে তোমার বন্ধু মাসুদ রানাকে খুন করতে। এমন এক যুদ্ধে জড়িয়ে গেছে বাঙালী যুবক, কেউ পাশে না লড়লে নির্ঘাত মরবে।'

মিতার দিকে ডানহাত বাড়িয়ে দিল রাশান। 'আমরা সাহায্য করতে পারব ওকে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মিতার মুখ। বেসুরো কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু... রানা তো... চলে গেছে অনেক দূরে!'

'জানি,' বলল ইগোর দিমিতভ, 'কমরেড হুয়াং লি ল্যাং-এর সঙ্গে আছে হেলিকপ্টার। কিন্তু ঘাবড়ে যেয়ো না। আমাদের সঙ্গে যা থাকবে, ওটার কথা ভাবতেও পারেনি ওই নরকের পশু।'

এত কিছু ঘটে গেছে, কেমন মাথা ঘুরছে মিতার। কিন্তু হঠাৎ করে ভয়ে বুক আঁকড়ে এল ওর। একা রানাকে বাগে পেয়ে খুন করবে ল্যাং!

ইগোর দিমিতভের হাত ধরে উঠে দাঁড়াল মিতা। 'তা হলে

চলুন! ওর সাহায্য দরকার!’

আটচল্লিশ

ইয়াকা মাউন্টেনের সুড়ঙ্গে ড্রাইভার হামভি পুরো থামাবার আগেই লাফিয়ে নেমে পড়লেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান। প্রায় দৌড়ে গিয়ে উঠলেন ট্রেইলার ল্যাবোরেটরির ভেতর।

কার এত তাড়াহুড়ো, তা দেখতে মুখ তুলে তাকালেন বিজ্ঞানী ক্যাথিবা আলিহা, সিআইএ চিফ মার্ল ক্যালাগু এবং দুই দলের বিজ্ঞানীরা। মাত্র আধঘণ্টা পর প্রচণ্ড বিচ্ছুরণ হবে ব্রাযিল স্টোন থেকে, তাই কীভাবে ওটাকে সবচেয়ে নিরাপদে ধ্বংস করা যায়, তা নিয়ে চলছিল আলোচনা।

ফ্ল্যাট-স্ক্রিন মনিটরের স্পিকার থেকে এল প্রেসিডেন্টের কণ্ঠ: ‘সব ফেলে কোথায় ছিলে, জেমস?’

‘সরি, নতুন একটা থিয়োরি নিয়ে কাজ করছিলাম,’ বললেন ব্রায়ান।

‘আর সময় পেলেন না!’ ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বললেন ক্যালাগু।

‘ফালতু কথা বাদ দিন!’ পাল্টা ধমক দিলেন ব্রায়ান। ঘুরে তাকালেন মনিটরে প্রেসিডেন্টের দিকে।

‘অনেক দেরি হয়ে গেছে, জেমস,’ বললেন প্রেসিডেন্ট।

‘আগে শুনুন আমার কথা, তারপর যা ভাল মনে হবে করবেন,’ বললেন ব্রায়ান, ‘চাইলে এরপর গুলি করেও মারতে

পারেন আমাকে, আপত্তি তুলব না। মাত্র দুটো মিনিট দিন।' প্রেসিডেন্ট কিছু বলার আগেই দম না নিয়েই বললেন, 'মিস্টার ক্যালাগুর তথ্য ঠিক। কিন্তু সংখ্যা ঠিক ছিল না। ওগুলো আমরা বের করেছি। আর তাই জেনে গেছি বাস্তবতা কী।'

'মিস্টার ক্যালাগু?' বললেন প্রেসিডেন্ট।

মাথা নাড়লেন সিআইএ চিফ। 'আমার জানা নেই ব্রায়ান কী বলতে চাইছেন।'

উদ্বিগ্ন হয়ে ঘড়ি দেখলেন প্রেসিডেন্ট। 'যা বলবে চট্ করে বলো, জেমস।'

বড় করে দম নিলেন ব্রায়ান। দরদর করে ঘামছেন। ঘুরছে মাথা। টিটকারির হাসি হাসছেন ক্যালাগু। বস আবারও অপমানিত হবেন, সেই কথা ভেবে মেঝের দিকে চেয়ে আছে এনআরআই স্টাফরা। মন খারাপ করে অন্যদিকে তাকালেন ক্যাথিবা আলিহা।

এই ল্যাবে কেউ তাঁর সঙ্গে সায় দেবে না, বুঝে গেলেন ব্রায়ান। আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, জিয়োলজি অনুযায়ী, পৃথিবীর মাঝের অংশ প্রকাণ্ড এক তপ্ত, ঘুরন্ত তরল। বেশিরভাগ নিকেল আর আয়ার্ন। আর এ কারণেই ওই ঘুরন্ত গোলক তৈরি করছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ওটা রক্ষা করছে আমাদেরকে।'

সবার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন, বুঝে গেলেন ব্রায়ান।

'তবে সমস্যা হচ্ছে, কেউ নিশ্চিত নন অত গভীরে কী আছে এবং কী হচ্ছে। কারও সাধ্য নেই যে থিয়োরি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। আর এ কারণেই কেউ জানাতে পারেননি, কী কারণে পাল্টে যাচ্ছে পৃথিবীর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড। হয়তো এক বিলিয়ন বছর পর পরিবর্তিত হলো ওটা। আবার মাত্র পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর পরেই এল পরিবর্তন।' ঘর্মাক্ত চুলে হাত বোলালেন ব্রায়ান। টের

পেলেন, ফেটে যেতে চাইছে কপালের পাশের রগ। 'এর কারণ, স্যর, মাত্র একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাজ করছে না পৃথিবী জুড়ে। তিন স্তরের ফিল্ড নিয়ন্ত্রণ করছে এই গ্রহ। তাদের ভেতর ঘটছে অনেক কিছুই।'

'পাগল হয়েছেন?' খেঁকিয়ে উঠলেন ক্যালাগু।

তাঁকে পাত্তা দিলেন না ব্রায়ান। 'ওই একই ঘটনা ঘটছে সূর্যের বুকে। তৈরি করছে আমাদের গ্রহের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের চেয়ে লক্ষ গুণ শক্তিশালী ফিল্ড। তবে প্রতি এগারো বছরে পাল্টে যাচ্ছে সেসব ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সহজ নয় বিষয়টি। সূর্যের মেরুর দিকে নিরক্ষরেখা ঘুরছে অনেক জোরে। ফলে সূর্যের বুকে আঁচড়ের মত তৈরি হচ্ছে ম্যাগনেটিক লাইন। ব্যাপারটা পেতে রাখা চাদরের মাঝ থেকে টান দেয়ার মত। ওপরে উঠছে মাঝখান, কিন্তু রয়ে যাচ্ছে আগের জায়গায় চাদরের কিনারা। এলোমেলো হয়ে উঠছে। টেনে রাখা রাবার ব্যাণ্ডের মত ছিটকে যাচ্ছে সূর্যের লাইন। আমরা ওটাকেই বলি সোলার ফ্লেয়ার। বা বলতে পারেন করোনাল ম্যাস ইজেকশন। ওটার কারণে মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে অকল্পনীয় পরিমাণের এনার্জি।'

'কী পরিমাণের কথা বলছ?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'এতই, একেক মুহূর্তে মহাশূন্যে ছুঁড়ছে শত শত বিলিয়ন টন তপ্ত মেটারিয়াল।'

'এরসঙ্গে পৃথিবীর কী সম্পর্ক?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'আমরা ধারণা করেছি, পৃথিবীর মাঝের অংশ গোল বলের মত, ঘুরছে। কিন্তু বাস্তবে ভেতরে ঘুরছে তপ্ত তরল। সিমুলেশনের সময় গ্রাফ দেখে বুঝলাম, কখন হবে ফিল্ডের স্ট্রেংথ্ আর রিভার্সাল। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর বাইরের অংশে নিরক্ষরেখা আর মেরু কিন্তু আলাদা গতি তুলে ঘুরছে। ওটাই হচ্ছে দ্বিতীয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড।'

‘তুমি বলেছিলে তিনটে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে?’

‘হ্যাঁ,’ মাথা দোলালেন ব্রায়ান। ‘তৃতীয় ফিল্ডটা তৈরি করেছে বিপুল পরিমাণের পাথর মিলে। মাত্র তিন হাজার বছর হলো ওটা তৈরি হয়েছে। ভেতরের গরম তরল যেন ছিটকে বেরিয়ে না আসে, সে চেষ্টা করছে ওটা।’

‘এর ফলে কী হচ্ছে?’

‘সূর্যের মতই পৃথিবীর বুকেও তৈরি হচ্ছে ভাঁজ।’

গলা পরিষ্কার করলেন প্রেসিডেন্ট। ‘আর এরপর যখন ওই র‍্যাবার ব্যাণ্ড ছিঁড়ে যাবে?’

মাথা নাড়লেন ব্রায়ান। ‘আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মত হবে না সাদা ব্যাঙের ছাতার মেঘ। কিন্তু আমরা টের পাব অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে। হয়তো তা হবে মৃদু ভূমিকম্প, বা থরথর করে কাঁপবে পৃথিবী। তবে সবচেয়ে বেশি বুঝব আমরা অন্য কারণে। বিচ্ছুরণ হবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রচণ্ড শক্তি। পুরো সংখ্যা দেখিনি, কিন্তু ধরে নিন, ওই বিচ্ছুরণ হবে ক'দিন আগের ওই মারাত্মক বিচ্ছুরণের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি।’

‘দশ হাজার গুণ?’ চমকে গেলেন প্রেসিডেন্ট।

‘প্রচণ্ড এক সুনামির আঘাতের মত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ধ্বংস করবে পশ্চিম হেমিস্ফেয়ারের প্রতিটি ইলেকট্রিকাল সার্কিট। নষ্ট হবে পৃথিবীর গ্রহপথের কাছের সব স্যাটেলাইট। সামান্য দুর্বল ওয়েভ যাবে এশিয়া, রাশা ও উত্তর-পুব ইউরোপের ওপর দিয়ে। এর মানে, আধুনিক সব ইলেকট্রনিকের সর্বনাশ হলেও তাদের রয়ে যাবে মিলিটারি অনেক ইকুইপমেন্ট। বিশেষ করে সাইলোর ভেতর মিসাইল। থাকবে তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা। কিন্তু আমাদের থাকবে না সে শক্তি। যে-কোনও সময়ে আসবে চিন বা রাশার তরফ থেকে হামলা।’

‘আর এসব স্ফটিকের কী ভূমিকা এসবের ভেতর?’

'ওগুলো রয়েছে সঠিক সময়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ মহাশূন্যে পাচার করে দেয়ার জন্যে, যাতে ছিঁড়ে না যায় পৃথিবীর ওপরের রাবার ব্যাণ্ড,' বললেন ব্রায়ান। 'কিন্তু গণ্ডগোল দেখা দিল রাশার ওই স্ফটিক বিস্ফোরিত হওয়ায়।

'অবশ্য, এমন হবে ভেবেছিলেন অতীতের মায়ান বিজ্ঞানীরা। তাই আমরা স্ফটিক সরিয়ে নিলেও নিজেদের ভেতর ছিল ওগুলোর তথ্য আদান-প্রদান। লাইটনিং রডের মত যে যার ভাগের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ নিরাপদে পাঠিয়ে দিয়েছে মহাশূন্যে। কিন্তু এসব স্ফটিক কাজ করবে শুধু মাটির ওপরে তুললে। একটা আছে মেক্সিকোতে। আমাদের কাছে একটা।'

চুপ করে আছেন প্রেসিডেন্ট।

থমথম করছে ঘর।

এমন কী নিশ্চুপ ব্রায়ান। জানেন না, ঠিকভাবে বোঝাতে পেরেছেন কি না কমাণ্ডার ইন চিফকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, সাধ্যমত তো করলাম!

'আপনারা সবাই আপাতত ল্যাব থেকে বাইরে যান,' কিছুক্ষণ পর বললেন প্রেসিডেন্ট, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চাই এনআরআই চিফের সঙ্গে।'

ব্রায়ানের পাশেই বসেছেন ক্যাথিবা আলিহা। আঙুরের রসের বোতল নিয়ে উঠে পড়লেন। নরম সুরে বললেন, 'ভালই শো চালালেন।'

ওই কথা শুনে ব্রায়ানের মনে হলো, বিজ্ঞানী বুঝে গেছেন, ভাল লড়েও হেরে গেছেন তিনি।

একে একে ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেলেন অন্যরা। সবার শেষে সিআইএ চিফ ক্যালাগু। দরজা বন্ধ করার আগে বিষ চোখে দেখলেন ব্রায়ানকে। যদি পারতেন, গুলি করে পাগলা কুকুরের মত করে খুন করতেন জন্মের শত্রুকে।

ঊনপঞ্চাশ

আকাশের দুই ড্রোন মিলে কয়েকটা বোল্ডারের মাঝে গেঁথে ফেলেছে রানাকে। কী করবে ভাবছে ও, এমনসময় দেখল পৌঁছে গেছে তিনটে ভারী হেলিকপ্টার। নেমে পড়ল ওগুলো দুই টিলার মাঝে সমতল জমিতে।

সামনের হেলিকপ্টার থেকে নামল সশস্ত্র একদল লোক। সংখ্যায় হবে কমপক্ষে বিশজন! দ্বিতীয় হেলিকপ্টার থেকে নামল খচ্চরের মত দেখতে বেশ কয়েকটা জন্তু।

ওগুলো আবার কেন?

চোখে বিনকিউলার তুলল রানা।

খচ্চর নয় ওগুলো!

অদ্ভুত কোনও মেশিন! চার পা খচ্চরের মতই, কিন্তু মাথার জায়গায় মেশিনগানসহ টারেট!

পিছিয়ে পড়ল সশস্ত্র আর্মি, তাদের আগে আগে হাইড্রলিক পায়ে হেঁটে আসতে লাগল যন্ত্রমানবরা! টারেটের মাথা দুলছে এদিক-ওদিক!

ছয়জন, গুনল রানা। গলা শুকিয়ে গেল ওর। যন্ত্রমানব কাছে আসার আগেই ভাগতে হবে এখান থেকে!

দুই বোল্ডারের মাঝে অ্যাসল্ট রাইফেল রেখে সাইট স্থির

করল সামনের যন্ত্রমানবের ওপর। ট্রিগার টিপতেই দুই সেকেণ্ড পর বুলেট লাগল বুকে, ছিটকে উঠল লালচে ফুলকি, হোঁচট খেল যন্ত্রমানব। পড়তে গিয়েও সামলে নিল তাল। লম্বা লম্বা পায়ে উঠে আসছে ঢালু জমি বেয়ে।

আবারও গুলি করল রানা। ফলাফল একই। এবার সুইচ টিপে ফুল অটোমেটিকে নিয়ে কয়েক পশলা গুলি করল ও।

মাটিতে পড়ল এক যন্ত্রমানব। ক্ষতি হয়েছে সামনের পায়ের। পেছনের দুই পা এখনও ঠেলছে এগোবার জন্যে। রানার দিকে ঘুরল অন্য পাঁচ যন্ত্রমানব, পরক্ষণে এল একরাশ বুলেট। ছিটকে উঠল রানার সামনের বোল্ডারে লেগে।

ডাইভ দিয়ে একটু দূরের জমিতে পড়ল রানা। ক্রল করে সরে গেল পনেরো ফুট। কয়েকটা বোল্ডারের মাঝ দিয়ে দেখতে চাইল অগ্রসরমাণ দানবগুলোকে। কিন্তু ওর জন্যেই যেন তৈরি ছিল তারা। উঁকি দিতেই আরেক পশলা গুলি এসে লাগল সামনের বোল্ডারে।

রানার জানা নেই, কেমন সেন্সর ব্যবহার করছে যন্ত্রমানবরা। হয়তো হিট সেন্সর, মোশন ডিটেক্টর, শেপ রেকগনিশন সফট্ওয়্যার— ঘটনা যাই হোক, খুব ভালভাবেই জানে ওর বর্তমান অবস্থান।

শিলাবৃষ্টির মত চারপাশে লাগছে অজস্র বুলেট। আবারও সরে কাভার নিল রানা। সবচেয়ে বড় বোল্ডারে ঠেকিয়ে নিল পিঠ। বুঝে গেছে, এবার আর রক্ষা নেই ওর!

বিদঘুটে ঠক-ঠক-ক্যাঁচ শব্দে উঠে আসছে পাঁচ যন্ত্রমানব!

ঝড়ের গতি তুলে আকাশ চিরে চলেছে রাশান প্রকাণ্ড মিলিটারি গানশিপ হিন্দ-ডি। গানারের সিটে মিতা। একহাত গান কন্ট্রোল জয়স্টিক-এর ওপর, চাইলেই ব্যবহার করতে পারবে ৩০

এমএম কামান। আরও আছে এক র‍্যাক ভরা এয়ার-টু-গ্রাউণ্ড মিসাইল।

পুরো আড়াই শ' নট গতি তুলেছে হিন্দ। টপ স্পিড।

মৃদু কম্পন এয়ারফ্রেম জুড়ে। হেলিকপ্টারের তুমুল বেগ ও প্রচণ্ড শক্তির জন্যে নিজেকে ক্ষমতাশালিনী মনে হচ্ছে মিতার। যেন প্রাচীন এক জেনারেল, বিশাল স্ট্যালিয়নে চেপে চলেছে মহাযুদ্ধে!

হিন্দ-ডি আকাশে তোলার আগে মিতাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে ইগোর দিমিতভ, কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সব অস্ত্র। এখন টার্গেট যোন-এর কাছে পৌঁছে গেছে ওরা।

শত্রু ঘায়েল করতে তৈরি মিতা। 'এই জিনিস এ দেশে আনলেন কী করে?' জানতে চাইল ইন্টারকমে।

'বড় বাজেটের রাশান সিনেমা করছি, তাই এই জিনিস না আনলে চলবে? কাভার হিসেবে মন্দ নয়,' বলল ইগোর দিমিতভ।

ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাইল মিতা, 'কামানের গোলা আর মিসাইল নকল না তো?'

পেট কাঁপিয়ে হাসল দিমিতভ। উষ্ণ সুরে বলল, 'ভয় নেই, নিশ্চিন্তে থাকুন।'

রকেটের গতি তুলে তৃতীয় টিলা পেরোল ওরা। সামনের দৃশ্য দেখা গেল হেলিকপ্টারের রেইডার স্কোপে।

আকাশে উড়ছে একটা স্কাইক্রেন। ওটার দিকে বাঁক নিল দিমিতভ।

টার্গেটিং ডিসপ্লের হলদের বদলে জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। ফায়ার বাটনে চাপ দিল মিতা। থরথর করে কাঁপল গানশিপ। মস্ত ভ্রমরের ভারী গুঞ্জন তুলে ঘুরছে কামান, কয়েক সেকেণ্ডে ওটা থেকে ছিটকে গেল অন্তত এক শ' গোলা।

আকাশে বাঁকা পথে গিয়ে স্কাইক্রেনের গায়ে বিঁধল

একঝাঁক ট্রেসার। প্রতিটি জ্বলন্ত মার্কারের পর গেছে দশটি বিস্ফোরক গোলা। উড়ন্ত হেলিকপ্টার থেকে ভুস্ করে বেরোল কুচকুচে কালো ধোঁয়া, পরক্ষণে প্রচণ্ড আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়ে ঝরঝর করে মাটিতে পড়ল হাজারো টুকরো।

পরের টার্গেটটি খুঁজল উত্তেজিত মিতা।

খচ্চরের মত দেখতে অত্যাধুনিক সমরযন্ত্রে চেপে আসছে ল্যাং-এর পাঁচ মার্সেনারি। চারপাশে শত শত গুলি লাগছে বলে মাটিতে শুয়ে আছে অসহায় রানা। কিছুই করার নেই। ভাবছে কীভাবে বেরোবে এই গাড্ডা থেকে। এমনসময় টিলা বেয়ে উঠে এল বজ্রপাতের মত বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ।

কানে ঝিঁঝি ধরে গেল রানার। চোখের কোণে দেখল, পুবে কমলা আগুনের মস্ত এক ফুটবল। কয়েক সেকেণ্ড আগেও ওটা ছিল স্কাইক্রেন হেলিকপ্টার।

হঠাৎ কেন বিধ্বস্ত হলো ওটা?

তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচের ক্যানিয়নের দেয়ালে খসে পড়ল দুই ড্রোন।

আর কিছু জানতে চাইল না রানা, মাটি ছেড়ে তীরের বেগে ছুটল টিলার চূড়ার দিকে।

কয়েক ঘণ্টা আগে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রচণ্ড ঢেউয়ের সঠিক সময় জানিয়ে দিয়েছেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান।

ফুরিয়ে আসছে রানার রোলেক্স ঘড়ির কাউণ্ট ডাউন।

হাতে আছে মাত্র দশ মিনিট!

চলে গেছে সিআইএ চিফ মার্ল ক্যালাগু এবং অন্যরা। দরজা বন্ধ হওয়ার আগে এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান দেখলেন রকেট স্লেড। ধ্বংসের ওই যানে শুয়ে আছে মিসাইল।

টেকনিশিয়ানরা তৈরি নির্দেশের জন্যে। একটু পর স্ফটিক নিয়ে পাহাড়ের নির্জন এক এলাকায় বিস্ফোরিত হবে রকেট।

'তুমি বুঝতে পারছ, কীসের ভেতর আমাদেরকে ফেলেছ, জেমস?' ধমকের সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট।

'আমি? আমি কী করলাম?'

'স্ফটিক ধ্বংস করতে যে মিটিং ডাকা হয়েছে, সেখানে ছিলে না। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সারারাত কোনও বার-এ বসে মদ গিলেছ। এখন হাজির হয়েছ পৃথিবীর কোর-এর ফালতু থিয়োরি নিয়ে।'

নিজের এলোমেলো পোশাক ও চেহারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে মিস্টার ব্রায়ানের। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। চোখের নিচে কালির মত দাগ। পুরো দেড় দিন পাল্টাননি বাসি, নোংরা কাপড়চোপড়।

'না ঘুমিয়ে সারারাত কাজ করেছি, যেন...'

তাঁকে থামিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট, 'সমস্যার শেষ নেই তোমার! ক্যালাগুর কাছে শুনলাম, মোটেও ঘুমাও না?'

চুপ করে থাকলেন ব্রায়ান।

'যখন মিটিঙে ঠিক সময়ে এলে না, তোমার স্টাফদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি সুস্থ আছ কি না,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'মিথ্যা বলেনি ওরা। মাসের পর মাস ধরে মিথ্যা আশায় সময় নষ্ট করেছ। উচিত ছিল না দেশকে এত বড় বিপদে ঠেলে দেয়া।'

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, জেনে বুঝে...'

'নরকের ওই স্ফটিক এ দেশে এনেছ, তাতেই শখ মেটেনি, লোক পাঠিয়ে দিয়েছ আরও ওই জিনিস খুঁজতে,' ধমকের সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'মানা করেছিলাম, যাতে মিতা দত্তকে উদ্ধার করতে গিয়ে বিপদে না পড়ো। বারবার ঝুঁকি নিয়েছি তোমার জন্যে। অথচ একবারের জন্যে বোঝোনি, তোমার

উচিত নয় আমার কাছে মিথ্যা বলা।'

'আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি...'

'মিথ্যা বন্ধ করো, জেমস! সবাইকে মস্ত ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছ! এতে হয়তো ক্ষতি হবে গোটা দুনিয়ার! আমি জানতে চাই, কেন এসব করলে তুমি!'

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট...'

'কেন!' ধমকে উঠলেন সিনিয়র বন্ধু। 'কিছু গোপন করছ!'

'কিছুই...'

প্রেসিডেন্টের চেহারায় ফুটে উঠেছে প্রচণ্ড ক্রোধ। আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার অবসর নেবে এনআরআই চিফের পদ থেকে।' কয়েক সেকেণ্ড বিরতির পর অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় জানালেন, 'ক্যালাগুকে আমার সামনে আসতে বলো।'

পঞ্চাশ

রাশান গানশিপের কামান লাল আগুন উগরে দিতেই মিতা দেখল, গোলার প্রচণ্ড আঘাতে ছিঁড়ল দ্বিতীয় স্কাইক্রেনের পাতলা দেহ। ফিউজেলাজ ভেদ করে টেইল রোটর উপড়ে নিয়েছে, ফলে কয়েক টুকরো হয়ে টিলার ঢালে পড়ে বিস্ফোরিত হলো কপ্টার।

'তৃতীয়টা পালিয়ে যাচ্ছে,' বলল ইগোর দিমিতভ। ঘুরে গেছে শেষ উড়ন্ত শত্রুর দিকে।

'বাদ দিন,' বলল মিতা। 'টিলায় উঠছে ল্যাং-এর লোক।'

হিন্দ-ডির ক্যামেরায় রয়েছে টেলিস্কোপিক লেন্স, ওটা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায় চারপাশ। ফলে বন্ধু বা শত্রু চেনা সহজ। টেলিস্কোপিক লেন্স ব্যবহার করে জমিতে শুধু ল্যাং-এর লোক এবং যান্ত্রিক কয়েকটা খচ্চর দেখল মিতা।

'সর্বনাশ!' বলল ফিসফিস করে।

ইন্টারকমে শুনতে পেয়ে জানতে চাইল ইগোর, 'এদের আশপাশে নেই তো মাসুদ রানা?'

কেউ বা কিছুর পেছনে ছুটছে ল্যাং-এর মার্সেনারি আর্মি। একটু পর উঠে পড়বে টিলার চূড়ায়।

'না, নেই, তবে জিজ্ঞেস করছেন কেন?' পাল্টা জানতে চাইল মিতা।

'কারণ, আমরা সামনের জমি পেছনে ফেললে, তখন আর জীবিত কিছুই থাকবে না।'

'বুঝলাম। প্রতিশোধ নেবেন ভাইয়ের মৃত্যুর।'

পঞ্চাশ ডিগ্রি বাঁক নিল ইগোর দিমিতভ। সরাসরি সামনে পড়বে একদল মার্সেনারি ও যন্ত্রমানব। নাক নিচু করে তাদের দিকে তেড়ে গেল হিন্দ-ডি। কামান তৈরি রাখল মিতা।

পেছনে বাজ পড়া আওয়াজে চমকে ঘুরে তাকাল ল্যাং-এর আর্মি। দেরি হলো না গানশিপের দিকে গুলি পাঠাতে।

ওদিকে কামানের ট্রিগার টিপে ধরেছে মিতা। একইসময়ে আকাশে ছাড়ল এয়ার-টু-গ্রাউণ্ড একরাশ মিসাইল।

ঘুরন্ত কামান থেকে প্রতি পাঁচ সেকেণ্ডে বেরোচ্ছে এক শ' গোলা। এদিকে ডান ও বামে টার্গেট করা জমিতে আঘাত হানল মিসাইল। প্রচণ্ড সব বিস্ফোরণে কাঁপতে লাগল চারপাশ। নানা দিকে লাফ দিল কমলা আগুন। জ্বলন্ত পাথর ও মাটির সঙ্গে মিশে ছিটকে উঠল ছিন্নভিন্ন মানুষের পোড়া মাংস।

ওই এলাকা পেরিয়ে ধোঁয়া ও আগুন থিতিয়ে আসবে বলে থেমে অপেক্ষা করল হিন্দ-ডি।

তখনই মিতা দেখল, রয়ে গেছে আরেকদল লোক। 'বামদিকে!' বলে উঠল ও। 'টেন ও' ক্লক! সাবধান!'

হিন্দ-ডি সরিয়ে নেয়ার আগেই এল প্রতিপক্ষদের গুলি। কিন্তু জমির খুব কাছে নেমে যুদ্ধের জন্যে তৈরি করা হয়েছে হিন্দ-ডি গানশিপ। শক্তিশালী রাইফেলের গুলি অনায়াসে ছিটকে দিল ওটার আর্মার। তবে অন্য জিনিস রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড। ফাটল মিতাদের মাথার ওপরের রোটরে।

উইণ্ডশিল্ড ভরে গেল তপ্ত তেল ও লেলিহান আগুনে। ভক্ করে ককপিটে ঢুকল একরাশ কালো ধোঁয়া। চাকা হারিয়ে বসা ছুটন্ত গাড়ির মত হোঁচট খেল গানশিপ।

ওটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইল দিমিতভ। কিন্তু ভালভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রোটর।

চিৎকার করল প্রাক্তন এজেন্ট, 'শক্ত হাতে কিছু ধরুন!'

পানি থেকে ওঠা বিরক্ত কুকুরের মত বারকয়েক ঝটকা দিল গানশিপ, তারপর এক পাশে কাত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলল মাটি লক্ষ্য করে।

ব্যক্তিগত স্কাইক্রেনে বসে রাশান গানশিপ পড়তে দেখল হুয়াং লি ল্যাং। ভাল লড়াই করেছে তার লোক। 'ঘুরে এগিয়ে যাও,' পাইলটকে নির্দেশ দিল সে।

'লোক তুলে নেব?'

'না, পেরিয়ে যাও টিলার চূড়া।'

মেসার ওপর এক লোককে দেখেছে ল্যাং।

লম্বা লম্বা পায়ে ছুটছে ওই বদমাশ।

'ওই লোককে চাই!' গর্জে উঠল ল্যাং, 'ধাওয়া করে ধরো ওকে!'

লক্ষ্যবস্তু পেয়ে হেলিকপ্টারের গতি বাড়াল পাইলট। ভীত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমাদের কাছে তো কোনও অস্ত্র নেই!'

ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচাল ল্যাং, 'ওর কাছে নিয়ে যাও, নিজের হাতে খুন করব ওকে!'

অন্ধকারাচ্ছন্ন ইয়াকা মাউন্টেনের গভীর সুড়ঙ্গে দাঁড়িয়ে ট্রেইলার থেকে এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ানকে নামতে দেখলেন সিআইএ চিফ মার্ল ক্যালাগু। তাঁর শত্রুর কাঁধে বেকায়দাভাবে ঝুলছে কোঁচকানো সুট জ্যাকেট। স্লথ গতি হাঁটার। যাক, ভাল, শেষপর্যন্ত ব্যাটা হেরে গেছে, ভাবলেন ক্যালাগু।

'প্রেসিডেন্ট কী বললেন?' জানতে চাইলেন। ভাল করেই জানেন, যিরো আওয়ার আসতে বাকি মাত্র পাঁচ মিনিট।

'আপনিই জিতলেন,' রকেট স্লেডের দিকে মাথা কাত করে ক্লান্ত স্বরে বললেন ব্রায়ান, 'তৈরি রাখুন ওটা।'

মস্ত রেকার টো ট্রাকের দিকে চলেছেন। ওই জিনিসই টেনে এনেছিল ট্রেইলার।

ব্রায়ানের দিকে চেয়ে আছেন ক্যালাগু, মুখে মুচকি হাসি। বিশাল জয় পেয়েছেন আজ। স্টাফদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'বাকি চার মিনিট। স্লেড রেডি রাখো। কাজ শেষ করতে হবে দেরি না করে।'

ট্রেইলারে গিয়ে উঠলেন ক্যালাগু। চোখ পড়ল মনিটরের ওপর।

চেহারায় গনগনে রাগ নিয়ে তাঁকে দেখলেন প্রেসিডেন্ট। 'এত সময় নিলেন কেন!'

'ব্রায়ান এইমাত্র জানালেন,' বললেন ক্যালাগু, 'এবার আগামী দু'মিনিটের ভেতর ধ্বংস হবে ওই স্ফটিক।'

'গুড। কাজটা শেষ হলে আমাকে জানাবেন।'

ক্যামেরার সামনে থেকে সরে গেলেন প্রেসিডেন্ট। অফ হয়ে গেল স্ক্রিন। ল্যাব সেকশনের দরজা খুলে ভেতরে পা রেখে চমকে উঠলেন ক্যালাগু। ভেতরে জ্বলছে না বাতি। আলো

আসছে শুধু কমপিউটারের স্ক্রিন থেকে।

স্ফটিক দেখার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে গিয়ে আরেকটু হলে হোঁচট খেয়ে পড়তেন ক্যালাগু।

'আরে, কী ব্যাপার?'

নিচে চেয়ে দেখলেন আঙুরের রসের ভেতর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন বিজ্ঞানী ক্যাথিবা আলিহা। প্রায় অচেতন। কপালে কালশিটে।

'কী হয়েছে?' চমকে গিয়ে জানতে চাইলেন ক্যালাগু।

গুঙিয়ে উঠে চোখ মেললেন বিজ্ঞানী। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই বুঝে গেলেন ক্যালাগু। লাফ দিয়ে উঠলেন প্ল্যাটফর্মে। ভল্টে এখন আর নেই ব্রাযিল স্টোন!

আহত বিজ্ঞানীকে সাহায্য না করেই এক দৌড়ে ট্রেইলের সামনের অংশে ফিরলেন ক্যালাগু, পরক্ষণে দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এলেন দীর্ঘ সুড়ঙ্গে।

গুড়গুড় আওয়াজ তুলে দূরে ছুটছে বক্স ট্রাক। ওটাতে আছে এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান!

'ঠেকাও ওই ট্রাক!' চিলচিৎকার ছাড়লেন ক্যালাগু, 'ব্রায়ানের কাছে ব্রাযিল স্টোন!'

একান্ন

পেছনে কারা যুদ্ধে মেতেছে, দেখার সময় নেই রানার। টিলার চূড়ায় উঠেই থমকে গেল। সামনেই মস্ত হাঁ মেলেছে বিশাল এক বৃত্তাকার গহ্বর। ঢালু দেয়াল নেমেছে অন্তত তিন শ' ফুট। এত

ওপর থেকে মনে হলো, ওটা উন্মুক্ত খনির প্রকাণ্ড মুখ। নিচে গিয়ে ঢালু দেয়াল মিশেছে নিথর জলের সুনীল এক লেকে।

'নামতে হবে,' বিড়বিড় করল রানা।

লেকের মাঝে বিশ ফুট বৃত্তাকার, পাথুরে, সমতল ছোট্ট দ্বীপ। আর্কিওলজিস্ট প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন গতরাতে বলেছিলেন ওটার কথা। লেক ফুঁড়ে উঠেছে। এক পাশের সিঁড়ি নেমেছে লেকের জলে। সাঁতরে গিয়ে উঠতে হবে ওই দ্বীপে।

চারপাশে চোখ বোলাতেই একটু দূরে সরু একটা পথ দেখল রানা। কিন্তু ওই পথে যাওয়ার সময় ওর হাতে নেই। ঢালু দেয়াল বেয়ে পিছলে নামল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর থামল প্রায় খাড়া এক জায়গায়। তখনই বজ্রপাতের আওয়াজ তুলে মাথার ওপর স্থির হলো কী যেন!

মুখ তুলে তাকাল রানা, টিলা টপকে হাজির হয়েছে ল্যাং-এর স্কাইক্রেন হেলিকপ্টার। খুলে গেছে দরজা। এবার ওকে গেঁথে ফেলবে স্নাইপার। কিন্তু বিস্মিত হলো রানা। দরজায় থেমেছে রুপালি চকচকে আর্মার পরা এক লোক!

কিছু ভাবার আগেই তিরিশ ফুট ওপর থেকে লাফিয়ে ভারী পাথরের মত নেমে এল সে। রানা সরার আগেই দু'জনের বুকে লাগল বেকায়দা ধাক্কা। ভারসাম্য হারিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ওরা!

গানশিপ নিয়ন্ত্রণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ইগোর দিমিতভ, কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে ইঞ্জিনের। বিকট জোরালো ধুপ শব্দে মেসার ঘাসে পড়ে পঞ্চাশ ফুট পিছলে থামল হিন্দ-ডি।

সিটবেল্ট বাঁধা বলে ছিটকে উইণ্ডশিল্ডে পড়েনি মিতা। হার্নেস থেকে নিজে মুক্ত হয়ে খুলে দিল ইগোর দিমিতভের সিটবেল্ট। বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার থেকে নেমে পড়ল দু'জন। এদিকে চড়-চড় শব্দে পুড়তে শুরু করেছে হিন্দ-ডি।

বিশ ফুট যেতেই খেয়াল করল মিতা, খুঁড়িয়ে হাঁটছে ইগোর দিমিতভ। জানতে চাইল ও, 'আপনার কী হয়েছে?'

মৃদু মাথা নাড়ল রাশান। 'ভেঙে গেছে ডান গোড়ালি। আমার লড়াই শেষ।'

উপত্যকার যেদিকে দেখেছে ল্যাং-এর লোক, ওদিকে তাকাল মিতা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আপনার পিস্তলটা দিন।'

বিনা-বাক্যে কোমরে গোঁজা ম্যাকারভ মিতার হাতে দিল ইগোর দিমিতভ।

ক্রল করে পৌঁছে বোল্ডারের মাঝ দিয়ে উঁকি দিল মিতা। বুকে টের পেল স্বস্তির ঝিরঝিরে ঢেউ। ফিরতি পথে চলেছে ল্যাং-এর লোক। যুদ্ধ শেষ তাদেরও।

আবারও ইগোর দিমিতভের কাছে ফিরল মিতা। 'এদিকটা নিরাপদ। অপেক্ষা করুন। কাজ শেষ হলে রানাকে নিয়ে ফিরব। তারপর দেখব ভাঙা গোড়ালির কী করা যায়।'

'আপনার যেতে হবে টিলার পশ্চিমে।'

ওদিকে তাকাল মিতা। এক হাজার গজ দূরে টিলার চূড়ায় ভাসছে তৃতীয় স্কাইক্রেন হেলিকপ্টার। আকাশে ঘুরছে শামুকের গতি তুলে। ওদিকে কোথাও নেই রানা। তবে ওর আর ভাসমান হেলিকপ্টারের মাঝে মেসা ধরে ছুটছে খুব ছোট কেউ! উচ্চতা তার তিন ফুট!

পিচ্চি পাবলো!

পুরো এক শ'ফুট পিছলে ও গড়িয়ে এবড়োখেবড়ো কিছু পাথরের সরু এক কার্নিশে থামল রানা। পাশেই হুয়াং লি ল্যাং!

সামনে বেড়ে আছে কার্নিস। সরাসরি দু' শ'ফুট নিচে নীল লেক।

একইসময়ে পাথুরে জমি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা ও ল্যাং।

লাফ দিয়ে এগোল রানা। হামলাকারীর বুকে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসাল। কিন্তু ওটা অনায়াসে ঠেকাল শত্রুর আর্মার পরা কবজি। পরক্ষণে ঘুষি মারল লোকটা।

ওটা ভীষণ মারাত্মক!

ভুস্ করে বেরোল রানার বুকের সমস্ত বাতাস। টলতে টলতে পা পিছলে চিত হয়ে পড়ল ও। জীবনে অনেক লড়াই করেছে, কিন্তু আগে জানত না কেউ এত ব্যথা দিতে পারে!

ল্যাং-এর শক্তি ভবিষ্যতের দানবীয় কোনও রোবটের মত!

ধড়মড় করে উঠে সরতে চাইল রানা। কিন্তু সামনে বেড়ে খপ্ করে ওর কলার চেপে ধরল লোকটা। পরক্ষণে তুলে ফেলল শূন্যে।

ভেজা বেড়ালের মত করুণভাবে ঝুলছে রানা। বিস্মিত চোখে দেখল, ভঙ্গুর দেহের লোক হুয়াং লি ল্যাং। কিন্তু নানাদিকের হাইড্রলিক অ্যাকচুয়েটর, প্যাডিং ও আর্মার তাকে করে তুলেছে খেপা মোষের মতই শক্তিশালী।

'তুমি আসলে খুব সামান্য মানুষ,' কর্কশ স্বরে বলল লোকটা।

সত্যি কথা, হাড়ে হাড়ে বুঝেছে রানা। ঝুলতে ঝুলতে ঘুষি মারল শত্রুর ঘাড়ের পাশে। কিন্তু আরেক হাতে মুহূর্তে ঘুষি ঠেকিয়ে দিল ল্যাং। নির্বিকার সুরে বলল, 'যা চাই, ওটা দিয়ে দাও। তা হলে সহজে মরতে পারবে।'

'মরতে চাই কে বলল তোমাকে?' দাঁতে দাঁত চেপে লোকটার অণ্ডকোষ লক্ষ্য করে কষে লাথি ছুঁড়ল রানা।

খটাং শব্দে লাগল জায়গা মত!

কিন্তু রানার মনে হলো পায়ের টনটনে ব্যথায় দু'ভাঁজ হবে ও। সংবেদনশীল অঙ্গ স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে বাঁধিয়ে এসেছে হারামজাদা আধা রোবট ব্যাটা!

'দাও ওই স্ফটিক!' কড়া ধমক দিল হুয়াং লি ল্যাং।

লজ্জাজনকভাবে হেরে গেছে অসহায় রানা। নরম সুরে বলল, 'আগে পিঠ থেকে নামাতে হবে ব্যাকপ্যাক।'

ধপ্ করে ওকে সামনে নামাল ল্যাং। 'কই?'

পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাক খুলল রানা, পরক্ষণে ল্যাং-এর কানের তিন ইঞ্চি দূর দিয়ে ওটা ছুঁড়ল সংকীর্ণ কার্নিশে। বদমাশটাকে পাশ কাটিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল। এবার ব্যাকপ্যাক তুলে নিয়েই একটু দূরের ঢালু দেয়াল বেয়ে সরসর করে নামবে। তুলল ওটা...

কিন্তু ঝড়ের গতি শক্রর। ঘুরেই ল্যাং মারল হুয়াং লি ল্যাং!

কিছু বোঝার আগেই হোঁচট খেল রানা। তাল হারিয়ে খসে পড়ল কার্নিশের কিনারা থেকে!

আঁকড়ে ধরেছিল বলে সঙ্গে চলেছে স্ফটিক রাখা ব্যাকপ্যাক।

দুই শ' ফুট নিচে লেকের সুনীল জল!

সাঁই-সাঁই করে নামছে রানা। কানের পাশে শোঁ-শোঁ শব্দ!

এদিকে প্রচণ্ড রাগে কর্কশ একটা গর্জন ছাড়ল হুয়াং লি ল্যাং।

সামান্য লোক মাসুদ রানা ঠকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার স্ফটিক!

বিশাল লাফে কিনারা পেরিয়ে গেল সে, চলেছে সোজা লেক লক্ষ্য করে!

ক'সেকেণ্ড পর বুঝল, দু'শ' ফুট উঁচু কার্নিশ থেকে পড়েই তীরের মত লেকের জলে তলিয়ে গেছে রানা!

স্বচ্ছ কাঁচের মত জলে এখন অসংখ্য বৃত্তাকার ঢেউ!

তিন সেকেণ্ড পর একই আলোড়ন তৈরি করল ল্যাং।

ওদিকে লেকের পঞ্চাশ ফুট নিচে তলিয়ে গেছে রানা। ওপরে শুনেছে জোরালো, ভোঁতা ঝপাৎ শব্দ। হাল ছাড়েনি চাইনিজ দানব! রানা বুঝে গেছে, বাঁচতে হলে সরে যেতে হবে। তবে নড়ার আগেই দেখল, হাজির হয়েছে ল্যাং!

তার আর্মার সুট ওঅটারপ্রুফ!

ওপরে উঠতে প্রাণপণে দু'পা ছুঁড়ল রানা।

কিন্তু হাত বাড়িয়ে ওর গোড়ালি ধরে ফেলেছে চাইনিজ বিলিয়নেয়ার।

বাম পায়ে তার ঘাড়ে দুর্বল লাথি মারল রানা। দম ফুরাবার আগেই উঠতে হবে ওপরে!

একই কাজ করত হুয়াং লি ল্যাং, কিন্তু আর্মার, হাইড্রলিক ও ব্যাটারি প্যাক-এর ভারী ওজন কমপক্ষে এক শ' পাউণ্ড!

গোড়ালি খামচে ধরে রানাকে টেনে নিয়ে ভারী পাথরের মত চলল সে লেকের তলদেশে!

হামভিতে চেপে জেমস ব্রায়ানের পিছু নিয়েছে সিআইএ চিফ মার্ল ক্যালাগু। পেছনের এয়ার ফোর্সের এসপির উদ্দেশে ঘেউ করে উঠল, 'গুলি কর্! খুন কর্, শালা, হারামজাদাকে!'

হামভির পাশ দিয়ে রাইফেলের নল বের করে গুলি করল সৈনিক। কিন্তু ট্রাকের ক্যাবের পেছনে ব্রাযিল স্টোন রাখার ভারী ভল্ট। রাইফেলের গুলির সাধ্য নেই লক্ষ্যভেদ করবে, স্টিলের দেয়ালে লেগে নানান দিকে ছিটকে পড়ছে ঠুং-ঠাং শব্দে।

তুমুল বেগে ছুটছে দ্বিতীয় হামভির ড্রাইভার। গুলির জন্যে খুঁজছে ভাল অ্যাংগেল। কিন্তু বারবার ট্রাক এদিক-ওদিক সরিয়ে নিচ্ছেন ব্রায়ান। মস্ত ট্রাকের লেজ দিয়ে টানেলের দেয়ালে পিষে দিতে চাইলেন হামভিটাকে।

অন্ধকার সুড়ঙ্গে ছিটকে উঠল কমলা ফুলকি।

নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল হামভি, তিন গড়ান দিয়ে লাগল গিয়ে ওদিকের দেয়ালে। তার আগে ধাক্কা দিয়েছে ক্যালাগুর হামভির নাকে।

কাত হতে শুরু করেও শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সামলে নিল ক্যালাগুর ড্রাইভার। পেছনে ফেলে এল বিধ্বস্ত হামভি।

এই ধাওয়ায় অংশ নিয়েছে তৃতীয় হামভি। কিন্তু ঝড়ের গতি তুলে ছুটে চলেছেন ব্রায়ান। গতি আরও বাড়ছে ট্রাকের।

'চাকা লক্ষ্য করে গুলি!' গলা ফাটাল ক্যালাগু। 'থামাতে হবে হারামজাদাকে, নইলে আমরা সবাই শেষ!'

তার কথা শেষ হতে না হতেই গোটা কমপ্লেক্স জুড়ে শুরু হলো কর্কশ অ্যালার্ম। ওটা ছাপিয়ে এল কমপিউটারাইয্‌ড্ এক নারীর মিষ্টি কণ্ঠ: 'One minute to EM Burst Event. Shut down all electrical systems. Repeat, shut down all electrical systems.'

হামভির ক্যাবে আছে ডিজিটাল রিডআউট। চট্ করে ওটা দেখল ক্যালাগু। মরা কাঠের মত শুকিয়ে গেল গলা।

সুড়ঙ্গের মাঝে রিনরিনে নারীকণ্ঠ অনুত্তেজিত স্বরে বলল, 'Fifty-five… fifty-four… fifty-three.'

ক্যালাগু দূরে দেখল সুড়ঙ্গের মুখে ঝকঝকে সাদা আলো।

ওখানে কোনওভাবেই পৌঁছুতে দেয়া যাবে না ব্রায়ানকে!

'বন্ধ করো দরজা!' রেডিয়োতে চিৎকার ছাড়ল ক্যালাগু, 'বন্ধ করো নরকের দরজা!'

টাইটানিক জাহাজের গতি তুলে তলিয়ে চলেছে রানা। টের পাচ্ছে চাপ বাড়ছে কানের ওপর। খামচে ধরতে চাইল একটু দূরের খাড়া দেয়াল। কিন্তু মসৃণ গ্র্যানেট পাথরে নেই ফাটল বা ভাঁজ!

রানার গোড়ালি শক্ত করে ধরেছে ল্যাং-এর যান্ত্রিক হাত। নেমে চলেছে ওরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে!

মুক্ত পায়ে ল্যাং-এর বুকে লাথি মারল রানা। কিন্তু তাতে ওই পা-ও ধরতে চাইল দানবটা। সফল হলো না দু'জনের কেউই। পাথরের মত নেমে এল ওরা লেকের পাথুরে তলদেশে। জোর ঝাঁকি লেগে ল্যাং-এর হাত থেকে ছুটে গেল

রানার গোড়ালি। কিন্তু তখনই সামনে বেড়ে ওর গলা আঁকড়ে ধরল সে। এবার খুশিমনে ছিঁড়বে কণ্ঠনালী!

খুন হবে, বুঝে গেছে রানা। তবুও ব্যস্ত হয়ে ডানহাতে ধরল ল্যাং-এর ঘাড়ের পাশের হাইড্রলিক পাইপ, পরক্ষণে দিল হ্যাঁচকা টান।

সরু সব তার মোড়া পাইপ, ছিঁড়ল না।

রানার কণ্ঠনালীতে বাড়ল ল্যাঙের আঙুলের চাপ। সময় নিয়ে কষ্ট দিয়ে ওকে খুন করতে চায় লোকটা!

দু'হাতের সমস্ত জোর খাটিয়ে মোড়ানো তার বিশ্রীভাবে মুচড়ে দিল রানা।

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাইড্রলিক অ্যাকচুয়েটর সিস্টেম। খুলে গেল হুয়াং লি ল্যাঙের মুঠি। ওর পেটে একটা লাথি মেরে সরে গেল রানা। প্রাণপণে হাত-পা নেড়ে উঠে যেতে লাগল ওপরে। একটু পরেই ফুরাবে ফুসফুসের সব বাতাস। উঠতে উঠতে একবার তাকাল নিচে।

পাথুরে মেঝে ছেড়ে উঠে আসতে চাইছে হুয়াং লি ল্যাং। ক'সেকেণ্ড পর বুঝল, এত ওজন নিয়ে ভেসে ওঠা অসম্ভব। পাগল হয়ে উঠল সে। তাকাল মসৃণ দেয়ালের দিকে! ভয় পেয়েছে ভীষণ। তাড়াহুড়ো করে খুঁজতে চাইল অন্য উপায়। কিন্তু তার জন্যে খোলা নেই কোনও পথ। অসহায় চোখে তাকাল ওপরে।

ওই যে উঠে যাচ্ছে বদমাশ মাসুদ রানা!

এদিকে বুক আঁকড়ে আসছে রানার। অক্সিজেনের অভাবে যে-কোনও সময়ে জ্ঞান হারাবে। উঠছে পূর্ণ গতি তুলে।

পাঁচ সেকেণ্ড পর ভুস্ করে ভেসে উঠল গভীর লেকের খাড়া কিনারায়। বিষাক্ত কার্বন-ডাইঅক্সাইড ছেড়ে বুক ভরে নিল তাজা অক্সিজেনে। বিশ্রাম নেয়ার সময় নেই। রওনা হলো সেনোটের মাঝের দ্বীপ লক্ষ্য করে।

স্ট্যাটিকের চড়-চড়ে অনুভূতি, খুব শিরশির করছে শরীর। দুই মায়ান স্ফটিক শুরু করছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিচ্ছুরণ। অস্থির হয়ে নাচছে লেকের জল। গভীর থেকে এল গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

দ্বীপের পাশে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল রানা। টলতে টলতে উঠে গেল ওপরে। পৌঁছুল মাঝের কূপের পাশে।

সামনেই প্রফেসরের সেই দেহ উৎসর্গের আয়না।

কূপের ভেতর চোখ বোলাল রানা। তলা থেকে আসছে ভীষণ কোনও কম্পন, ফলে ওর দেহ জুড়ে শুরু হয়েছে টনটনে ব্যথা। মাথার ভেতর ভয়ঙ্কর গুঞ্জন। ওর মনে হলো, সব ছাপিয়ে আসছে মস্ত, বিরাট এক ঢেউ।

চোখের কোণে কিছু নড়তে দেখল রানা। ঘুরে তাকাল তীরের দিকে। ঢালু পাথুরে দেয়াল বেয়ে নেমে আসছে পাবলো!

আরে! ছেলেটা এখানে এল কী করে? –ভাবল রানা।

পাবলো এসে থামল লেকের তীরে। হাত বাড়িয়ে পানি থেকে তুলে নিল রানার ভাসমান ব্যাকপ্যাক।

টান দিয়ে খুলছে ওটার চেন।

'না, পাবলো!' তীব্র ব্যথা সহ্য করে প্রাণপণে চেঁচাল রানা। 'সরে যাও!'

কিছুই শুনল না পিচ্চি পাবলো। ব্যাগে ভরে দিয়েছে হাত। বের করে নিল সীসা দিয়ে বাঁধানো বাক্স। ওটা থেকে নিয়ে অবাক চোখে দেখল চকচকে স্ফটিক, যেন পেয়েছে স্বর্গীয় কিছু।

পরবর্তী আওয়াজের ঢেউ এল প্রচণ্ড বেগে। থরথর করে কাঁপল চারপাশ। প্রচণ্ড ব্যথার মধ্যেও পাবলোর দিকে চেয়ে আছে রানা। ছেলেটার অল্প দূরে দেখতে পেল মিতাকে। প্রায় দৌড়ে নেমে আসছে ও। চোখ পাবলোর ওপর।

আবারও এল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক আরেকটি ঢেউ। এবার আরও ভয়ঙ্কর। জোরালো ভূমিকম্পে থরথর করে কাঁপল

দুনিয়া। ছোট্ট দ্বীপ ভাসিয়ে নিতে উঠে আসছে লেকের জলরাশি।

যেন চুরমার হচ্ছে গোটা পৃথিবী। প্রবল ভূকম্পনে ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেল রানা। ক্রল করে পৌঁছুল কূপের কপিকলের সামনে।

ওটা ব্যবহার করতে বলেছেন প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন।

তুমুল বেগে চলেছে প্রকাণ্ড ট্রাক, মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর চেপে রেখেছেন ব্রায়ান। অবাক হলেন, বুজে আসছে সামনের আলো!

বন্ধ হচ্ছে ইয়াকা মাউন্টেনের সুড়ঙ্গের প্রকাণ্ড দুই কবাট!

'Twenty-nine... twenty-eight... twenty-seven.'

সুড়ঙ্গ মুখে এক পাশে রাখা খোঁড়ার মেশিনটা পেরিয়ে গেলেন ব্রায়ান। অনেকটা চওড়া হলো সুড়ঙ্গ। একইসময়ে বাম থেকে ক্যাবের পাশে পৌঁছুল দ্বিতীয় হামভি। বিশাল ট্রাক নিয়ে ওটার দিকে চেপে এলেন ব্রায়ান।

একরাশ গুলি ঢুকল ক্যাবে। গাল কুঁচকে ফেললেন ব্রায়ান। এইমাত্র উড়ে গেছে রিয়ার ভিউ মিরর। তাঁর ডান বাহুতে লাগল একটা বুলেট। হাত থেকে ছুটে গেল স্টিয়ারিং হুইল।

তখনই হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হলো ট্রাকের সামনের একটা চাকা। বাঁক নিল যন্ত্রদানব, তাল হারিয়ে কাত হয়ে পড়ল রাস্তার ওপর। কর্কশ ধাতব আওয়াজ তুলে ছেঁচড়ে চলেছে প্রবেশ পথের দিকে। কিন্তু থেমে গেল এক্সিট ডোর থেকে বিশ ফুট আগে।

মিষ্টি সুরে জানাল কমপিউটারাইয্ড্ নারীকণ্ঠঃ 'Twenty-three... twenty-two... twenty-one.'

ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের প্লাস্টিক মেশানো কাঁচ লেগে কেটে গেছে ব্রায়ানের মুখ, দরদর করে পড়ছে রক্ত। বুজে গেছে ডান চোখ। বাম চোখে বাইরে তাকালেন। ভাবলেন, এখনও একটা সুযোগ

আছে!

মেঝে থেকে কোট তুলে ক্রল করে বেরোলেন বিধ্বস্ত ট্রাক থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে চললেন একটু দূরের আলোর দিকে।

অ্যালার্মের তীব্র আওয়াজের ওপর দিয়ে শুনলেন:

'Nineteen... eighteen...

হঠাৎ এক পা-ও আর এগোতে পারলেন না ব্রায়ান। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন প্রায় বুজে আসা চোখে।

পেছন থেকে টাই টেনে ধরেছে সিআইএ চিফ ক্যালাগু। ভাব দেখে মনে হলো, এইমাত্র খুঁজে পেয়েছে অবাধ্য কুকুরকে।

'দেরি করে ফেলেছ,' কর্কশ স্বরে বলল ক্যালাগু। কেড়ে নিল ব্রায়ানের হাতের কোট। একইসময়ে ধুম করে ধাতব আওয়াজ তুলে বন্ধ হলো সুড়ঙ্গ-মুখের ভারী দুই স্টিলের কপাট।

দ্রুত হাতে ব্রায়ানের কোট সার্চ করল ক্যালাগু।

কিছুই নেই ভেতরে!

'Fifteen... fourteen...

'এখানেও কিছুই নেই!' বিধ্বস্ত ক্যাব থেকে উঁকি দিল এক গার্ড।

'কোথায় ওটা?' চিৎকার করে জানতে চাইল ক্যালাগু।

করুণ চেহারায় তাকে দেখলেন পরাজিত ব্রায়ান। তবে শান্ত স্বরে বললেন, 'ওটা আমার কাছে নেই।'

দ্বিধা-ভয় ক্যালাগুর চোখে-মুখে। তারপর হঠাৎ করেই বুঝে গেল সব। ঝট্ করে ঘুরে তাকাল গভীর সুড়ঙ্গের দিকে।

'ক্যাথিবা আলিহা!'

ইয়াকা মাউন্টেনের সুড়ঙ্গে বহু দূরে স্টিলের মই বেয়ে প্রায় চূড়ার কাছে পৌঁছেছেন রেড ইণ্ডিয়ান বিজ্ঞানী ক্যাথিবা আলিহা। কয়েক শ' ফুট নিচে সুড়ঙ্গের মেঝে, পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু, তবুও

তাঁর বুকে কোনও ভয় নেই। শুনলেন আরও জোরালো হয়ে বাজছে অ্যালার্ম। বেশ কয়েক ধাপ উঠে হ্যাচ খুলবেন, এমনসময় শুনলেন: ‘Three…’

অন্ধকার সুড়ঙ্গ ছেড়ে সূর্যের আলোয় বেরোতে হবে!

শুনলেন মিষ্টি নারীকণ্ঠ: ‘Two…’

ন্যাভেজো গালি বকে ঝট্ করে খুললেন হ্যাচের দরজা। চোখে পড়ল ন্যাভেজো সূর্যের কড়া সোনালি রশ্মি। ছিটকে বেরিয়ে এসে পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলেন ক্যাথিবা আলিহা, হাতে সেই স্বচ্ছ ব্রাযিল স্টোন। পেছনে শুনলেন মিষ্টি কণ্ঠ: ‘One…’

‘যা আছে কপালে!’ বিড়বিড় করে কূপের লিভার টানল রানা।

খুলে গেছে লিভারের কাউন্টারওয়েইট। প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে কপিকল। তুমুল বেগে নেমে গেল ভারী পাথরের স্তূপ, একই বেগে উঠে এল কূপের পাশে ধাতব একটা বাটি।

পলকের জন্যে ওটার ভেতর স্ফটিক দেখল রানা।

যেন স্থির হয়ে গেছে গোটা পৃথিবী।

অবাক হয়ে রানা দেখল, কিছুই ঘটছে না।

পরক্ষণে জীবনের বড় একটা শখ পূরণ হলো ওর।

নিচ দিয়ে যাওয়া কবুতরের মত সাঁই-সাঁই করে উড়ে চলল রানা। মাত্র কয়েক ফুট নিচেই বিক্ষুব্ধ নীল লেক। তীব্র যন্ত্রণা মিলিয়ে গেলে ভাবত, ও আছে স্বর্গে!

বুঝবার আগেই এক পলকে তীরের কাছে পৌঁছে গেল রানা। ঝপাস্ করে পড়ল পানির ভেতর। কান-মাথার যন্ত্রণায় মনে হলো মারা পড়বে ও।

শুরু হয়েছে আরও ভয়ঙ্কর কী যেন!

বিকট আওয়াজে থরথর করে কাঁপছে দুনিয়া।

প্রচণ্ড ব্যথায় রানার শরীর থেকে হারিয়ে গেল সমস্ত শক্তি।

চারপাশ থেকে আসছে জোরালো গুমগুম আওয়াজ!

তলিয়ে যেতে লাগল রানা। চেতনা হারাতে হারাতে ভাবল, তা হলে এই পাহাড়ি লেকেই ছিল মৃত্যু?

পানির নিচেও একই গর্জন!

তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল সব আওয়াজ।

রানা টের পেল, লেকের তীরের কাছে অগভীর জলে ঠেকে গেছে ওর পা! নাক ডুবে আছে, কিন্তু চোখদুটো দেখছে একটু দূরের ঢালু দেয়ালের পার।

'রানা!' ডাকল কে যেন।

চেনা মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনে সামান্য ঘুরে তাকাল ও।

তীরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মিতা!

হঠাৎ কোত্থেকে যেন জোর পেল রানা, কয়েক পা হেঁটে উঠল অগভীর একটি ধাপে। পরক্ষণে পা রাখল ওপরের পাথুরে জমিতে। 'উড়তে শুরু করলে কী হয়েছিল?' জানতে চাইল।

'তার আগে সঠিক জায়গায় তুলেছিলে স্ফটিক,' বলল মিতা। ভীষণ অগোছালো। কালো আকাশের মতই কালিমাখা।

তবুও ওকে দারুণ সুন্দর লাগল রানার।

'তারপর পুরো এক শ' ফুট উড়ে এলে। জলের ভেতর নাক ডুবিয়ে বকের মত কী যেন ভাবছিলে। ওই মেয়ে দারুণ সুন্দরী, তাই না?'

'তুমি উড়ে যাওনি কেন?' জানতে চাইল রানা।

'তুমি ছিলে খোলা জায়গায়। আমার কপাল ভাল, খোঁড়লের মত জায়গায় বড় এক পাথর জাপ্টে শুয়ে ছিলাম। তবে আরেকটু হলে উড়ে যেতাম।' ফ্যাকাসে হয়ে গেল মিতার মুখ। চোখ থেকে পড়ে গাল বেয়ে নামল দুই ফোঁটা অশ্রু। চুপ করে চাইল রানার চোখে।

'কী হয়েছে, মিতা?'

জবাব দিল না মেয়েটা।

নীরবতাই কখনও হয় উত্তর। মিতার জবাব পেয়ে গেছে রানা। একটু দূরে অগভীর এক গর্তের পাশে নিথর পড়ে আছে পিচ্চি পাবলো। ওকে নিয়ে ওই গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল মিতা।

মগজে রাখা স্ফটিকের টুকরোর কারণে দুই কান দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়েছে পাবলোর।

বাচ্চাটার পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। পাল্স্ দেখল।

নেই!

অসহায় পিচ্চি পাবলোর করুণ মৃত্যু খারাপ করে দিয়েছে রানার মন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ তুলে তাকাল। আকাশ প্রায় ছাইয়ের মত। তার বুকে বারবার ঝিলিক দিচ্ছে সাদা-নীল রশ্মি। খুব দ্রুত কমে আসছে ওসব আলো।

'তুমি তো ফিযিসিস্ট, জানো এসব আলো কীসের?' জানতে চাইল রানা।

'অ্যাটমসফেয়ারের চার্জ্ড্ পার্টিক্ল্। ম্যাগনেটিক লাইনের সঙ্গে মিলে বেরিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে।'

'পাহাড়ি জাগুয়ার রাজার মন্দিরের স্ফটিক রক্ষা করল আধুনিক বিশ্বের মানুষকে,' বলল রানা, 'কিন্তু মেরে ফেলল পাবলোকে।' হঠাৎ নিজেকে খুব দুর্বল লাগল ওর, চুপ করে বসে থাকল পাথুরে জমিতে।

পাশে বসল মিতা। মাথা রাখল রানার কাঁধে। নীরবে কাঁদছে পাবলোর জন্যে।

বায়ান্ন

ইউ.এস.এ-র মেরিল্যাণ্ড, বেথেসডা নেভাল হসপিটাল।

আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে রানা, মিতা, জর্জ হ্যারিসন ও ইগোর দিমিতভকে ভর্তি করা হয়েছে এই হাসপাতালে। কান-চোখ ভালভাবে পরীক্ষা করে আপাতত রানাকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন ডাক্তার। লো-লেভেল রেডিয়েশন পয়জনিং-এর জন্যে চলছে মিতার চিকিৎসা। অপারেশন হয়েছে আর্কিওলজিস্টের পায়ের ক্ষতে। ড্রেস করা হয়েছে নতুন করে। ভাঙা গোড়ালি ঠিক করা হয়েছে ইগোর দিমিতভের।

আলাদা আলাদা কামরায় ওদেরকে রেখেছে কর্তৃপক্ষ।

কাজ বলতে কিছুই নেই, তাই এরই ভেতর ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা। বিকেলে যখন ওর ঘরে উঁকি দিলেন এনআরআই চিফ জেমস ব্রায়ান, খুশিই হলো ও। দেখল, এইমাত্র দুর্দান্ত কোনও পুরস্কার পেয়ে খুশিতে গদগদ হয়েছেন, এমনভাবে হাসছেন ভদ্রলোক। তবে বেধড়ক মারধর খাওয়ার চিহ্ন নাকে-মুখে।

রানার বেডের পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন। নিচু স্বরে খুলে বললেন ইয়াকা মাউন্টেনে কী ঘটেছে। শেষ করলেন এই বলেঃ 'ওই তিন স্ফটিক মিলে মহাশূন্যে পাচার করেছে প্রচণ্ড ম্যাগনেটিক ওয়েভ। তবে কিছুক্ষণের জন্যে বিদ্যুৎহীন ছিল গোটা পৃথিবী। আপনারা অসফল হলে ভেঙে পড়ত সব

যোগাযোগ ব্যবস্থা। এখন অন্যসব দেশের কর্তা-কর্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ করছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে বুঝিয়ে বলছেন, আসলে কী ঘটেছে। আপত্তি তোলার উপায় নেই কারও। ন্যাচারাল অকারেন্স।'

'এবার আমাকে ছেড়ে দিন, বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরি,' বলল রানা।

'নিশ্চয়ই যাবেন, মিস্টার রানা,' বললেন ব্রায়ান, 'তবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন এক ভদ্রলোক। চলে আসবেন একটু পর।'

'উনি কে?' জানতে চাইল রানা।

'ইউনাইটেড স্টেট্স্-এর প্রেসিডেন্ট।' পাশে রাখা ব্রিফকেস তুলে নিলেন ব্রায়ান। ওটা খুলে বের করলেন রানার জন্যে এক সেট নিখুঁত পোশাক। 'আমি অন্যদের জড় করতে গেলাম। দয়া করে পোশাক পরে নিন। একটু পর পৌঁছে যাবেন তিনি।'

এনআরআই চিফ বেরিয়ে যেতেই কাপড়গুলো দেখল রানা। ক'সেকেণ্ড পর স্বীকার করল, রুচি অত্যন্ত ভাল জেমস ব্রায়ানের।

বেড থেকে নেমে পড়বে ভাবছে, এমনসময় আজকে পনেরো বারের মত কামরায় ঢুকল সুন্দরী নার্স। বেয়াড়া রোগীকে দেখলেই কুঁচকে ফেলে ডান দিকের ভুরু।

'আবার কী দোষ করলাম?' জানতে চাইল রানা।

'অনেক!' এক বোতল পানি বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। ওর অন্য হাতে ক্লিপবোর্ড। 'আপনাকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। পোশাক পরে মিস্টার ব্রায়ানের সঙ্গে দেখা করতে সোজা চলে যাবেন কনফারেন্স রুমে।'

পাঁচ মিনিট পর কামরা থেকে বেরিয়ে সোজা মিতার ঘরে ঢুকল রানা। ব্রায়ানের সঙ্গে চলে গেছে মেয়েটা। একমিনিট পর

করিডোরে এসে ও দেখল, একটু দূরের একটা কামরার সামনে হাজির হয়েছে সিক্রেট সার্ভিসের একদল এজেন্ট।

তারা কেউ বাধা দিল না। কনফারেন্স রুমে ঢুকে রানা দেখল, হাজির আছেন প্রফেসর জর্জ হ্যারিসন, এনআরআই চিফ ব্রায়ান ও মিতা।

গত দু'দিন দেখা করার সুযোগ হয়নি ওদের।

রানাকে দেখে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে মিতার মুখ। 'জানো, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আসছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে!'

রানা জবাব দেয়ার আগেই ঘরে ঢুকল দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, পেছন পেছন ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট। লেজের মত পিছু নিয়ে সিআইএ চিফ মার্ল ক্যালাগু।

'বদমাশ ব্যাটা কালো গু,' বিড়বিড় করল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকলেন রেড ইণ্ডিয়ান বিজ্ঞানী ক্যাথিবা আলিহা। হাতে বরাবরের মতই আঙুরের রসের বোতল। কাউকে পাত্তা না দিয়ে বসে পড়লেন চেয়ারে। চেহারা দেখে রানার মনে হলো, এই লোক কথা বলবেন না, এসেছেন প্রেসিডেন্টের সম্মানে।

'প্লিয, দয়া করে বসুন আপনারা,' খুশিমনে আহ্বান জানালেন প্রেসিডেন্ট।

সবাই বসতেই প্রথমে রানা, মিতা ও আর্কিওলজিস্ট জর্জ হ্যারিসনকে ধন্যবাদ দিলেন প্রেসিডেন্ট। জানালেন, ওদের কাছে চিরকালের জন্যে কৃতজ্ঞ রইল আমেরিকা। এরপর বললেন, 'আমরা প্রচার করছি: ইউনাইটেড স্টেট্স্, রাশা, মেক্সিকো, বাংলাদেশ আর চিন মিলে ঠেকিয়ে দিয়েছে ভয়ঙ্কর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিবৃতি শুনে এসব দেশের প্রধানরা খুশি হয়েছেন।'

মিতার মনে পড়ল, স্যান ইগন্যাসিয়ো শহরের গোরস্তানে

কবর দেয়া হয়েছে পাবলোকে। প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে চাইল ও, 'স্যর, ইগোর দিমিতভের খোঁজ জানি না, তার কী হলো?'

'চিকিৎসার পর তুলে দেয়া হয়েছে বিমানে,' বললেন প্রেসিডেন্ট, 'পৌঁছে যাবে নিজের দেশে।'

ওই লোকই স্যান ইগন্যাসিয়ো শহরে খুন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিল হ্যারিসন ও মিতাকে। পরে তার সাহায্য নিয়েই রানার কাছে পৌঁছেছিল মিতা। 'হাতে পেলে মেরে ফেলবে না এফএসবি?' চিন্তিত কণ্ঠে বলল ও।

'ভাববেন না,' বললেন প্রেসিডেন্ট, 'ইগোর দিমিতভ এখন রাশার সত্যিকারের হিরো। আপনাদের মতই। রক্ষা করেছে বর্তমান আধুনিক বিশ্ব। তা ছাড়া, রাশান কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে, বিলিয়নেয়ার হুয়াং লি ল্যাং-এর লোকদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছে দিমিতভের সঙ্গীরা। বাকি জীবন অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে থাকবে এফএসবির ওই প্রাক্তন এজেন্ট।'

'এবার আমাদের কী হবে, কোনও রোগবালাই নেই, কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছাড়ছে না!' নালিশ করলেন জর্জ হ্যারিসন।

এবার মুখ খুলল সিআইএ চিফ মার্ল ক্যালাগু, 'আপনাদের কথা দিতে হবে, সত্যিকারের ঘটনা কাউকে বলবেন না। সেজন্যে প্রথমেই উনিশ শ' ঊনপঞ্চাশের অ্যান্টি এসপিয়োনাজ অ্যাক্ট অনুযায়ী শপথ করতে হবে; তারপর...'

'বাদ দিন তো আপনার প্যাচাল,' প্রায় ধমক দিলেন ব্রায়ান।

'ক্যালাগু, এঁদের বিষয়ে আপনাকে আর নতুন করে ভাবতে হবে না,' বলে দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'পৃথিবীর এত বড় বিপদ যাঁরা ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের বিব্রত করা কোনওভাবেই উচিত হচ্ছে বলে মনে করি না।'

কথাগুলো শুনে কেঁচোর মত গুটিয়ে গেল মার্ল ক্যালাগু।

চেয়ার ছাড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'আবারও বলছি, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে।' তাঁর চোখ সরাসরি রানার ওপর। 'মিতার কাছ থেকে সবই শুনেছে ব্রায়ান। ওর কাছ থেকে আমি। বিশেষ করে আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাকে, মিস্টার রানা।'

বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

রানা ওর প্রাপ্য সম্মান পেয়েছে দেখে আরেকবার পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করে উঠল মিতার মুখ।

প্রেসিডেন্ট উঠে পড়তে চেয়ার ছাড়ল অন্যরা।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর পর বিজ্ঞানী ক্যাথিবা আলিহা। পিছু নিয়ে গেল দুই সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ও সিআইএ চিফ মার্ল ক্যালাগু।

'এবার সোজা ইউনিভার্সিটির কাজে ফিরব,' বললেন জর্জ হ্যারিসন।

'তাই বোধহয় ভাল,' বলল মিতা। রানার দিকে তাকাল। 'ওই যে দুই তরুণ বিসিআই এজেন্ট এল স্যান ইগন্যাসিয়ো শহরে, তাদের কাজ কি শেষ হয়েছে?'

মাথা দোলাল রানা। 'মাত্র কয়েকজন জানেন, কোথায় রাখা হয়েছে ওই দুই স্ফটিক। আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে জানানো হয়েছে। তাতে আপত্তি তোলেননি তিনি।'

রানা থেমে যেতেই জিজ্ঞেস করলেন ব্রায়ান, 'আচ্ছা, একটা কথা, মিস্টার রানা, বলুন তো, আমার সমস্ত টাকা আমি দিয়েছিলাম আপনাকে! তা হলে...'

'আপনি সত্যিই খুব মারকুটে লোক,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'সিআইএ-র ক্যালাগুর সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে খেয়ালই ছিল না, সব টাকা ফেরত গেছে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।'

'কিন্তু কেন?' অবাক চোখে রানাকে দেখছেন ব্রায়ান।

'তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়েছি, কারণ যে বিপদে পাঠিয়েছিলেন, যে-কোনও সময়ে মারা যেতে পারতাম।'

জেমস ব্রায়ান মাথা নাড়লেন। 'কিন্তু কেন বলুন তো? আমি তো সব তুলে দিয়েছিলাম আপনার হাতে, যাতে...'

'যাতে ফেরত পান আপনার মেয়েকে। এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু একটা কথা জানতেন না যে, কারও কলজের টুকরোকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে আনতে টাকা নিই না আমি। এবার বুঝেছেন?'

হাঁ হয়ে গেছে ব্রায়ানের মুখ। অবাক হয়ে রানাকে দেখছে মিতাও। খুশিতে চকচক করছে দুই চোখ। অন্তরে নতুন করে উপলব্ধি করেছে: শুধু ওরই জন্যে কী ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ঝাঁপ দিয়েছিল মাসুদ রানা।

হাসল রানা।

'আপনার মেয়ে তো ফিরে পেয়েছেন; ব্যস, আর কী চাই?'

খুক-খুক করে কাশলেন ব্রায়ান। তারপর বললেন, 'ধন্যবাদ!'

'এবার ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে যে যার মত চলে যেতে পারি তো?' বলল রানা।

'হ্যাঁ, আর ঝামেলা করতে পারবে না কেউ,' বললেন ব্রায়ান। মিতার দিকে তাকালেন। 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করব লবিতে।' রানার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

করিডোরে বেরিয়ে এল রানা, মিতা ও হ্যারিসন।

টুকটাক জিনিস নিতে নিজ কামরায় গেলেন প্রফেসর।

'এবার কী?' রানার চোখে তাকাল মিতা।

'দেশে ফিরব,' বলল রানা। 'বেকার লোক, তবে বিসিআই চিফ হয়তো দয়া করে জুটিয়ে দেবেন কোনও কাজ।'

ওর কথা শুনে হাসল মিতা। নিচু স্বরে বলল, 'আমিও যেতে

চাই। একবার ঘুরিয়ে দেখাবে তোমার দেশ? শুনেছি অদ্ভুত সুন্দর নাকি আমার পিতৃভূমি। তবে ভিন দেশের পর্যটকদের জন্যে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা নেই বলে অবহেলায় পড়ে আছে সব।'

'কথা মিথ্যে নয়,' বলল রানা, 'চলে এসো, ঘুরিয়ে দেখাব কত সুন্দর দেশটা। তবে তোমার তো জুটে যাবে অনেক কাজ। সময় কি আর পাবে?'

চোখ নিচু করে নিল মিতা। মনে মনে বলল, 'পাব, অনেক সময় পাব। এটাও জানি, চিরকালের জন্যে পাব না তোমাকে।'

'ঘরে চললাম, মালপত্র গুছিয়ে নেব,' বলল রানা, 'তুমি যখনই জানাবে বাংলাদেশে আসছ, রিসিভ করব তোমাকে এয়ারপোর্টে।'

ঘুরে রওনা হলো রানা।

পেছন থেকে চেয়ে রইল মিতা, ওর চোখে চলে এল অবুঝ অশ্রু। বেপরোয়া মানুষটা বিদায় নিতেই প্রায় দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল মিতা। আছড়ে পড়ল বেডের ওপর। আকুল হয়ে কাঁদছে। কিন্তু একটু পরেই গালে খোঁচা দিল শক্ত খাম। অবাক হয়ে ওটা তুলে নিল ও।

খামের ওপর লেখা: বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত।

ফড়াৎ করে খাম ছিঁড়ে ভেতরের কাগজটা নিল মিতা।

হতবাক হয়ে গেল লিখিত বক্তব্য পড়ে।

বাংলাদেশ সরকারের নির্মাণাধীন সবচেয়ে আধুনিক ও বড় আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রধান ফিযিসিস্ট হিসেবে কাজে যোগ দেয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ওকে!

অশ্রু এখনও শুকিয়ে যায়নি, ফিক করে হেসে ফেলল মিতা।

রানা সত্যিই কী যে অদ্ভুত সব কাণ্ড করে!

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওকে এনে

দিয়েছে মস্তবড় সম্মান!

লাফ দিয়ে বেড ছাড়ল মিতা, ছুটে গিয়ে ঢুকল রানার ঘরে।

কিন্তু চলে গেছে নিষ্ঠুর মানুষটা।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল মিতা, এলিভেটরের জন্যে অপেক্ষা না করে সিঁড়ি বেয়ে উড়ে নেমে এল রিসেপশনে। দেখল, দূরে মেইন গেটের কাছে রানা। হরিণীর মত ছুটল মিতা। কিন্তু থমকে গেল মাঝপথে। এইমাত্র রানার পাশে থেমেছে এক ট্যাক্সি। পেছনের দরজা খুলে সিটে উঠে পড়ল মানুষটা।

এখন ছুটেও লাভ হবে না।

তবুও আনমনে ক'পা এগিয়ে গেল মিতা। চোখের সামনে ট্যাক্সি রওনা হতেই বিড়বিড় করল, 'ঠিক আছে, চাকরি নেব। তখন নিশ্চয়ই দেখা পাব, তাই না, রানা?' অন্তরের গভীরে শুনল জীবনের প্রথম প্রেম মাসুদ রানার দরাজ কণ্ঠ: 'চলে এসো, মিতা!'

মিতা জানল না, ট্যাক্সিতে আনমনে ভাবছে রানা: 'সত্যি কি আসবে মিষ্টি মেয়েটা? আমি অপেক্ষা করব ওর জন্যে!'

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ alochonabibhag@gmail.com

ওমর কাইয়ুম, রশিদা ভিলা, শাহজালাল পাড়া, গ্রাম: ফটিকা, উপজে.: হাটহাজারী, জে: চট্টগ্রাম। মোবা: ০১৮৭৬-৫৩৯৯৮৭।

হ্যালো, আমি মশা বলছি, গতকাল মাসুদ রানার 'মৃত্যুঘণ্টা' পড়লাম। ওমর নামের একটা ছেলেকে বই খুলতে দেখে কৌতূহলী হয়ে তার কপালে বসি। বইয়ে এত মশগুল ছিল সে, আমার প্রতি খেয়ালই করেনি। ফলে নির্বিঘ্নে বইটা পড়তে পেরেছি। ভাবছি বিসিআই-এ মাসুদ রানাকে খুঁজতে যাব। পথিমধ্যে মানুষ নামক স্টেশনে রক্ত খেতে নেমে মারা না গেলে ঠিকঠাকভাবেই পৌঁছাতে পারব। ভাবছি মাসুদ রানা আমাকে আবার সাধারণ মশা ভেবে মেরে না ফেলে...

❋ না-না, সে-ভয় নেই, মিস্টার মশা; ও ঠিকই চিনতে পারবে আপনাকে। তবে ওকে খুঁজতে না আসাই ভাল মনে করি। বিভিন্ন স্টেশনে চড়-চাপড় খেয়ে মারা পড়ার ভয়কে তুচ্ছ করে ধরা যাক আপনি ঢাকায় পৌঁছুলেন, এসে শুনলেন ও তখন উত্তর মেরুতে। তারপর ধরে নিচ্ছি অনেক কষ্ট করে, স্পেশাল শীতের জামা-কাপড় বানিয়ে ওখানে গিয়ে যখন হাজির হলেন, ও তখন মৌরিতানিয়ায়। এত কষ্ট করার দরকারটা কী, তার চেয়ে চট্টগ্রামেই থাকুন; সরল, ভাল মানুষ ওমর কাইয়ুমের কপালে বসেই জেনে নিন পরের কাহিনিটা। নিশ্চিন্তে পেটটাও ভরল, গল্পটাও জানা হয়ে গেল। কেমন হয় তা

শফিক
ধানমণ্ডি, ঢাকা।
শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, এবার ২০১৭-র বইমেলায় সেবা প্রকাশনীর স্টলে টেবিলে কোনও বই সাজিয়ে রাখা হয়নি। সব বই ছিল র‍্যাকে। কী বিষয়?

❋ গত কয়েক বছর আপনি মেলায় যাননি বোধহয়। আজকাল ওখানে বই সাজানো হয় না। সাজালেই মাসুদ রানার জনাকয়েক ভাবশিষ্য অর্ধেক বই গায়েব করে দেয়।

খান মুহাম্মদ ফারাহ
নিউ ট্রাঙ্ক রোড, চাঁদপুর।
ক্যাসি খেয়াল করল, সুন্দরীর বাম চোখটা একদম স্থির।
পাথরের নাকি?
কপালে সাদা, গভীর কাটা চিহ্ন, নষ্ট চোখ পেরিয়ে নেমেছে গালে।
হুম, কাঁচের চোখ!
অস্বস্তি নিয়ে মার্সিডিজ দেখল ক্যাসি। 'চাকা গর্তে পড়েছে তো, কিচ্ছু ভাববেন না, ট্রাক দিয়ে টেনে তুলে দেব।'
ঠিক তখনই হোলস্টার থেকে সাইলেন্সারসহ পিস্তল তুলে নিয়ে ক্যাসির কপালে পরপর দুইবার গুলি করল মেয়েটা।
তুষার ভরা পথের ওপর ধুপ করে পড়ল মৃতদেহ।
ব্যস, এটুকুই যথেষ্ট। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা রোমাঞ্চে ভরপুর। বিশেষ করে লাবনী আলম ও জ্যাঁ মউরোসের উপস্থিতি বইটাকে অসাধারণ করে তুলেছে।
হ্যাঁ, কিছুদিন আগে প্রকাশিত মাস্টারমাইণ্ড (রানা-৪৫০)-এর কথাই বলছি। দুর্দান্ত একটা বই। বইটি উপহার দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানাই কাজীদা ও তাঁর সু-পুত্র কাজী মায়মুর হোসেনকে।
আমি মাসুদ রানা সিরিজের একদম নতুন পাঠক। 'দুরন্ত কৈশোর' দিয়ে যাত্রা শুরু। এ পর্যন্ত বহু রোমাঞ্চকর মিশনে গিয়েছি রানার সাথে। কখনও নিরাশ করেনি ও। তেমনি নিরাশ করেননি আপনি এবং সেবা প্রকাশনী।
সেবা-র কাছে এটাই প্রথম চিঠি। আপনার জন্য অনেক-অনেক শুভকামনা রইল।

প্রকাশিত হয়েছে

মাসুদ রানা

মাস্টারমাইণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন

কিডন্যাপ্‌ড্‌ বাঙালি প্রত্নতাত্ত্বিক ডক্টর লাবনী আলমকে ফেরত চাইলে অমূল্য স্টাডা কোডেক্স লুঠ করতে হবে ইউএন-এর দুর্গম ভল্ট থেকে! তাই করল রানা! লাবনী ভারতে বন্দি জেনে চলল ওখানেই। দর্শকভরা স্টেডিয়ামে ওকে খুন করবে ভারতীয় কোটিপতি, নাকি নিরস্ত্র অবস্থায় ছেড়ে দেবে ক্ষুধার্ত বাঘের অভয়ারণ্যে?

বহু কষ্টে মেয়েটিকে উদ্ধার করে পৌঁছুল রানা বরফ-ছাওয়া হিমালয়ে মহাদেবের প্রাচীন গুহায়! বুঝে গেছে, কারা ধ্বংস করবে মানব-সভ্যতা! একদিকে শিবের বেদ রক্ষাকারী সশস্ত্র সাধু, অন্যদিকে মাস্টারমাইণ্ড অনুপম মঙ্গেলকার, তার পাষাণী স্ত্রী মাধুরী ও নিষ্ঠুর মার্সেনারিরা।

বড় বিপদে আছে রানা বেচারা!

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০